একদা

সুশীল রায়

পি, সি, সরকার অ্যাণ্ড কোং
২নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

এ গ্রন্থের রচনাকাল ১৯৩৩ এর মে-জুন মাস। প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা ও ও শিল্প শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সেনগুপ্তর। তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

১. ৭. ৩৪ সুঃ রাঃ

"...art is beautiful ; there is nothing like it for enlarging and embellishing life."

Alphonse Daudet

৺মা ও বাবাকে

আমার প্রথম, আমার কাছে আকাশ—
তাই আমার শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য।

একদা

মরুভূমির ওপর ঢেউ কেটে যে বাতাস ব'য়ে যায়—সে-বাতাস দীর্ঘ নিশ্বাসের মতো তপ্ত; আকাশের বুকে রামধনু দেখা দেয় ক্ষণিকের জন্য; কেউ কারো কাম্যকে হারিয়ে ফেলে; এবং হারিয়ে ফেলায় অন্যের কাছে অপরাধী বিবেচিত হয়, লাঞ্ছিত হয়—দীর্ঘনিশ্বাস আগুন হ'য়ে ওঠে; সমস্ত ঘটনা এক সঙ্গে এনে এ গ্রন্থের একটি দিনে পূর্ণচ্ছেদ।

জিভে জড়তা নেই।

দেড় বছর আগে রাঁচী থেকে ফেরবার পথে সুশীলের সঙ্গে প্রথম পরিচয়েই সুশীল তাকে ব'লেছিলো,—তুমি উকিল হও।

প্রথম পরিচয়েই অর্থাৎ অল্পক্ষণ আলাপের পর ঘনিষ্ঠতায়ি,—সুশীল তাকে 'তুমি' ব'লেছে, অন্যায় করেনি।

আর সুশীল সেন, বাজারে যার আলাপী ব'লে প্রচুর নাম অর্থাৎ বদনাম, সে অমনধারা চমৎকার-দেখতে মেয়েকে অবিলম্বে আপ্‌নার ক'রে নেবেই, এতে আশ্চর্য্য হবার কী আছে?

কিন্তু জিভে যার জড়তা নেই সে এমন নিরিবিলি নির্ব্বাক হ'য়ে ব'সে থাকতে রীতিমতো কষ্ট পায়। তাই ও ভাবছে টাঙ্গাইল থেকে যখন প্রথম রওনা হ'লো, সেই ষ্টিমার, কী মধুর ভাবে তার কাটলো সেই ঘণ্টা কয়েক!—আর ট্রেইনএ এসেই এ কী ঝঞ্ঝাট! একটী প্রাণী নেই জাগ্রত যার সঙ্গে, মনের না হোক, মৌখিক দু'টো টুকিটাকি, তা'ও হবার জো নেই।

একদা

জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে গাছ ছ্যাখে—জ্যান্ত দানো, ছুটে ছুটে মিশে যাচ্ছে আরো আঁধারের সঙ্গে। আকাশে তারা অসংখ্য, অগুন্তি; খানিক খানিক লঘু মেঘ ভেসে বেড়ায়, সবারি ওর সঙ্গে চেনা কিন্তু তবুও ও তাকাচ্ছে তাদের পানেই চির-অপরিচিতের মতো।

গাড়ি বোঝাই যাত্রী, সবাই ঘুমোচ্ছে। তাদের জিভে নিশ্চয়ি জড়তা আছে, দেহে আছে ক্লান্তি, অবসন্নতা, নইলে ওরি মতো জেগেই রইতো খানিকটা মুখরতার প্রতীক্ষায়।

গাড়ি ছুটেছে তালে তালে হুহু শব্দ ক'রে। গাছ পালা ঘুরে ঘুরে স'রে যাচ্ছে কোথায় জানিনা। হঠাৎ সে তালে এলো বাধা, সুরও গেলো বদলে। তাড়াতাড়ি ও মুখ বাড়ালে জানলা দিয়ে, চাইলো নিচে। ছোট ছোট পান্সি লালচে আলো জেলে মাছ ধরছে বোধ'য়। ওরাও সারারাত ঘুমোয় না। এখন আরো কতজন জেগে আছে কত দেশে; সমুদ্রের এপারে, ওপারে, মাঝে। আজ হঠাৎ যার স্বামী চোখ বুজলো (একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে অজান্তে) সে তো কিছুতেই ঘুমোতে পারবে না, ব্যথার চাবুক মেরে তার স্বামীই তাকে জাগিয়ে রাখবে। আবার যাদের আজ এখন, এই মুহূর্ত্তে ফুলশয্যা আরম্ভ হ'লো, তারা কি ঘুমোচ্ছে?—কতজন ঘুমোচ্ছে না। চোখ র'গড়ে নিলো। কে যেন ছোটো নদীটার ওপার থেকে চীৎকার ক'রে এপারের লোককে ডাকছে,—দু'দলই নিঃঘুম। এই তার কাছে যেন প্রচুর সান্ত্বনা।

বাইরে তাকিয়ে মিহি সুরে গান ধ'রলো—সে সুর গাড়ির গোঙরানীতে আত্মগোপন ক'রেছে, নিজেই প্রায় শুনতে পায়নি। সুর আরো চড়ে তথাপি যেন অস্পষ্ট।

একদা

একটা ছোটো ষ্টেশান হঠাৎ পিছলে পেছনে চ'লে গেলো। মিট্‌মিটে আলো মুহূর্ত্তের মধ্যে ছুটে গেলো—তারার মতো।

তার গান বন্ধ হ'য়ে গেছে। সময় কাটেনা। একটা গেঁয়ো মেয়েও কি ওঠে না ছাই, দু'টো কথা অন্ততঃ সে ব'লে বাঁচে। গাড়িটা এতো জিরিয়ে জিরিয়ে কেন যে চ'লছে! ভোরও কি হয় না ছাই! রাত্তির কতো হবে? গাড়িতে একটা ঘড়িও কি রাখতে নেই? পয়সা তো দিব্যি গুনে নেয়। চাকরি যদি সত্যিই পায়—সুশীলকে তো বিশ্বেস নেই—তবে রিষ্টওয়াচ কিনবেই;—লোকে নিন্দে করুক তবু হাতে বাধবে।

•যাক, কোকিল তবে ডাকলো। ফর্সা কিন্তু তবু হয় নি। হবে এইমাত্র। নিজের গান শুনতে পেলো না কিন্তু কোকিলের স্বর ঠিক কানে এলো কোকিলের স্বর মিষ্টি ব'লেই হয়তো। ফর্সা হ'লেই আমরাও আজকে-তে পৌছব' আমাদের গল্পও হ'বে শুরু।

পঞ্চমী এবার উঠে দাড়ালো। ষ্টেশনের আলো দেখতে পেয়েছে। জাগা লোকের মুখ দেখতে চায় বোধ'য়। সিগনাল গুলো হাঁদার মতো দাঁড়িয়ে বেশ দেখা যাচ্ছে এখন। এর আগে দেখা যাচ্ছিলো শুধু চোখ।

চাই পান চাই চা।

লোক উঠছে নামছে। ওপাশে উঠে গিয়ে ব'সে তাই দেখছিলো। মেম সাহেবরা চুল গুছোতে গুছোতে গটমট ক'রে হেঁটে চ'লেছে। পূবে তখন রং বদলেছে। কালচে কাটছে।

ধড়ফড়ে মেয়েমানুষটী উঠে ব'সে পানওলাকে শুধোলেন, কোন ইষ্টিশান গা? ওঃ, এখনো দেরি আছে। আবার শুলেন। অসহ্য!

একদা

এ-গাড়িতে একটাও মানুষ উঠলো না। কি অলুক্ষুণে গাড়িতেই যে পঞ্চমী উঠেছে! ইষ্টিমারে বেশ কেটেছিল! শুরু যার এম্নি তার শেষ যে কেন বদলালো! না ঘুমিয়ে গা ক'রছে ঝিমঝিম। আর এখন ঘুমিয়েই বা কি হ'বে? ঐ তো ফর্সা হ'য়েছে। সুশীল নিশ্চয়ি ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলো। এতক্ষণ নিশ্চয়ি উঠেছে। এই বোধ'য় মুখ ধুতে গেল। চিঠি পেয়েছে, পোষ্ট ক'রেছে পর্শু। আবার ভাবে হয়তো ওঠেনি। এখনো গাঁকগাঁক ক'রে ঘুমোচ্ছে। এমন ঘুমোনোই ঘুমোতে পারে ও! পথঘাট চেনা নেই কী যে মুস্কিলে প'ড়তে হ'বে! যদি না আসে ষ্টেশনে! যদি অসুখ ক'রে থাকে! আর কাউকে তবে নিশ্চই পাঠাবে। সে আমাকে চিনবে কি ক'রে! আমিই বা কি ক'রে চিনবো তা'কে।

আর ভাবতে পারছে না।

এই ছাড়লো আবার এই দাঁড়ালো। এখন বুঝি যত কাছে কাছে ষ্টেশন। রাত্তির থাকতে তো পঁচিশ মাইল না দৌড়ে দাঁড়াতে পারেনি, সবি যেন কেমন-কেমন। যাক এবার এই গাড়িতেই উঠবে বোধ'য়। পঞ্চমী মুখ বাড়ালো। মেয়েটা আর হাঁটতে পারছে না। গায়ে চাদর জড়াবে না হাঁটবে। গাড়িতে উঠলো অনেক কষ্টে। সঙ্গী তা'দের একজন বুড়ো, পাশের গাড়িতে আগেই উঠে প'ড়লো। মেয়েটার সঙ্গে উঠলেন একজন স্ত্রীলোক এই গাড়িতেই। তাঁর সমস্ত মুখখানা কদাকার। পঞ্চমী সেইটেই আগে দেখলো। এখন আলো হ'য়েছে দিব্যি। সবাই উঠে উঠে ব'সছে—ঢুলছে।

মেয়েটার মুখ ফ্যাকাশে—সমস্ত মুখে একটা কেলেঙ্কারীর ছায়া।

স্ত্রীলোকটী দাঁত খিঁচিয়ে ব’সতে ব’ললেন : সং, ব’সনা এইখেনে ; নে আমি দাঁড়িয়েছি—আবাগী। সকাল বেলা ! সারাদিন ওর যে কেমন কাটবে !

গাড়ী ছাড়লো।

মেয়েটার নাম কুমারী। তা’র পেছনে একটা ইতিহাস আছে।

—আপনারা যাবেন কোথায় ? কাশী ? ওমা, সে তো অনেক দূর। গাড়িতে তো বেশ কষ্ট ভোগ ক’রতে হ’বে। যে গরম ! আষাঢ় মাস, এক ফোটা বিষ্টি হ’চ্ছে না।—পঞ্চমী কথা ব’লতে শুরু ক’রেছে।

—আর কষ্ট ! যা নিয়ে পড়িছি। আর বলো কেন !

কি নিয়ে প’ড়েছেন, কি ব’লবে না পঞ্চমী বুঝতে পারলো না। শুধু তাঁর মুখের পানে ফিরে ফিরে চাইলো, আর চাইলো কুমারীর মুখে। লজ্জায় ও যেন ফুরিয়ে যাচ্ছে। এ-দিকে তাকাতে সাহস ক’রছে না।

—বাইরে চেয়ে দেখছিস্ কি, পড়ুক কয়লার কুটো চোখে। ঝাঁঝালো স্বর কাকের মতো।

কুমারী ম্লান মুখ ভেতরে নিলো। উড়ো-চুল বাঁ-হাত দিয়ে কোনো রকমে মাথার উপর তুলে দিলো। না-তোলাই ছিল ভালো, মন্দ দেখাচ্ছিল না। রঙ কালো হ’লে কি হ’বে কুমারীর মুখখানা বেশ। চোখ-ভরা কুজ্ঝটিকা। তাই ভালো !

পঞ্চমী নিজেকে সামলাতে পারছে না। কুমারীর সঙ্গে ও কথা কইবেই।—তোমার নাম কি ? পঞ্চমী শুধোলো।

কোনো রকমে একবার পঞ্চমীর দিকে চেয়ে, ভাল ক'রে চাদর দিয়ে সম্ভ্রম বাঁচালো। কুমারীর ধারণা, ষা' নিয়ে ও বিব্রত সবার চোখ যেন ঠিক সেই দিকেই।

—আমার? কণ্ঠস্বর বড়ই করুণ।—কুমারী ব'লে আবার চাইলো দূরের ঝাউ বনের ঝিরঝিরে পাতার দিকে। কিন্তু তা-ও গেল স'রে। ওকে বোধ'য় কেউ মুখ দেখাতে চায় না।

—উনি তোমার কে হ'ন? আস্তে কাছে গিয়ে জিগ্‌গেস ক'রলো।

কুমারী ব'ললো, মা।

—নিজের? যেন কথাটা বড়োই আশ্চর্য্য।

—না, সৎ। সরল ভাষায় উত্তর দিলো।

স্ত্রীলোকটী মুখ ফিরিয়ে ব'ললেন,—পুঁটুলী খুলে পান দে তো একটা। শুনছিস্ কথা! একটা পান দে।

এর চেয়ে কুমারীকে বিষ খেতে বলা কি ভালো ছিল না? উঠ্‌তে দ্বিধা ক'রছে। কেমন ক'রে উঠবে!

পঞ্চমী প'ড়েছে হাবুডুবু-র মধ্যে।

—নাঃ, তোর হাতের পান খেলেও পাপ! উঠে গিয়ে নিজেই নিলেন। বাঁচালেন কুমারীকে! কুমারীকে এমন অপ্রতিভ করবার মানেই হয় না।

পঞ্চমী অনুমান ক'রেছে কিন্তু অনেকটা। এর আগেই বোঝা উচিত ছিল।

মেয়েটার সিঁথে শাদা। বিয়ে হয়তো হয় নি।—ও ভাবে।

গাড়ি এর মাঝে থেমেছে, আবার চ'লেছে, আবার থামলো। ও-গাড়ি

থেকে সেই বৃদ্ধ এলেন—কিছু লাগবে নাকি? কুমারীকে শুধোলেন; তেষ্টা পায় নি? জল খাবি? চা?

চা ও খেয়ে থাকে। কিন্তু এখন খাবে না। ইচ্ছে নেই না-হয় আপত্তি আছে। পঞ্চমীর বেজায় তেষ্টা পেয়েছে। ও কিছু খেয়ে নিক্। না খাবে না, একেবারে নেমে নেয়ে-ধুয়েই খাওয়া যাবে।

সুশীল এতক্ষণ নিশ্চয়ই ষ্টেশনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা ক'রছে। তা করুক, কিন্তু কুমারীর কথাই আপাততঃ সুশীলকে ভুলিয়েছে।

এর ইতিহাসটা পঞ্চমী জান্‌তে চায়। কা'কেই বা জিগ্‌গেস করে!

—উনি তোমার কে?

—কে? উনি? আমার বাবা।

পঞ্চমী এবার আশ্চর্য্য হ'লো না। কত কথাই যে ওর জিগ্‌গাস্য আছে তা' সেই জানতে পারবে যে সব কথার জবাব দেবে।

বৃদ্ধ আবার এলেন: তোর ভাবনা কি মা? আমি আছি। খুব নিচু গলায় ব'ললেন কুমারীকে। কুমারীর মা ও-দিকে ব'সে চা খাচ্ছেন। বড়ো ষ্টেশন জল নেবে, দাঁড়াবেও অনেকক্ষণ, তাড়াতাড়ি কি? জিরিয়ে জিরিয়ে খেতেও দোষ নেই। বৃদ্ধর চোখ ছলছল ক'রে উঠ্‌লো। কতো আদরের মেয়ে এই কুমারী—তা'র এই দুর্দ্দশা।

বৃদ্ধ গত জীবনের অস্পষ্ট আলোয় কত কথাই না দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খুঁজছে। আলো-আঁধারে ঠাহর পায় নি, খানায় পা প'ড়েছে। চমকে উঠে ব'ল্লেন—গাড়ি এবেরে ছাড়বে আমি যাই? কেমন! চ'লে গেলেন ও-গাড়িতে।

একদা

গাড়ি আবার ছাড়লো। ক'লকাতা আর বেশি দূর নয়। এই এসে প'ড়লো আর কি! সুশীল এখন ঠিক-ই এসেছে। তার দায়িত্ব আছে তো! পঞ্চমী যে একা আসচে তা-তো সে জানেই।

কিন্তু পঞ্চমীর মন উচাটন হ'য়ে উঠেছে।. কুমারীর গত জীবন ও জানতে চায়।

পঞ্চমী আবার প্রশ্ন ক'রলো—তোমার বুঝি অসুখ? কি হ'য়েছে?

কুমারী হারিয়ে গিয়েছে। পথ খুজে দেবে কে? চারিদিক চাইছে, এ প্রশ্নের কী জবাব হ'তে পারে?

—হ্যাঁ। যাক্ কোনো রকমে নিজেকে মুক্ত ক'রেছে।

পঞ্চমী কুমারীর কাছে এখন অমিতাভর মতো মনে হ'চ্ছে। যার সঙ্গ সে আর চায় না। এ জীবনে তো নয়-ই, আর কোনো জন্মেই না, যে সঙ্গ তাকে এরূপ নিঃসঙ্গ, ভিখারী করেছে!

কী ভয়ানক পাপ! কুমারীর চোখের সুমুখে সব ঘোলাটে হ'য়ে আসছে। কুমারীর দেহে যদি সে শক্তি আসে তবে সুযোগ খুঁজে সে অমিতাভকে হত্যা ক'রবে। তারপর আত্মহত্যা! দ'গ্ধে মরার চেয়ে তা' শ্রেয়ঃ। কুমারী গা নাড়া দিয়ে ওঠে। জানলার কাঠ চেপে ধ'রে বাইরে চায়। তার দেহে এখন অসীম বল। কুমারীর শরীর কাঁপছে।

পঞ্চমী সবই দ্যাখে, কিন্তু উপায় কি? ওর হয়তো আর ইতিহাসটা জানা হ'লো না।

কিন্তু ইতিহাসটা ইচ্ছে এই: গাড়ি কলকাতায় আসুক, তারি মধ্যে আমরা কথাটা জেনে নি।—

কুমারীর কৌমার্য্য ঘুচেছিলো আজ বছর দশেক আগেই। তখন এর

মাও বেঁচেছিলেন। তারপর চিরকুমারী হ'য়ে বেঁচে থাকবার সুবিধাও হ'য়েছে তা'র দু'বছর পরেই। তখন কুমারীর বয়েস বছর দশেক হবে।

আজ সে যুবতী।

অমিতাভ তা'র সঙ্গে আলাপ ক'রেছিলো। সে কথা থাক।

দু'জনের মিতালি দিন-দিন বাড়ছিলো। অমিতাভ কলকাতায় পড়ে মানে প'ড়তো। যখন ও কলকাতায় যেতো কুমারীর ভালো নিশ্চয়ি লাগতো না কিন্তু সে-সব কথা আমাদের না জানালেও হবে।

কিন্তু কুমারীর দেহে একদিন হঠাৎ কোকিল ডেকে উঠ্‌লো। ডাক তা'র কানে এসে বাজলো, কুমারী সেদিন বুঝলো অমিতাভ কি? আকর্ষণও বাড়্‌লো।

অমিতাভ আসতো, যেতো। কেও কিছু মনে করেনি। করবার মতো কোনো কারণও পায় নি হয়তো তা'রা।

কুমারী ব'সে বুড়ো বাবার জন্য পান সাজে—একলা ঘরে। ও-ঘরে ওর মা রাঁধেন। অমিতাভ এসে হাজির হয় ঘরের মধ্যে। কুমারী চ'মকে উঠ্‌তে শিখেছে। বলে,—মা তো ঐ ঘরে।

—কেন? আমি তো মা'র কাছে আসিনি। ব'লে অমিতাভ হাসে—সে হাসি সরল।

কুমারী বাটা ফেলে উঠে যায়—অন্য কাজের অছিলায়। অমিতাভ বোঝে সবি, কুমারীও বোঝে।

বেরিয়ে আসে ঘর থেকে: দোপাটী লাগালে কবে? দিব্যি ফুল ফুটেছে তো! ছিঁড়্‌বো একটা? গাছ কা'র?—সব উড়ো প্রশ্ন।

অমিতাভ জবাবই পেলো না। উঠোনের চারদিকে বাগান র'চেছে কে, তা' অমিতাভ জানে।

মা বেরিয়ে আসেন। চাবির গোছা কাঁধে ফেলে, কাপড়ে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে আসেন,—কে রে? অমিত? কখন এলি? ঘরে ব'স না!

অমিত জবাব দেয়, অনেকক্ষণ তো। কেন কুমারী বলে নি? ওর সঙ্গেই তো আগে দেখা!—মরিয়া হ'য়ে খুলে বলে সব,—যা'তে না কেউ সন্দেহ করে কোনো রকম।

কুমারী আলো পরিষ্কার ক'রছে। শুনেও শুন্ছে না। অমিতাভকে কুমারীর ভালো লাগে ব'লেই তা'র এত দ্বিধা, তা' অমিতাভ কি বুঝতে পারে না? চ'লে যায়। যাবার সময় বলে, চাঁপা ফুলের চারা চেয়েছিলে, কাল নিয়ে আসবো। আর ই'য়ে, কি বলে—থাক্ কালকেই ব'লবো!

কুমারী কোনো দিন-ও চায় নি, লজ্জায় ম'রে যায়। ছি ছি!

অমিতাভ এই ফার্ষ্ট ইয়ারে পড়ে তখন। স্কটিশে। হষ্টেলে থেকে পড়া সেইখানেই সুবিধে।

বন্ধুদের কাছে কুমারীর কথা যে গোপন রাখেনি সে কথা সত্যিই। অনেক বাড়িয়েও ব'লেছে নিশ্চয়িঃ আমাকে অমুক-তমুক হ্যানো-ত্যানো ইত্যাদি।

তা'রা লাফিয়ে ওঠেঃ তোর দেশে যাবো—এই—ইষ্টারেই।

অমিত বলেঃ আয়, আমরা একটা দল গড়ি, যা'র উদ্দেশ্য হ'বে শুধু বিধবা বিয়ে করা। কচি মেয়ে গুলো বিধবা হ'বে আর সারা জন্ম

কাটাবে দুঃখে? প্রতিকার একটা কিছু আমাদেরই করা উচিত। সত্যি ব'লতে কি আমার মনে ইচ্ছে আছে যেমন ক'রেই হোক বিধবা-বিবাহ প্রথা শুরু করবই! পাঁচ বছরের মেয়ের বিয়ে দিলে দু'বছরে সে হ'লো বিধবা, ব্যস্ চির জীবন সে বিধবা!—অনেক কথাই ব'লে ফেললে।

জীবন ব'সে ব'সে হাসছিলো। ফাজলামো ক'রে অমিতকে জিগ্‌গাসা ক'রলো—

—ক'টা ছেলে পর্য্যন্ত allowed?

—মানে?—অমিত কিছু বোঝে না যেন।

—মানে? বলছি ক'ছেলের মা বিয়ে ক'রতে রাজি আছো?—জীবন হাসে।

—যত ছেলের বাপ্ ফের বিয়ে ক'রতে পারে।—স্পষ্ট জবাব দেয়। সবাই মিলে চীৎকার ক'রে হাসে।

এ-দিকে দিন কাটে।

কুমারীর কথা উঠ্‌লে ও চ'টে যায় আজ কাল। মনে-মনে কান-মলা খায়—কেন এদের ব'লতে গিস্‌লাম।

কুমারী বিধবা, সেই হ'চ্ছে অমিতর কাছে সব চেয়ে চরম আকর্ষণ। ও-চায় সত্যি, বিধবারা কেন পুরুষের মতো ফের বিয়ে ক'রবে না। জগতে সবার সমান অধিকার। যদি অমিত কাউকে বিয়েই করে তবে কুমারীকেই। হষ্টেলের ঘরে ব'সে ব'সে অনেক কথাই ভাবে, আবার ছোটো খাটো দু'য়েকটা কবিতাও লেখে নারীর নারীত্ব সম্বন্ধে এবং নারীর ওপর অসীম শ্রদ্ধা জ্ঞাপন ক'রে। একটা নমুনা:

একদা

নারী

কী দিয়ে পুজিব তোমা ? পুজিবার কিছু নাহি মোর !
ভাবিয়া এ দগ্ধ আঁখি অন্ধকারে হ'য়ে আসে ঘোর।
তোমারে পুজিব বলি' অর্ঘ্য খুঁজি হইলাম সারা—
তুমি তো নহো সে দেবী যাঁরে দিই চন্দনের ধারা ;—
তুমি যেগো তারো শ্রেয়ঃ, তোমারে কোথায় দিব স্থান ?
দেবতার সৃষ্টি মাঝে তুমি হ'লে অনবদ্য দান।
সব প্রাণ দিয়া তারি বাসিবারে জানো দেবি, ভালো
তোমার প্রিয়র মন ভালোবেসে করিয়াছ আলো—
চাহো নাই প্রতিদান ;—কহিতেছে মুগ্ধ মন তাই :
তোমারে দেছেন বিধি, পূজিবার কিছু জ্ঞান নাই !
তোমারে রাখিব কোথা ?—মাথে রাখি ইষ্টদেবতায়,
তাই দেবি সঁপিলাম এ-অন্তর তোমার দু'পায়।

সেবার গরমের ছুটীতে বাড়ী গিয়ে কুমারীর হাতে একটা চিঠি দেয়। যার মর্ম্ম এইরূপ : কুমারীকে নাকি ও বিয়ে করবেই কেউ বাধা দিতে পারবে না। ও যাকে ভালোবাসে তা'কে প্রাণ দিয়েই বেসে থাকে। কুমারীকে তার ভালো লেগেছে, বিয়েও ক'রবে। আর হয়তো কুমারীর এ-বিষয়ে নিশ্চয়ি অমত হ'বে না। সে কি সত্যিই বিধবা ? ও-রকম বিয়ের নাম বিয়েই নয় ইত্যাদি। কুমারীর চিঠি পেয়ে বুক কাঁপে। প্রথমে তো ওর হাতথেকে নিতেই চেয়েছিলো না। ওর বুকের ভেতরটা তানপুরার তারের মতো কাঁপে। কত বড়ো আশ্বাস বাণী তা' কুমারীই জানে।

তারপর আসা-যাওয়া লেগে থাকে। কুমারী আজকাল মিশতে

তত ভয় পায় না। পান চাইলে ঘরে গিয়ে পান সাজতে বসে বাটা ছড়িয়ে। চৌকীর ওপর অমিত গিয়ে উপুড় হ'য়ে শোয়। কুমারী পান সাজে পাশে ব'সেই মেঝেতে। অমিত ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে—যেন আর্শিতে নিজের মুখ গ্যাখে।

কুমারী মুখ তোলে না, মাথা নিচু ক'রে প্রশ্নের উত্তর দেয়।

—একটু চুণ দাও—অমিত চায় ; চিঠিটা প'ড়লে ? জিগ্‌গেস করে।

অম্নি কুমারী উঠে চ'লে যেতে চায়। অমিতও লাফ দিয়ে উঠে পড়ে। কুমারীর হাত ধ'রে তা'কে বুকের মধ্যে নিয়ে একটা চুমু দিয়ে চ'লে যায়। দেখলো শুধু একটা চড়াই পাখী। সেও অমিতর সঙ্গেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

আজ কুমারীর ক্ষণে-ক্ষণে সর্ব্বশরীর শিউরে উঠছে। কাজে মন ব'সতে চাইছে না। বুকের মধ্যে যেন কী ভীষণ একটা ভারি জিনিষ ঢুকেছে।

মা শুধোলেন ঃ অমিত গেল কখন রে ?

কুমারী ভাবলো,—নিশ্চয়ি মা দেখেছেন, নইলে– তারপর জবাব দেয় ঃ অনেকক্ষণ তো। ওর বুকখানা ভয়ানক কাঁপছে। দুঃসহ !

মাঠের পাশে বুনো-পথ। তাই ধ'রে কুমারী বাড়ি ফেরে সন্ধ্যার আগেই। ও-পাড়ায় ওর বন্ধুর বাড়ী বেড়াতে গিয়েছিলো, যায়না তো বেশি। আসচে একাই, নইলে অমিত কি ক'রেই বা তার দিকে এগোবে,—আসতেই হ'বে।

কুমারীর গতি হ'য়ে আসে মন্থর, সচকিত। আর পথ নেই কেন? কুমারী যাবে কোন দিক দিয়ে? অসহায় প্রশ্ন। সমস্ত শরীরে তার শিহরণ!

অমিত এসে প'ড়লো! কুমারীকে উদ্ধার করো না! ক'রলো না কেউই। কুমারী চীৎকার ক'রলো না, সে চীৎকার ক'রতে চায় না। ভয় পেতে ভালোবাসে, তাই বুঝি এত ভয়!

—এই সন্ধ্যায়? যেন আগে থেকে দেখেইনি হঠাৎ দেখলো। প্রথমে উত্তর দিতে গিয়ে থিতিয়ে যায়, সামলে নিয়ে জবাব দিতেই হ'লো কুমারীকে,—বেড়িয়ে ফিরছি। সন্ধ্যা তো হয়নি।

—শোনো। অদ্ভুত ছেলে অমিতাভ; বয়সে কাঁচা, এ-সবে ডাঁসিয়েছে। ইণ্টারমিডিয়েট এখনো দেয় নি, দিলে বোধ'য় ঢি-ঢি ফেলবে পাড়ায় পাড়ায়। হাতে টর্চ নিয়ে পূজোর থিয়েটারের রিহিয়াসে'ল দিতে যাচ্ছে। ফিমেল পার্ট ওর বাধা; ও-চেহারায় নাকি ও-ছাড়া ওকে মানায় না।

শুনতে এগোলোও না, চলেও গেল না।

—আচ্ছা যাও। কি ব'লবে ভেবে পেলো না নিশ্চয়ি।

কুমারীর সমস্ত দেহে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌লো। হাঁটতেও ক'রলো শুরু। অমিত দাড়িয়ে দাড়িয়ে চলনের ভঙ্গি দেখছিলো। সত্যি, চেয়ে থাকতে ইচ্ছা হয় কুমারীর পানে যখন ও হাঁটে। কোনখানটি ভালো বোঝে না অমিত কিন্তু তবু ওর ভালো লাগে। অবশেষে যখন কুমারী পেছন চেয়েই বাঁক নেয় লিচু গাছের আড়ালে, অমিত হাঁটে। ত'ার পেছনে নয়, ও-দিক পানেই।

একদা

কুমারিকা থেকে বিন্ধ্যাচল পর্য্যন্ত হেঁটে যেন হঠাৎ কুমারীর কাছেই অমিত এসে হাজির। হাঁপাচ্ছে ; ব'সে প'ড়লো কুমারীর পাশেই। একটু দ্বিধা হ'লো না। কুমারী আশ্চর্য্য হয়।

—হায়রাণ। উঃ, পাখাটা দাও তো।

কুমারী উঠ্‌লো। চৌকীর কোণে দাঁড়িয়ে উঠে মশারি হাতড়ে নেমে এলো।

—নেই ? থাক, লাগবে না। একটু জল দাও।

ফরমাস যেন গুছিয়ে নিয়েই এসেছে।

পাখা দিল, জলও।

—যাচ্ছো তো তোমরা ? তোমার মা যাবেন তো ? ফাষ্ট ক্লাশ হ'বে কিন্তু। উত্তরার পার্ট অ্যায়সা ক'রবো, দেখো কাঁদিয়ে দেবো। তোমাদের কাঁদাতেও সময় লাগবে না—যেমন কোমল তোমাদের প্রাণ ! আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে ফের বলে ঃ ঐ বুকের মধ্যে কী আছে বলো তো তোমাদের—

কুমারী কেঁপে ওঠে। বুকের কাপড় ভালো ক'রে গুছোয়—ধীরে ধীরে।—যে একটুতেই চোখে জল আসে ? রেশ টেনে শেষ ক'রে। অমিতাভ ওস্তাদ।—আগের থেকে ব'লে লাভ নেই। কি জানি কেমন হবে বাপু। যেমন খাটুনি। এই সকাল থেকে ষ্টেজ বাঁধতে শুরু—

—তোদের ওখানে তো আজকেই রে ? মা এসেছেন।

—হ্যাঁ, যাচ্ছেন তো ? ও যাবে ? নিয়ে যাবেন কিন্তু...

আজ কুমারী একটাও কথা বলে নি।

মা চ'লে গিয়েছেন। অমিত দেখে নিলো ভালো ক'রে।

কুমারীর কাণের কাছে মুখ নিতেই সে মাথা সরিয়ে নিলো। অমিতাভ ব'ললো অতি মৃদু গলায়ঃ চুমু খাচ্ছিনা, ভয় নেই। বলছি, দেখো ভালোবাসা কাকে বলে।

চুমুকে ভয় কেই বা করে—কুমারীও করে না। লজ্জা?—তাও বোধ'য় হয়। তবে কি? এ বুঝি আতঙ্ক? তাও নয়। এ তবে কিছুই নয়। তবু যেন কেন চুমুটা দিতে দিলে না, তা কুমারীই জানে। মা-তো এদিকেই নেই। মেয়েদের সবি যেন বাড়াবাড়ি! অমিতাভ উঠে যেতে চায় বাইরে থেকেই, ওর ভেতরটা চায় থাকতে। তবু ওঠে পান না নিয়েই।

মৃদু কণ্ঠে বলে—পান, কুমারী আর কিছু ব'লতে পারে না। ও সব্রীড় থাকতে ভালোবাসে, গণিকাদের মতো প্রগল্‌ভতা তারাই করুক যাদের খুসি।

অমিত শুনেও শোনে না।

ও-ঘরে গিয়ে আবার কি বলতে আরম্ভ ক'রেছে। কুমারী ভাবছে তার খাবার বিষয় হয়তো। ওর সে কথা ভালো লাগছে না। গেলে তো এমনিই যাবে! মা গেলেই ও যাবে।

যাবার সময় আবার চীৎকার ক'রে বলে,—সন্ধ্যের সময় আসবো কিন্তু নিতে।

জীবনে ওর এই প্রথম থিয়েটার আর এই প্রথম প্রেম। প্রেম হ'চ্ছে ও-পাড়ার ভূতনাথের সঙ্গে আর এই কুমারীর সঙ্গে। ভূতনাথই অভিমন্যু সাজবে শেষ পর্য্যন্ত ঠিক হ'য়ে গেছে। তাই ওর এত তাড়া, তাগাদা।

কুমারী সারাদিন বেজায় খাটছে, সব গুছিয়ে রাখছে, সন্ধ্যের সময়ই তো যেতে হ'বে। ছ'টায় না হোক আটটার সময় তো আরম্ভ হ'বেই।

ওর বুকে আজ যে বাঁশী বাজছে সে বাঁশীর তান শুনতে পেয়েছিলেন বিদ্যাপতি, জয়দেব, আর আজ শুনলো কুমারী নিজে। সুর মধুরই লাগলো বটে। আর্শি দিয়ে মুখ দেখতে বড়ো সাধ জাগলো। মুখের মালিন্য দেখে চমকালো, এ-মালিন্য এখনো ঘোচেনি কেন? ওর সত্যিই আনন্দ হ'চ্ছে; তবে এ-আনন্দ মিথ্যা? এ স্বপ্ন? সিঁথিটা ভয়ানক শাদা; সেই ভালো, তার বিয়ে হয়নি; কুমারী সে-কথা কিছুতেই স্বীকার ক'রবে না। আজ যদি কেও এ কথা তোলে ও তাকে খুন ক'রতে রাজি। ওর তন্ত্রীতে আজ আঙুলের স্পর্শ লেগেছে, ও সেই সুরের নেশায় তন্ময়, বিভোর। কাল থেকে পাড়-ওলা কাপড় প'রবে, রুমাল পেড়ে গুলো পচুক; বালিশের না হয় অড় ক'রবে, অসময় বিছানায় পাতবে।

মার কাছ থেকে একখানা কাপড় আজই চাইবে, যা থাকে বরাতে। থিয়েটারে এমন ভাবে যেতে ওর লজ্জা ক'রবে; পড়শীর কাছে নয়, অমিতাভর কাছে। এ-বেশ তো অমিত রোজই দেখছে, তবু ওর আজ লজ্জা ক'রবে।

শক্ত কাঠামো দিয়ে গড়া। এত আনন্দ টের পায়নি কিন্তু কেও। সন্ধ্যেয় অমিত এসে হাজির,—আর দেরি না। ওর আসতে একেই দেরি হ'লো। ফিরবে, সাজবে, নামবে তবে উঠ্‌বে সিন্; প্রথমেই ওর কিনা! ওর দেরি করালে ভুগ্‌তে হ'বে নিজেদেরি। অনেক কথাই ব'ললো।

ওদেরো আর দেরি হ'লো না। মা ঘরে-ঘরে তালা দিয়ে টেনে টেনে দেখে নিলেন ঠিক আট্‌কেছে কি না। কুমারী এখনো বেরোলো না।

কুমারী কিন্তু শাড়ী চাইতে পারেনি। সান্ত্বনা দিয়েছে মনকে—কি হ'বে ছাই পাড় দিয়ে। যখন হ'বার তখন হ'বেই। অমিতর এত প্রতিশ্রুতি কখনই মিথ্যা হ'তে পারে না।

চাঁদের চোখ বুঝি পুড়েছে। কেন, এ-দিকে তাকাতে পারে না! ওরা অন্ধকারে যায় কি ক'রে।

চারিদিক নিঃঝাম। ঘরে-ঘরে তালা দিয়ে সবাই গিয়াছে আগে থেকেই—বোকার মতো। অমিতাভ চ'লেছে দু'জনকে নিয়ে। কুমারীর বুড়ো বাবা আর এলেন না। তাঁর শ্লেষ্মার ভাবটা আজ অবার নতুন ক'রে দেখা দিয়েছে—ঠাণ্ডা লাগাবেন না। নির্ব্বিকার পুরুষ—যে বলে হ্যাঁ, তা'তেই তিনি ঘাড় নাড়েন—সত্যিই। এদের চলা-ফেরা তিনি লক্ষ্য করেন না। শুধু দুঃখ ক'রতে শিখেছেন—তাঁর মেয়েটা অকালেই দুঃখের বোঝা মাথায় নিয়েছে।—তারপর যে কি হ'য়েছে, হ'চ্ছে জানেন না।

বাদুড় ওড়ে ডালে ডালে শব্দ ক'রে—তা'দের ডাক প'ড়েছে বনে বাদাড়ে। ঝিঁ ঝিঁ ডাকে—তাদের গালায়ও ডাক প'ড়েছে। জোনাক ওড়ে অশ্বত্থের গায়। ছাতিম ফুল চমৎকার দেখতে কিন্তু—গা দিয়ে যেতে কুমারী দেখে নিলে। অন্ধকারে চ'লতে অসুবিধে হ'লে কি হয়—দিব্যি চ'লেছে। সবি আজ কুমারীর কাছে চমৎকার। চাঁদ যদি উঠ্‌তো কুমারী তা'কে বলতো তবে,—ওর হাসির চেয়ে কুমারীর

বুকের ভেতরকার হাসি অনেক উজ্জ্বল—চির-পূর্ণিমা। কুমারীর চোখ জ্ব'লছে। দু'চোখে দুনিয়ার সব কিছু ও আজ নাগাল পেয়েছে। দু'হাত বাড়ালে ও এখন সব ধ'রতে পারবে। কিন্তু অমিতকে কি ধ'রতে পারবে? আজ না হোক দু'দিন পরে নিশ্চয়ি পারবে—কুমারী তা' জানে।

হোঁচট খায়, পায়ে তবু লাগে না। ওর কাছে এটা অভিসারের রাত্রি। বজ্রকে ও ভয় করে না। ধ্রুবর মতো ও আজ নির্ভিক। ও যাকে চাইছে দেখছে শুধু তাকেই।

মা অনেকক্ষণ থেকেই অমিতর সঙ্গে কথা কইছেন। উনি এখন থামলে পারেন। কুমারী একটা কথা অন্ততঃ বলুক। থামেন না তবু।

অমিতাভ পেছন ফিরে চায়,—কুমারী, আসছো তো?

মা-র খেয়াল হ'লো—পিছিয়ে পড়লি কেন? দৌড়ে আয়।

দৌড়ে না, হেঁটেই আসে।

কাছে এলো, আরো কাছে আসতে চায়। অমিত আবার হাঁটে।

প্রথম জীবনে, চমৎকার দেখিয়েছে তবু। অমিতর মধ্যে এতটা আছে, কেউ জানতো না।

কুমারীর লেগেছে আরো ভালো। সেই কথাই ভাবছে কাল রাত্তির থেকে।

কুমারী ক'রছে বিছানা, অমিত এসে হাজির। লজ্জায় ওর সমস্ত শরীর থম থম করছে;—স'রে দাঁড়ায়।

দু'জনের বুকের মধ্যের প্রজাপতি দু'টো বড়োই দাপাদাপি ক'রছে প্রচণ্ড উন্মত্ততা !

সামলে নিয়ে কুমারী বেরিয়ে গেল,—মা, তুমি কোথায় ?

ঘাটে গেছেন নিশ্চয়ি, নইলে সাড়া দিলেন না কেন ? কুমারী তবু ডাকছে, ওর একটা সাড়া এখন চাই-ই।

অমিত ব'সে প'ড়েছে চৌকীর ওপরেই কাজ পাচ্ছে না, এ-দিক ও-দিক চাইছে।

প্রমত্ততাকে এখনো সে দমিয়ে আনতে পারে নি।

কুমারী এমন সময় আবার ঘরে এলো ? নির্জ্জন বাড়ি। বাবা গেছেন বাজারে !

জোয়ার ভাঁটারটানে নেমে গেছে। কুমারী ঘরে নেই। পাগলের বিষ কে যেন তা'কে খাইয়ে দিয়েছে। চনমন ক'রে ঘুরছে এ-ঘর সে-ঘর। তা'র হাতে অনেক কাজ। অমিত চ'লে যাক্, ও-ঘরে ওর কাজ আছে।

কুমারী ভাবছে,—কি বেহায়া এই পুরুষ জাতটা। মা এসে কি মনে ক'রবে—ফাঁকা বাড়ি !

দিনে ডাকাতি। মা এলেন এতক্ষণে।

শিশু গাছে পাপিয়াটা বড়ো কাঁদছে। কুমারীর মনটা মাতৃত্বের গর্ব্বে অস্থির হ'য়েছে—পাপিয়াটার মতোই। করমচায় রঙ ধ'রেছে—ফিকে। কুমারীর মনে স'বজে ছোপ লাগছে। কুমারী এখন অগাধ জলে।

একটা ছোট্টো খোকা কুমারীর আঁচল ধ'রে টানছে ; ডাকছে,—মা।

অমিতাভর বুকখানা ফুলে উঠছে। ছু'জনে খোকাকে চুমু খাচ্ছে, সোহাগ ক'রছে ; চোখ বুজে খোকা আদর নিচ্ছে। সে সব এ-দেশে নয় ; অনেক দূরে—সে দেশে গাছ নেই শুধু—ফুল ; কাক নেই শুধু কোকিল।

হঠাৎ সব-চিন্তা লেপটে একাকার হ'য়ে গেল।—ব'সে ব'সে ভাবছিস্ কি ? লক্ষ্মীর বাসনগুলো মেজে আনলে হ'তো না এতক্ষণ ?

তারার থেকে একদম উদারায় !

ধড়মড়িয়ে উঠে প'ড়লো। এলো মেলো চুল চোখে মুখে ঢুলছে। এলো খোঁপা কখন খুলেছে ও জানে না। বাঁ হাতে চুল ঘুরিয়ে কোনো রকমে •বাঁধলো। ধীরে ধীরে উঠলো। ভয় ক'রছে বাইরে যেতে—অমিত বোধ'য় যায় নি এখনো। ওর আক্কেল দেখে কুমারী থ' হ'য়ে যায়। পিলসুজ ধ'রে কেবল নাড়া চাড়া ক'রছে, বাইরে যেতে ওর মন চাইছে না।

—ওমা, অমিত একা-একা ব'সে আছিস্ ? কেন, ও-ঘরে কুমারী আছে গেলেই পাত্তিস্।—মা বল'লেন।—আয় বাইরে আয়। ব'স্, কুমারী পিঁড়েটা দে-তো এদিক এসে।

—না আমিই নিচ্ছি।

কুমারী ধন্যবাদ দিলো অশেষ অমিতকে, উদ্দেশে নিযুত নমস্কার ক'রলে।

—চমৎকার হ'য়েছে কিন্তু তোরটা, কে শেখালো রে ?

মনে-মনে ব'ললো—কুমারী ; মুখে ব'ললো,—কেউ না, নিজেরাই। হাসলো।

—আর একদিন কর্ না, শুধু মেয়েদের জন্যে,—মা আব্দার করেন।

অমিত অন্য কথা ভাবছে, তিনি কি ব'ললেন শোনেই নি। সে তো এখন আর কিছু শুনতে চায় না!

ছুটি ফুরিয়ে গেল। অমিত চললো ক'লকাতায়। আর এখন কলেজ কামাই চ'লবে না। ফাইনাল পরীক্ষা এলো ব'লে। পড়াশুনা এবার আরম্ভ ক'রতেই হ'বে।

চিঠিপত্র আনাগোনার স্থবিধে থাকলে তা' হ'তো। কিন্তু তা তো কিছুই নেই।

কুমারী দিনে দুপুরে দুঃস্বপ্ন দেখে। যাবার দিন তা'র সঙ্গে একবার দেখা ক'রে গেল না? নিশ্চয়ি তাদেরো লজ্জা আছে, আসতে পারে নি তাই—ও ভাবে, আবার ভাবে সব আবোল তাবোল। মনটা খারাপ হ'য়ে আসে ওর। বড়দিন কবে? পূজোর ছুটির পরেই তো বড়দিন। কার কাছ থেকে সংবাদটা নেয়!

আবার এলে নিশ্চয়ি প্রতিশ্রুতিটা সম্পূর্ণ ক'রে নিতে হবে। তা'র দু'চোখে দুর্ভাবনার আবছায়া, মুখে আতঙ্কের মালিন্য; সমস্ত দেহে একটা উদভ্রান্ততা। কুমারীর দেহ দুর্ব্বল হ'য়ে আসচে।

সেদিন উত্তরা যেমন ক'রে নিষেধ ক'রছিলো অভিমন্যুকে—তুমি যেয়োনা, তুমি যেয়োনা। এবার কুমারীও তেম্নি ক'রেই তা'কে বলবে, আর একবারটি দেখা পেলে হয়। অভিমন্যু তবু গেল, আর তো ফিরলো না। কুমারী ভাব্তে পারে না, অস্থির হ'য়ে ওঠে। শুয়ে ছিল উঠে

ব'সলো। জানলা দিয়ে তাকিয়ে রইলো সুদূর ভবিষ্যতের দিকে—দিগন্তের পানে। আচ্ছা, ওখানেই কি জগতের শেষ, আকাশ যেথায় তার সঙ্গে মিশেছে? ভবিষ্যতের যতদূর কুমারী ভেবেছে তা'র পরে কি আর ভাবা যায় না? আকাশে শাদা মেঘ, মাঠের বুকে ধান গাছ, রাখালের মুখে বাঁশের বাঁশী আর কুমারীর বুকে ব্যথা। এই তো পশ্চিম দিক, এই দিকেই কলকাতা। কতদূরে, বোধ'য় দশটা দিগন্তের পরে। এই দিকেই গিয়েছে অমিতাভ, কুমারীর দিকেই সে এখন চেয়ে আছে—পেছন ফিরে। বন্ধুরা তা'কে কিছুতেই হাসাতে পারছে না। বই তা'কে কিছুই বোঝাতে পারছে না। নিশিদিন সে কুমারীর কথাই ভাবছে। আজ একাদশী, খাওয়া দাওয়া নেই, অনেক কাজ ক'মেছে। ভাবতে পারছে, তাই। সন্ধ্যের সময় তো সেই দু'টী ফলমূল, তা' না খেলেও চ'লবে। এ পাড়ার কেও আজকাল কলকাতা যাবে না? অমিতের একটা সংবাদ তারা এনে দিলে পারে কুমারীকে। কিন্তু কুমারী কি ক'রে তা'দের জিগগেস ক'রবে? তা' হয় না। অমিতই ফিরে আসুক আবার। তারা দু'জনে এক সঙ্গে থাকবে। একা একা থাকা যে কি দায় তা বন্দীর জীবনই জানে আর জানে কুমারী। পশ্চিমে-হাওয়া এলো, নিশ্চয়ি অমিতর দীর্ঘনিঃশ্বাস। কুমারী তাকে বরণ ক'রলো সঙ্গোপনে।

বিছানায় নেতিয়ে পড়ে। ক্ষিদেয় চোখে আসে তন্দ্রা, অবসন্নতা। চিন্তার চাবুক তাকে পিটে পিটে জাগিয়ে তোলে, তবু ঘুমায়; স্বপ্ন আসে চোখ ভ'রে। স্বপ্নের মানে কুমারী ভেবে পায়না:

তা'রা দু'জন দৌড়ে দৌড়ে পাহাড়ে উঠছে—দুর্গম পথ। কুমারীর

শরীরের বল ক্রমে আসচে ক'মে তবু চ'লেছে,—গৌরীশঙ্কর দেখবেই। আর পারছে না; ব'সে প'ড়লো। অমিত থামছে না, পেছন ফিরছে না। কুমারী আবার উঠলো, তার যে ওর সঙ্গ না হ'লে কোনো রকমেই চ'লবে না। দৌড়ে দৌড়ে হাঁটুদু'টো অবশ, ভেঙ্গে আসচে, তবু ওর যাওয়া চাই-ই। অমিত ফিরলো, চোখ দু'টো তা'র রক্তবর্ণ, দেখলে ভয় হয়। কুমারীকে জিগ্‌গেস ক'রলো,—পারছো না? কুমারী মাথা নেড়ে জানালো—না, একটু থেমে নি। অমিতাভ এ বিঘ্ন চায় না। ব'ললো, তুমি থাকো তবে, চললেম। কুমারী চীৎকার ক'রে উঠলো,—আমায় ফেলে যেয়োনা, তুমি ফিরে এসো, ফিরে এসো! অমিতাভ ফিরলো, তা'র কাছে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর কুমারীকে চেপে ধরলো দুই হাতে, কুমারীর দেহে এলো বল। উঠে দাঁড়াতেই অমিতাভ তাকে নিচের ওই মহাসমুদ্রে দিলো ঠেলে। কুমারী আঁৎকে উঠলো। দেখে চৌকীর ধারে শুয়ে, একটুর জন্যে নিচে পড়েনি।

এ-স্বপ্নের কি মানে হ'তে পারে? এটা একটা সত্যিই কি স্বপ্ন! দু'চোখের সামনে তা'র মূর্তিমান দুঃস্বপ্নটা ঘুরছে। তাড়াতে গেলে স'রে আসে আরো কাছে।

কুমারী উঠে ব'সলো—বিকেল হ'য়েছে। আর না, আর শুলে চ'লবে না। ও-ঘরে বাবাকে মা বেলের পানা তৈরি ক'রে দিচ্ছেন। তাঁরও আজ একাদশী—তিনিই কুমারীর একমাত্র ব্যথার ব্যথী কি না!

দিন পনোরো কাটলো তবু অমিত ফিরে এলো না।

কুমারী খায়-দায় তবু যায় শুকিয়ে। তা'র মুখের লাবণ্য মিলিয়ে

আসচে। পুকুরঘাটে গিয়ে ভাবে ডুবে মরি, আবার ভাবে মরলে হ'বে কি ক'রে, অমিতর সঙ্গে যে তা'র দেখা হওয়া চাই-ই। অনেক কথা আছে তা'র সঙ্গে। যেমন আসবার তেমনিই আসে ঘাট থেকে ফিরে।

একলা যে ও কাটাতে পারে না সে কথা কেও বুঝতে চায় না। পাড়ার যত মেয়ে সবাই গেছে শ্বশুর বাড়ি, যারা শ্বশুরবাড়ি এসেছে তা'দের সঙ্গে ও ওর পোড়া-মুখ নিয়ে আলাপ ক'রতে যায় নি।

হঠাৎ আজকে সব জিনিষের রঙ গেল ব'দলে। অমিত ফিরে এসেছে। কুমারী খবরটা পেল অমিতর কাছেই।

আড়ালে পেয়ে প্রশ্ন করে, ভয়ানক রেগেছ নিশ্চয়ি। যাবার দিন আসতেই পারলাম না।

কুমারী কি কথা ব'লবে তাই ভাব্‌ছে। ওর অনেক কথা আছে বলবার তাই বোধ'য় কিছুই মনে আসচে না।

দু'জনে ছবি আঁকছে। কুমারীর ইচ্ছে, সে কোথাও চ'লে যায় অমিতর সঙ্গে না-হয় এ-দেশে থেকেই বিয়ে করে। কুমারীর বাবার তো ফের বিয়ে দিতে কোনো আপত্তি নেই। সে কথা তো সবাই-ই জানে।

অমিতর সঙ্গে তার বিয়ে হোক। নইলে কুমারীর দুঃখ ঘুচবে না।

অমিত কি ক'রবে তা? সেই যে চিঠিটা তা'র কথা তো ভোলেনি কুমারী, কুমারী আশা রাখে অমিত তাকে পরিত্যাগ কিছুতেই ক'রবে না। অমিতর সঙ্গে দেখা হওয়ায় কুমারীর মনে আজ এটুকু আশা এসেছে।

এটুকু আড়ালে ওদের মন উঠছে না। ওরা চায় সবার চোখের সামনেই ওরা আড়াল হবে।

একদা

অমিত চুমায় চুমায় কুমারীকে উদ্ব্যস্ত ক'রে তুললো হঠাৎ। কুমারী তা'র হাতের বেড়ি ভেঙ্গে মুক্ত হ'তে চায়, মুমুক্ষায় ওর প্রাণ কাঁদে।

ছেড়ে দিলো। ব'ললো,—বিয়ে তোমায় করবোই।

কুমারী এলোচুল জড়ায়, ব'লে ফেলেঃ ক'রবে তো? নইলে বুঝছো তো আমার জীবনের পরিণাম?—কুমারী মনের কথা খুলে বলে।

আশ্বাসবাণী অমিত দিতে শিখেছে প্রচুর, হাজারো রকমে। বলে,—বলেছিতো যাকে আমি ভালোবাসি প্রাণ দিয়েই বেসে থাকি। পরীক্ষাটা হ'লেই ব্যস্—দেখে নিয়ো।

অবাধে মেলামেশা।

অমিতদের মস্ত বাড়ি, বিজগতি দরদালান। কুমারী আজকাল সেখানে যেতে শুরু ক'রেছে—গোপনে। অমিত প্রাণ ভ'রে তার সঙ্গে মিশছে।

চোরের মতো ফিরে আসে—অন্ধকার পথ দিয়ে।

অমিতর বাবা জোর ক'রে তা'কে পাঠিয়ে দেন ক'লকাতায়। বলেন, পড়াশুনা না হ'য়ে থাক তবু পরীক্ষা দিতেই হবে।

অমিত এদের বাড়ি আসে কুমারীর সঙ্গে দেখা করে। প্রাণের যত কথা সব কুমারীকে বলে। কুমারী চুপটী ক'রে শুনে যায়। একটা কথার জবাব পর্য্যন্ত দেয় না।

অমিত তবে সত্যিই চ'লে গেল। ওর প্রাণে বেহাগ বাজে নি কি? কুমারী জানে—নিশ্চয়ি বেজেছে। পাষাণ দিয়ে বিধাতা

পাহাড় গড়ুন কুমারী আপত্তি ক'রবে না কিন্তু অমিতকে যেন মোমে চিরদিন বানিয়ে রাখেন। কুমারী এই-ই চায়। কুমারীর এ কৌমার্য্য ভাঙবে কেবল অমিতই। প্রথম যেদিন তা'র সঙ্গে এর পরিচয় হ'লো সেদিনকার কথা কুমারী আজ ভাবছে। ছিপ ছিপে ছোকরা—কি চমৎকার। ওকে দেখেই কুমারীর বুকে কেকা বাজছিল আর ষড়জ ধ্বনিত হ'চ্ছিলো। প্রথমে কে ক'য়েছিলো কথা? কুমারী তো বলেনি। ব'লেছিলো ওই। কি মোলায়েম কণ্ঠস্বর! কুমারীর প্রাণে মৌ ভ'রে যাচ্ছে আজকে। ব'লেছিলো,— তোমার নাম বুঝি কুমারী? চমৎকার নাম, খাসা।

গায়ে প'ড়ে কথা ব'লেছিল তবু তো বিশ্রী শোনায়নি। নিশ্চয়ি যাদু জানে অমিত। অমিত, তোমাকে কুমারী আজ তার জন্যে কি পুরস্কার দেবে? যা' দিয়েছে তার চেয়ে বেশি দেবার ওর আর কি আছে তুমিই ব'লে দাও!

সেবার গিয়েছিলো, কুমারী পেয়েছিল—হতাশা। এবারো তো গেল, তবুও পেয়েছে, কি পেয়েছে কুমারী ভেবে উঠ্‌তে পারে না। সমস্ত বাড়ীখানা ও টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। ওর প্রাণে জোয়ার এসেছে। দু'কূল ভাসাবেই।

শীত প'ড়ে আসচে।

কুঁড়ি ফোটে না। তবু কুমারী ছাখে সারাবাড়ী কুসুমহার। কুসুমেষু ওর প্রাণে ছড়াচ্ছে আঘাত নয়, শুধু হাসি।

স্বর্গ উপহার দিতে এলে ও প্রত্যাখ্যান ক'রবে। এটুকু গর্ব্ব ও রাখে।

হষ্টেলে সারাদিন কাটিয়ে দেয় ব'সে ব'সেই। পড়াশুনা ও ক'রবে না ঠিক ক'রেছে। জব্দ ক'রবে বাবাকে, দেখাবে জোর ক'রে কাজ করানো চলে না।

নিশ্চল, নির্ভিক। ছেলেরা অনুমান করে, পড়ার ভাবনা ভেবেই ওর হাড় হ'চ্ছে কালি।

একটা চিঠি লিখবে কুমারীকে ? কেও দেখে ফেললে ! পিওনটাকে শিখিয়ে দিয়ে এলে হ'তো, দুটো টাকা হাতে গুঁজে।

কুমারীর মনে ফের ঢুকেছে দুর্ভাবনা। কোন পথ দিয়ে এলো ? সমস্ত দিকই ওর আনন্দে ছিল ভরা।

পুষ্প ওকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলেছে। সারাদিন ক'রবে অমিতর গল্প। ওর ভালো লাগে, কিন্তু পুষ্পর মুখে তা'র প্রশংসা ওর ভালো লাগে না আদৌ। টুকটুকে মেয়ে হ'লে হবে কি ও হাতুড়ি ঠুকতে পারে দিব্যি অন্তের ক'লজেয়। সে কত কথা। সারাদিনটা কুমারীর মাটি ক'রে দেয়। একটু ভাবতে দেয় না সুস্থির হ'য়ে অমিতাভর কথা।

কুমারীর বুক করে দুদ্দুর। সমুদ্দুরের মাঝে ছোট্টো পান্সিতে চড়িয়ে পুষ্পই ওকে একা ছেড়ে দিয়ে এলো। ওযে সাঁতার জানে না !

পুষ্প কোমড়ে কাপড় জড়ায়, বলে,—আয় কুস্তি করি, দেখি কার জোর বেশি। হঠাৎ এ-খেয়াল কেন কুমারী বোঝে না। ফুর্ত্তির প্রাণ মর্জ্জির দাস। কুমারী বিছানা ছেড়ে উঠতেই চায় না। হাত ধরে টেনে নামায়, বলে,—দাঁড়া, এম্নি ক'রে আগে ধরতে হয়, ব্যস্

তারপর "সামনা নিকাল"; জুজুৎসুর প্যাঁচ, বাবা যে-সে নয়। ইস্কুলে শেখায় আমাদের। শিখবি তো শিখে নে।

ওর প্রাণে আজ লেগেছে নেশা। মাতলামি ক'রছে হয়ত'। কুমারীর বন্ধুই বটে ও। কলকাতায় পড়ে, চলে এলো হঠাৎ, তাই দেখা ক'রতে এলো।

আবার বলে,—গান গাব? তুই গা।

যা ইচ্ছে তাই। মাথার ঠিক নেই ওর।

—নাচ দেখবি? উদয়শঙ্করী? তাণ্ডব নৃত্য?

শুরু ক'রে দেয়, কোমড় বাঁকিয়ে, হাত লতিয়ে চোখ উল্টে। তেড়ে আসে কুমারীকে এক একবার।

কুমারীর বুকে তাণ্ডব বাজে।

—রবিঠাকুরের পদ্য শুনবি?

হেসে খল খল
গেয়ে কল কল
তালে তালে দিব তালি—

হাত তালি দিয়ে হেসে উঠে।

কুমারী ভাবে এর নিশ্চয়ি মাথা বিগড়েছে।

পুষ্পর হাবভাব কুমারীর ভালো লাগে না মোটেই। এরকম তো এ ছিল না। কলকাতার হাওয়াই বুঝি এমনি।

পুষ্প ধুঁকে গেছে। কুমারীর হাত থেকে রুমালটা কেড়ে নিয়ে বলে,—রাখ্, বুনবি এখন পরে। ব'সে পড়ে; পা দোলায় অতিরিক্ত।

—এবার একটা বুনোন হ'চ্ছে নাকি ?—তাচ্ছিল্য সবটাতেই। টেনে সব সেলাই দেয় খুলে।

কুমারীর মনে একটা বিতৃষ্ণা এসেছে ওর ওপর। এতকথা, কাণ্ডকারখানার জবাব দিচ্ছে না তবু একটাও।

কূয়োতলায় বালতির শব্দ হ'লো ঝন্ ঝন্ ক'রে। পুষ্প কাপড় ছড়াতে ছড়াতেই উঠে গেল দৌড়ে দেখতে।

এসে ব'ললো,—কিছু না কাক।

কুমারী শুনতেও চায়নি। কাগ হোক কি বাঘ হোক।

—একটা গুল্‌তি থাকলে দিতেম সাবড়ে। পুষ্প সবই জানে দেখছি। প্রগলভা মেয়েটা।

ও এখন যাক্। অনেক কিছুই দেখালো। কুমারীকে নিশ্বাসটা ফেলতে দিক্ ভালো ক'রে। ও তবু যাবে না। কুমারীর সঙ্গে এমন মেয়ের ভাব হওয়াই আশ্চর্য্য। তরল গালা, হাতে লেগে যন্ত্রণাও দেয়, সহজে ছাড়েও না।

চমৎকার দেখতে কিন্তু সে মাধুর্য্য নষ্ট ক'রছে নিজেই। স্বভাবের আগুনে তা'র রূপের রঙ যাচ্ছে ঝলসে।

পিঠ বার করা সেমিজ গায়ে দিয়ে এ-পাড়া ও-পাড়া ঘোরে নির্লজ্জের মতো। আঁচল লোটায় মাটিতে, সেদিক খেয়াল রাখে না।

হঠাৎ আবার ব'লে ওঠে,—তাস আছে ? আয় 'নাল' খেলি। ও সব নিয়েই একটা বাহাদুরী নিতে চায়। বেশি দামে বিকোতে চায় বাজারে।

তাস কোনোদিনো আসেনি এ বাড়িতে। তবু অদ্ভুত একটা কিছু বলা চাই-ই ওর।

—মাষ্টার মশাই একটা যা গান দিয়েছে আমাকে—মারভেলাস্। দাঁড়া, সুর তুলে নি, শোনাবো।

কুমারী শুনতে চায় না কোনোদিন।

ভেবে ভেবে যত সব বাজে কথা! বলবার কথা পায় না, চুপ ক'রে থাকে, আবার দমকা বাতাসের মতো চমক ভাঙায়, নিজের নতুন উজবকী কথা ব'লে বসে হঠাৎ।

পুষ্প এবার সত্যিই যাক্। কুমারীর সর্ব্বাঙ্গ উঠছে বিষিয়ে, মন উঠতে ব্যথিয়ে।

—অটোগ্রাফের খাতা দেখবি আমার? সব বড়ো-বড়ো লোকের নাম সই বাগিয়েছি। রবিঠাকুর থেকে সবার, গান্ধীরো। আর একটা যা চমৎকার অ্যালবাম আছে, ওঃ সুপার ফাইন।

কুমারী কিছুই দেখতে চায় না।

পুষ্প তবে সত্যিই উঠলো। গা মোড়ামোড়িই দিচ্ছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। হাই তুলছে তাও ভালো, ভেবেছিলাম আরো কিছু বলে নাকি।

—রুমালের ফোঁড় বুঝতে পেরেছিস তো।—ব'লবেই।

কুমারী ঘাড় নেড়ে জানায় বুঝেছে। তবু এগিয়ে এসে আবার বলে,—এদিক দিয়ে এমনি ক'রে ঘুরিয়ে আনবি বুঝলি, শক্ত না তো, খুব সোজা।

পুষ্প গেল তবে।

—কাল দুপুরে আমাদের বাড়ি যাবি? দিব্যি গল্প হবে। তারপর গ্রামোফোন, রেণুকা সেনের রেকর্ড শুনবি। একসেলেণ্ট গান। যাস কিন্তু।

ফিরে চেয়ে একটু মুচকে হেসে বলে,—দাঁড়ানা, আমিও দিচ্ছি রেকর্ডে। ব'লে চোখ ঘুরিয়েই চ'লে গেল।

কুমারী নিশ্বাস ফেলেছে।

পঞ্চমী চেয়ে দেখলো কুমারী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো। কত কথাই না ও ভাব্‌ছে এখন। পঞ্চমীকে আজ কুমারী কথা কইতে দেবে না। ওকে ভাবাবে, নিজেও ভাববে। পঞ্চমী স্থশীলকে এ-বিষয় নিশ্চয়ি ব'লবে এবং সে কি বলে শুনবে।

কুমারী আজ অসহায়—সম্পদহীন।

কুমারী নিশ্বাস ফেলেছে। রুমাল বুনোন্‌ থাক্‌ প'ড়ে। অমিত আর একটি বার ফিরে আস্থক। তা'কে ওর সব কথা তো বলা হয় নি! তা'র সামনে এলে সব কথা কুমারী ভুলে যায়, এবার কিছুতেই ভুলবে না।

বালিশ দুমড়ে ছেঁড়বার দশা! কুমারীর শোয়াই ঠিক হচ্ছে না, ওর মন ক'রছে ছট্‌-ফট্‌!

'চোখ গেল'—কেঁদে গেল কে? কুমারীর যে বুক গেল সে কথা কুমারী চীৎকার ক'রে ব'লবে?

পুষ্পকে ওর আর ভালো মোটেই লাগছে না। সে এলো কেন? তাকে ডেকে পাঠালো কে? কুমারী কখনই ডাকে নি।

কুমারী বুঝলো স্বর্গ নরক কাছাকাছিই। মুহূর্ত্তের মধ্যে নইলে......

অমিত ফিরে আসুক। বড়দিনের আর কত দেরি? ছুটিতে আসবে তো? অমিতো হয়তো তার জন্য এমনি ক'রেই ভাবছে।

দিনগুলো তবু কেটে যায়। কুমারী গোণে ক'দিন গেল। তারিখ আজকাল ওর ঠোঁটে। পাঁজির পাতা মুখস্থ ব'লতে পারে অনায়াসে কিন্তু তা বলবে না, তেমন মনের অবস্থা ওর নয়।

বহুদিনের পুঞ্জিত ব্যথা কুমারীর বুকে টাটাচ্ছে। অনুতাপের হাতুড়ি ব্যথার ওপর দিচ্ছে আঘাত, ওর বুকখানাকে যেন পেয়েছে সকলে নেহাই! নিজেদের বুকে ঘুষি মেরে দেখো তো লাগে নাকি?

আজ পুষ্পর জন্মতিথি। ঘটার মেলা ব'সেছে পাড়ায়। বুড়ো মেয়ের আবার কিনা এই? বুড়িরা বলেঃ এ বয়সে মেয়েরা খায় সাদ্—তাদের ছেলের হয় মুখে ভাত।

কুমারীকে যেতে ব'লে গেছে বারে বারে। মা নিষেধ তো ক'রলেনই না, যেতেও ব'লছেন ভুয়ে ভুয়ে।

—খাবি না তো কিছু, দেখবি শুনবি চলে আসবি। মা যেতেই বলেন।

কুমারী তবে যাবেই। সবার বিরুদ্ধে গিয়ে শত্তুর বাড়াবে না। একাই যাক্ তবে। কুমারী বেরুলো বাড়ি থেকে।

বাড়িতে লোক ধরে না। অনেকে এসেছে—পাড়া ঝেঁটিয়ে। কুমারী ঢুকলো।

কুমারী জেগে দেখলো স্বপ্ন, স্বপ্নের মধ্যেই চীৎকার ক'রে ব'ললো —আশ্চর্য্য। অমিত এখানে? কবে এলো?

একদা

অমিত কুমারীকে দেখে বাড়াবাড়ি ক'রলো না কিছুই। এগিয়ে এসে ব'ললো,—পুষ্পর বন্ধু এসেচে। কাকে যেন শোনালো।

কুমারীর গায়ে জ্বালা এসেছে। অদ্ভুত!

ও এলো কখন? কবে?

—এই আসচি, ষ্টেশন থেকে বরাবর এখেনে।—কুমারী তো জিগ্‌গেস করেনি।—ছুটি হ'য়েছে কাল, তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলেম। আবার ফিরে যাব ছুটি ফুরালেই।—লোকজনের মধ্যেই সবার সুমুখে গোপনেই ব'ললো কুমারীকে। কুমারী জিগ্‌গেস ক'রেনি। —পেটুক মানুষ জানোই তো, নেমন্তন্নের নাম শুনলেই—বুঝলে,—হেসে চ'লে যায় ওদিকে দৌড়ে, ওর অনেক কাজ।

আজ পুষ্পর জন্মদিন।

কুমারী যখন ফিরলো তখন চাঁদ উঠেছে। সেই আলোয় পথ খুঁজে বাড়ির পথে যায়। এ-আলো আজ তার কাছে অন্ধকারের চেয়েও গাঢ়।

ওবাড়ীর ফুর্তি এখনো ফুরায়নি। অমিত ওখানেই রইলো। থাক্, পুষ্পর সঙ্গে ফাজলামো করুক, হাসি ঠাট্টা ইয়ারকি। ও যা' উপহার এনেছে কলকাতা থেকে ব'য়ে, তা' দিক পুষ্পকে। উপহারের গায়ে মাখানো আছে অমিতর প্রাণের দরদ! সে দরদ মাখুক পুষ্প নিজের গায়ে। কুমারী এ সব দেখতে পারবে না। ও গিয়েছে, ভালোই হ'য়েছে অন্ততঃ ওর পক্ষে।

পুষ্প অমিতর গল্প ক'রেছিলো সেদিন, প্রশংসা ক'রেছিল প্রচুর। আজ পুষ্পর সম্মুখে উপহার জ'মেছে অঢেল, এর চেয়েও বেশি প্রশংসা

সে ক'রেছে অমিতর কুমারীর কাছে। সে কথা অমিত জানে না। কস্তুরীর মতো পাগল অমিতর মনটা কিন্তু পুষ্প তা'র সম্মুখেই। ভিমরুলের চাকের মধ্যে ব'সে অমিত আরষ্ট।—ন'ড়তে ভয় পাচ্ছে, পাছে চাক ভাঙে।

মস্ত কাঁচের ফুলদানি। কাজ করা অসম্ভবরকমের সুন্দর তার ওপর। পুষ্প অমিতর হাত থেকেই নিয়েছে। পুষ্পর মুখের মতো সুন্দর দেখাচ্ছিলো ফুলদানিটা—অমিতর কাছে।

—'বোকে' বসিয়ে সাজিয়ে রেখো, পড়ার টেবিলে।

পুষ্পর মন্দ লাগলো না অমিতর এ কথা।

বাড়ীতে ভাঙন শুরু হ'য়েছে। মেলা ফুরোলো। অমিতো ফিরলো ঘরে। সকালে এসে রাত্রে বাড়ী যেতে অমিতর লজ্জা ক'রলো না। বলে আবার,—লজ্জা মেয়েদের একচেটে। ঐ ওদের আভরণ, ওরা করুক।

বাগচিদের ছেলের সঙ্গে ভাব ক'রে তাদের পুকুরে মাছ ধরে। ছিপ চেয়ে নিয়েছে ওর কাছ থেকেই। ধৈর্য্যের মাপকাঠি!

সারাদিন কাটে, পাশে জমে শুধু ছাই। সিগারেটের শ্রাদ্ধ! মাছ পেয়েছ দু'টো পুঁটি, আবার দিয়েছে ছেড়ে।

পুষ্প চলেছে কুমারীর কাছে, অনেক কথা আছে তা'র। পুকুরের ধার দিয়ে যখন হাঁটছিলো অমিত তাকে দেখে নিয়েছে;—তার ছায়া জলে ভাসছিলো অমিত তাও দেখেছে।

পুষ্প হাসে, কথা বলে না। মাছধরার বহর দেখে অবাক হয়।

অমিত বলে,—কোথায় চ'লেছ ?

—কুমারীর কাছে। সংক্ষেপে জবাব দিয়ে ও হাঁটেই।

—দাঁড়াও, আমিও যাবো ঐ দিকেই। অমিত ছিপ তুলে উঠে পড়লো।

—পরে আসবেন, আমার তাড়াতাড়ি আছে।

পুষ্প হাঁটে তাড়াতাড়ি, মনে ভয় হয় অমিত আসছে বুঝি।

পুষ্প তা'কে সেদিন ব'লেছিলো,—ভদ্রতা শিখবেন। যা বলবার থাকে, পথে নয়, বাড়ি যাবেন সব শুনবো।

অমিত ফিরে গিয়েছিলো বাঁ দিকের পায়ে-হাঁটা পথ দিয়ে। পুষ্পকে ও চিনতে পারেনি।

অমিত সত্যিই গিয়ে হাজির হয় সন্ধ্যের সময় পুষ্পর কাছে। পুষ্পর মুখে হাসি নেই দেখে ও আশ্চর্য্য হয়। পুষ্পর মাকে ডাকে, বলে,—পুষ্পর হ'লো কি ? ব'কেছেন বুঝি !

পুষ্পর গা জ্ব'লে যায়।

অমিত ওর সঙ্গে দেখা ক'রবেই। পুষ্পও পালিয়ে বেড়াবে।

খাতা গুছোচ্ছে ঘরে। অমিত ঢুকে প'ড়লো।

—বাড়িতে এসেছি, এবার শোনো।

পুষ্প হেসে ফেললো।

আকস্মিকতায় অমিতর স্পন্দন হয় বেশি। হঠাৎ কিছু ব'লে ফেলতে পারে না।

—রোজই তো আসছি তোমাদের এখানে, শুনো একদিন। কি ব'লবো বুঝতে পাবে.নি এখনো ?

পুষ্পর মুখে আসে মালিন্য, গাম্ভীর্য্য।

প্রগলভা হ'য়ে ওঠে গম্ভীরা। মুখ হ'য়ে ওঠে থমথমে। চমৎকার দেখায়।

অমিত তাই দেখে, তা'র নিধুবনের বাঁশী বেজে ওঠে—আরো জোরে।

পুষ্প বেরিয়ে যায় ঘর থেকে কাপড়ের আঁচল গায়ে জড়িয়ে।

অমিত ফিরে এসেছে ওদিকের পাথেয় হারিয়ে। কুমারীকেই ওর বেশি পছন্দ এখন। সারাদিন গল্প করে, মা থাকেন সামনেই ব'সে কোনোদিন খই বাছেন, না হয় করেন কাঁথা সেলাই।

কুমারীর আজকাল মনের মধ্যে বড়োই কাকুতি। অমিতকে ও কি যেন ব'লতে চায়। ওকে কেও যদি কথা গুলো সাজিয়ে দিয়ে আসতো!

অমিত বলে,—এই বৈশাখে তোমায়-আমায় বিয়ে, সে-কথা শুনেচ?

কুমারী শোনে নি। শুনে ওর প্রাণে ঝর্ণা ওঠে গান গেয়ে।

—সবার মত্ আছে। যদিও জিগ্‌গেস করিনি কাউকে।

পুষ্প কুমারীকে বলেছে,—অমিতর যত প্রশংসা করিছি, সব জানবি নিছক মিথ্যে। ওকে চিনতাম না ভাই। মেয়েদের সঙ্গে কথা কইতে জানে না। পথে পেয়ে ক'রতে আসে অপমান। কুলাঙ্গার একটা। ভালো ছেলের আবরণে গা ঢাকা দিয়ে যা ইচ্ছে তাই?

কুমারী চোখ দু'টো বড়ো ক'রে নীরবে প্রশ্ন করে।

আবার বলে,—ভালো লাগেতো সত্যি,—কিন্তু পুষ্প চ'লে যায় সব বলে না।

পুষ্পকে চিনলাম। সে যতই প্রগলভা হোক সে স্বেচ্ছাচারিণী নয়। আজও কুমারী তাকে চিনতে পারলো না। পুষ্পর মনের মধ্যে আছে হ্লাদিনী, বাইরে সে উলঙ্গ।

অমিতকে পথের ওপর সেদিন শুনিয়ে দিয়েছে আরো দুই কথা:

—অপমান ক'রবেন না অযথা! আপনি আমাকে চিনতে পারেন নি। স্বীকার করি, সে একদিন ছিল আপনাকে আমার ভালো লাগতো, কিন্তু আজ পথ ছেড়ে স'রে দাঁড়ান দেখি, নইলে ফিরে যাচ্ছি বাড়িতে।

অমিতাভকে এ রকম অপ্রতিভ কেও করে নি।

কুমারীর মনের কথাটা অমিতকে শোনাতেই হবে।

কুমারী অমিতর কাণের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে কি যেন ব'লে ফেলে, অনেক দিন থেকে ওর মনটা বিযাচ্ছে যে কথাটা।

অমিত বলে,—সত্যি? হাসে, সে হাসি মৃতের। মুহূর্ত্তের মধ্যে মিলিয়ে যায় মুখেই!

মনুমেণ্টের মতো সে নির্ব্বাক, দাঁড়িয়ে উঠলো। কুমারী একটা কিছু জবাবের জন্যে চাইছিলো তা'র মুখের দিকে। অমিত বেরিয়ে গেল। কুমারী প'ড়ে রইল একা।

অমিত মার বাক্স ভেঙ্গে টাকা নিয়ে পালিয়েছে। গিয়েছে জোহান্স-বার্গ—সোণার দেশে। কেউ জানে না সে গেছে কোথায়।

একদা

ইংরাজী নববর্ষ, অমিত নেই দেশে। চারিদিকে সংবাদ গেছে। খোঁজ-খোঁজ সাড়া। কলকাতায় টেলি। সেখানেও নেই।

কুমারী সংবাদ পেয়েছে। অদ্ভুত মর্ম্মবেদনায় সে ককাচ্ছে একা একা ঘরে শুয়ে। ওকে এ ব্যথা থেকে উদ্ধার ক'রবে কে? আজ ও বিষ খাবে, গলায় দেবে দড়ি, জলে ডুববে। অসহ্য!

কুমারীকে কেও যদি অজ্ঞান ক'রে দিতো! মরার মতো না হোক, আপাততঃ খানিকটা আফিম ওকে যদি কেউ দেয়! ও গুলো কি ওড়ে, কুমারী চোখে ধাঁধাঁ দেখছে। ওর মাথা ঘুরছে। বমি ক'রবে। সারা গা তেতো। জিভ চুষতে পারছে না—শুক্নো। একটু জল দাও ওকে। ওর দেহের এত শক্তি গেল কোথায়? উঠতে পারছে না কেন? ও যে ম'রবে, এখন একটু শক্তি ওর চাই-ই যে। উন্মদা!

ডাক্তার এলো।

—নশিয়া? দেখি।

পরীক্ষা করেন। কুমারী চোখ খুলে চাইতে পারে না তাঁর দিকে, ও দেউলে হ'য়ে গেছে!

ডাক্তার ব'লে গেল সব।

আজ এ বাড়িতে শুধু বিষাদ আর প্লাবন।

কুমারী কা'রো মুখ দেখবে না। ওর চোখ দু'টো অন্ধ ক'রে দাও না! অসহায় ভাবনা কুমারীর বুকে।

দিনের পর দিন চ'লেছে। অমিতর সংবাদ আসে নি। ফিরে নিশ্চয়ি আসবে একদিন। হয় তো হ'বে নেতা না-হয় বড়ো রকমের একটা কিছু কিন্তু জীবনে ও কী ক'রেছে সে প্রশ্ন আর কেও ক'রবে না।

যদি কুমারী বেঁচে থাকে সে ক'রবে নিশ্চয়ি। কুমারীর জীবনের ঘূর্ণি যাবে হয়তো ঘুরে, অমিতর সঙ্গে কোনো রকমে আবার তা'র দেখা হ'তেও পারে কিন্তু তখন কুমারী হ'বে কত ঘৃণ্য! কি অমিত? সে-তো কেউ দেখতে চাইবে না। অন্ধকার স্যাঁত-সেঁতে ঘরে হয়তো হ'বে তা'দের চোখাচোখি!

পুষ্পর বিয়ে হ'য়ে গেল। শ্বশুরবাড়ি যাবার আগেই অমিতর দে'য়া ফুলদানি ও ভেঙে গুঁড়ো ক'রে দেবে ঠিক ক'রেছে মনে-মনে।

অন্ধকার থাকতেই কুমারীরা বাড়ি থেকে রওনা হ'য়েছে গরুর গাড়িতে। সানাই বাজছে পুষ্পর বিয়ের, শেষ রাত্তিরের দিকে হয়তো লগ্ন। আলো দেখা যাচ্ছে ওই তো। আজ ওদের কী সুখ! কিন্তু কুমারী? সে চ'লেছে অনির্দ্দিষ্ট পথে—অজানাদের মাঝে।

যখন পুষ্প ফুলদানি ভাঙলো ঝনঝন ক'রে—এদের গাড়ি তখন দম-দমে দাঁড়িয়ে।

পুষ্প সুখে থাক! কুমারীর আশীর্ব্বাদ নিয়ো, পুষ্প। আর তোমরাও আজ ওকে দাও অভিসম্পাত, কুমারী তোমাদের কাছে তাই পাবে!

কুমারী এখন এলোকেশী, রাক্ষুসী। ত্রিভুবন গ্রাস করবার আগে ও চিবোবে অমিতকে।

এলোমেলো চুল চোখে চুলবুল করে। কুমারীর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ দেবার সময় এ নয়। চোখ দু'টো ওর ডগমগে রাঙা সিগনালের চোখটার মতো—ভোরে যেমন দেখেছিলো। ও-চোখের ভাষা পঞ্চমী মুখস্থ করতে চায়। কুমারী শূন্যে চেয়ে দেখে চিল উড়ছে অনেক উঁচুতে, অমিত কোনদিকে গিয়েছে ওকে জিগ্‌গেস করবে? ও নিশ্চয়

দেখতে পাচ্ছে তা'কে। জোহান্সবার্গে ব'সে ও বোধ'য় এখন কোনো শ্বেতাঙ্গিনীর প্রেমে মুগ্ধ। কুমারী জানে না কিন্তু ও যে সুদূর আফ্রিকায় চ'লে গিয়েছে, ও ভাবে আছেই কাছে-ভিতে কোথাও। এ-গাড়িতেও থাকতে পারে। কুমারীকে হয় ত' দেখেছে। কলকাতাতে আছে নইলে, হাওড়ার রাস্তায় যদি হঠাৎ দেখা হ'য়ে যায় কুমারী তা'কে ছিঁড়ে ফেলবে, দেবে গঙ্গারজলে ভাসিয়ে। এ-অন্যায়ের শাস্তি আরো বেশি, কুমারী অল্প ক'রেই দেবে!

টালার ট্যাঙ্ক ঐযে। ঐ ট্যাঙ্কের জল হয়তো অমিত খাচ্ছে এখন কোথাও ব'সে। ঐ দোতলা বাড়ীতেও থাকতে পারে। এক মুঠো বিষ দিয়ে আসবে ট্যাঙ্কের জলে?

পঞ্চমী ট্যাঙ্ক দেখিয়েছে কুমারীকে।

ও তবে বুঝলো ক'লকাতার এলাকায় এতক্ষণে গাড়ির চাকা গড়ালো। সুশীল প্লাটফর্ম-টিকিট কিনে ভেতরের বেঞ্চে ব'সে আছে নিশ্চয় এতক্ষণ। সিগলানটা দেখছে ডাউন, ওর সময় নিশ্চয় কাটতে চাইছে না। সুশীল এবার উঠে পায়চারি ক'রছে। পঞ্চমী ভাববেই।

হু-হু ক'রে ট্রেণ ঢুকলো ঘরে, গমগমে তার আওয়াজ। লোহার জিরোন্ এলো। পঞ্চমী মুখ বার্ ক'রে চাইছে, কই সুশীল কই? কি আক্কেল, ওকে তবে এখন কি ক'রতে হবে!

কুমারীকে আশীর্ব্বাদ করো পঞ্চমী, তোমাদের শুভেচ্ছা দাও, দু'কোঁটা স্নেহাশ্রু যদি এসে থাকে তবে তাও দিয়ো, ওর পাথেয় ব'লে মেনে নেবে ও। অভিসম্পাত ক'রতে তুমি পারবে না। সমস্ত দুনিয়া ওকে দগ্ধ করুক, তুমি দিয়ে এসো তবু এক কোঁটা গঙ্গাবারি!

কুমারীর বাবা এলেন। কুমারীর সঙ্গে পঞ্চমী কি কথা ব'ললো, গোলমালে কি শুনতে দিলো ছাই!

পঞ্চমী তবু নামলো, ট্রেণে ব'সে থেকে শান্টিঙে গিয়ে হেঁটে এসে কি লাভ। পঞ্চমী এগোলো গেটের দিকে, বেরোক তারপর যা'কর্ত্তব্য ক'রতেই হ'বে।

সুশীল হাসচে বোকার মতো। পঞ্চমী ওকে দেখতে পেয়ে মনে মনে পাঁচফুট লাফ দিয়ে নিলো—হাই জাম্প!

পঞ্চমী বাইরে এলো। খালি হাত-পা, সঙ্গে শুধু ছোট্টো অ্যাটাচি কেসের মতো কি যেন, ওরি মধ্যে কাপড় সেমিজ, ব্যস্!

—চারটে পয়সা খরচার মধ্যে গেলাম না—বাজে ব্যয় ব'লে। সুশীল পয়সা খরচ ক'রে নি।

উস্কো চুল, এবড়ো দাড়ি, চোখ-মুখ ধোয়নি ভালো ক'রে। নোঙরার চাঁই।

পঞ্চমীর হাত থেকে ওটা ওই নিলো—ভদ্রতা! পঞ্চমী দিতেও কোনো রকম কুণ্ঠা করে নি।

—ও-দিকের কি ক'রলে?—পঞ্চমীর প্রথম কথা আজকে।

উত্তরে হাসলো সুশীল, তারপর বললো,—বাসায় চলো। পালিয়ে যাবো না নিশ্চয়ি তোমায় ছেড়ে।

কুমারীরা বেরোচ্ছে। তা'র গতি মন্থর, সব্রীড়। ওকে আরো আবরণ দিতে হবে।

—মেয়েটাকে দেখে রাখো, এর সম্বন্ধে কথা আছে।

সুশীল চাইলো, দেখলো।

—কিছু বুঝলাম না আমি। ভোরে উঠলো ট্রেনে। ওর মা কী নাকালই ক'রলেন যে সারাপথ!

সুশীলো বুঝলো ছাই। সব কথাতেই ও সায় দিয়ে থাকে, শোনে না কিন্তু সব।

—তোমার ওখানেই উঠবো, চিঠি প'ড়ে তা'র কিছু খেয়াল আছে তো?

—আমার ওখান? তোমার বলো। সুশীল হাসে।

পঞ্চমীও যে হাসে না তা নয় কিন্তু সে হাসি অনেক চাপা, মাথা-নিচু-করা। ষ্টেশন বোঝাই লোক না হাসে যা-তে।

—রিকশা ডাকো! হুকুম করে পঞ্চমী।

তামিল ক'রতে ছোটে সুশীল।

ঘণ্টা বাজিয়ে এসে দাঁড়ালো। পাঁচ আনা দিতে হবে। চার আনা দিবে সুশীল। রাজি হয়েছে।

—থাক্ পর্দ্দা দিতে হবে না, কি বলো তুমি।

পঞ্চমীও তাই বলে।

রিকশা হেঁটেছে ঘণ্টা বাজিয়ে।

—তোমার জন্যে আমার যে কি ভাব্‌নাই হ'য়েছিলো! পঞ্চমী বলে।

—আমার জন্যে? কেন চিঠি পাওনি? জণ্ডিস্ তো সেরে গেছে কবে! তোমায় লিখিনি? সুশীল উত্তর দিলো।

পঞ্চমী সে ভাবনার কথা মোটেই বলে নি। বল'লো,—তা তো জানি। বলছি, তুমি ষ্টেশনে আসবে কি না! এই ভাব্‌না।

—আসতে লিখেছে পঞ্চমী আর আসবে না সুশীল, এ একটা কথা!

ব'লে সুশীল পঞ্চমীর পানে চেয়ে হাসে।—সারারাত ঘুমোই নি তোমার ভাবনায় ; একা আসচো যদি কেও···বিপদের কথা বলা যায় না !

—ফ্যালো তো ও ছাইটা, বিশ্রী ! পঞ্চমী নাক শিটকায়।

—সিগারের ছাই ফ্যালে না, জানো না ? সুশীল টেনে আবার ধোঁয়া ছাড়ে।

—ছাইটুকু না, সবটা ! পঞ্চমীর হুকুম।

সুশীল আবার টানে। বলে,—নস্যি নিতাম, তা' ছেড়ে এই ধ'রেছি, এ ছাড়লে ধ'রতে হবে মদ।

পঞ্চমীর সর্ব্বাঙ্গে কে-যেন অকস্মাৎ ক'রে দেয় ম'দো বমি—ঘেন্নায় ওর সারা গা ঘিন-ঘিন করে।

মুখ ঘুরিয়ে বলে,—কি যে বলো ! ইস্, বেজায় লেগেছে লোকটার !

পা হ'ড়কে কে প'ড়লো পথে সুশীল অত দেখবে না।

—কুমারীর কথা শুনবে ?

কুমারী কে কি বৃত্তান্ত আগে ওকে ব'লে নাও !

—কুমারী কে ?

—দেখ্‌লে না ষ্টেশনে মেয়েটাকে ! তোমাকে দেখালেম যা'কে !

সুশীল বুঝতে পারলো, বললো,—বলো। শুনলেও লাভ নেই, না শুনলেও নেই ক্ষতি,—এম্নি সুর তা'র কথার মধ্যে।

পঞ্চমী ব'লতে শুরু ক'রলো—সে যা বুঝেছে হাবভাবে ; সুশীলকে জিগ্‌গেস ক'রলো তা'র কি মনে হয়। সুশীল বললো,—মনে হয় ঠিক তুমি যা মনে ক'রছো—তা'র একচুল বেশি না। উদাসীন ! এ ঔদাসীন্য পঞ্চমী এর আগে সুশীলের মধ্যে লক্ষ্য করে নি।

আরো বলে,—বিধবাদের দুর্গতিই ওই। ও নিশ্চয় বিধবা, এই ব'লছো শরু-পাড় কাপড়, এই ব'লছো বিধবা কি অধবা বোঝা কঠিন। তোমার পাড় দেখে পরখ করো না! নরুণ-পেড়ে শাড়ী তো তুমি ছাড়বে না। ও-ও ছাড়বে না তা'র রুমাল-পেড়ে, যা'র যা' পছন্দ। বিধবাদের দুর্গতিই ওই, হওয়া উচিতও, কেন বাপু ফের বিয়ে দিতে কি আপত্তি সমাজের, বাপ-মাদের? যত সব সৃষ্টিছাড়া! এই ক'রেই চোখ খুল্‌বে দেশের লোকের!

সুশীলটা কী পাষাণ! পঞ্চমী ওকে আর কিছু ব'লবে না!

সুশীল এবার নিজের থেকেই ব'লবে, তোমাকেও ভুয়ে-ভুয়ে বলেছি, বলছি। তারপর—নিজেই হাসে কি ভেবে বোঝা শক্ত নয়!

পঞ্চমী মেরির ছবির মতো—চিন্তিত, নিশ্চল, অপলক!

দেড়খানা ঘরে থাকে দু'জন। একেবারে নিচের তলার ঘর, মেঝে তাই স্যাঁতা। সুশীল বলে,—পাঁচখানা ঘুরলাম এইটাই বেষ্ট, তাই আজ দু'মাস ছাড়িনি। প্রথমটার চেয়ে তো অনেক ভালো কি বলো তুমি?

পঞ্চমী বলে,—সেটায় আলো ছিলো বেশি।

—পয়েণ্ট হারিয়ো না, আলোর কথা পড়ে হবে, শুকো কোনটা!

পঞ্চমী বলে,—বাথরুম আছে তো? নাওয়ার জাগা।

—প্রথমটা নেই, দুঃখিত। দ্বিতীয়টা পাবে। ঐ যে। সুশীল দেখিয়ে দিলো কলতলার এ দিকে একটা প্রাচীর তুলে আড়াল দে'য়া।

ওপরে তাকালে হেক্সাগন্যাল আকাশ দেখা যায়। সেইটুকু এ বাড়ির চাঁদোয়া—নীলে রঙ, শাদাটে ছোপা! পঞ্চমী চেয়ে দেখে নিলো। ব'ললো,—বাব্বা, কার্পণ্য নেই, সবটুকু আকাশই এ বাড়ির। হাসলো তারপর।

—চলো ঘরে। কোনটেয়? ওটায় থাকে কে? পঞ্চমী আঙুল দিয়ে ছাখালো।

—আমার গৃহিণী।

—মানে? ফ্যাল-ফ্যাল ক'রে চায়।

—ঘাবড়িয়ো না, আমি আর কারো হ'য়ে যাইনি। সুশীল হাসে গলার স্বর চড়িয়ে ডাকে,—প্রিয়, ও প্রিয়!

গলির মোড় থেকে ছুটে আসে: অমারে ক'ন? মিদ্‌নাপুরী চাকর।

পঞ্চমীকে ডণ্ডবৎ ক'রে পায়ের ধূলো জিভে দেয়। কে ও চিনতে পারে না ভালো ক'রে। জানালো,—মোড়ে দাঁড়িয়েছিলো, দেখতে পেলো না তো কোনদিক দিয়ে এলেন?

যা, জামা কাপড় গুছো, নাইতে যাবো। আচ্ছা, আগে চা কর। একটু ছাই দে ঘুঁটের, দাঁতটা মেজে নাও পঞ্চমী, তারপর চা খেয়ে নেয়ে নেবো। জল যাবে নইলে! ছোটো চৌবাচ্চা, দুপুরের জন্যে ষ্টক করি ওটাকে, ও বাসন মাজে ইত্যাদি।

ও যায় ছাই আনতে।

পঞ্চমী জিগগেস করে! এই বুঝি তোমার গৃহিণী? ও নামে ডাকো যে!

—নাম যা। ওর নাম প্রিয়তম মাইতি। তবু তো দু'কাঠি কমিয়েই ডাকি। ভাবছো কি ব'লবো? তুমি ওকে কি ক'রে ডাকবে। নয়? সত্যি বলো।

পঞ্চমী এমন নাম শোনে নি এর আগে। হেসে ফ্যালে। সুশীল হেসে ওঠে হো-হো ক'রে।

পঞ্চমী দাঁত মাজে, থুথু ফ্যালে আর কথা কয়।

—প্রিয় শোন্। তুইই রাধবি একজন বেশি আছে চাল নিবি। একটা ছোটো দেখে ইলিশ নিয়ে আয়। খাবে তো বলো এখনো। সেবার ব'লছিলে না, ফিরে এসে সব খাবো? যা নিয়ে আয়। পয়সা নিয়ে যা ব্যাটা।

পঞ্চমী ব'ললো ;—চাকরির কি হ'লো তাই আগে বলো!

—হলো না।

—তবে খাই কি ক'রে? বলেছি তো নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখলে যথেচ্ছাচারিণী হবো।

—তবে উঠে প'ড়ে লাগতেই হ'লো দেখছি! সব ক'রবে? যা-ইচ্ছে তাই?

সুশীল ঘাড় কাত্ ক'রেই থাকে।

পঞ্চমী বলে,—গোল্লায় যাওয়া বাদ দিয়ে।

—গোল্লায় মানে? থাক্ দাঁড়ারে প্রিয়, আনতে হবে না, একজোড়া ডিম আন আর প'টেক আতপ। গোল্লায় মানে?

—সব জিনিষের মানে হয় না।

—যেমন সব বিধবার বিয়ে হয় না। সুশীল বাজে কথা না ব'ললে

হাঁপিয়ে ওঠে। সুশীল বলে আবার: তোমার কুমারীর মতো গোল্লায়? ও তো কুমারী গোল্লায় যায় নি, গিয়েছে সে যা'র সঙ্গে কুমারী মিশেছে।

—তা'র হ'য়েছে কচু! পঞ্চমী থুথু ফেললো।—সে এখন দিব্যি খাচ্ছে-দাচ্ছে, ঘুরে বেড়াচ্ছে, মরণ শুধু মেয়েমানুষের। মরণ শুধু আমাদের, তোমাদের কি? তোমরা—

—আমরা কি বলো! সুশীল শুনবেই।

—তোমরা কি? নিজেদের চেনো না? তোমরা পাথর, তোমাদের পীড়নে নারীরা পিসে যাচ্ছে, তাদের হ'য়েছে অসহ্য জ্বালা। সংসারের মাঝে তাদের বেঁচে থাকা হ'য়েছে মহাপাপ! সুশীল হাসছে।

—ফুলে ফুলে উড়ে না বেড়িয়ে চাক গ'ড়লেই হয়। তা'তে ঢের মৌ পাবে! তোমাদের তো কেউ বেঁধে রাখেনি। সবার কথা বলছি না, ধর তুমি! তুমি তো তোমার মত অনুযায়ী কাজ ক'রতে পারো। কিন্তু তুমি তা' ক'রবে না। অমনি একটা কিছু হ'লে ব'লবে,—পুরুষ জাতটাই খারাপ। তা'দের হৃদয় নেই, যে-টা ধুক ধুক করে সেটা আর কিছুই না, হাতে গড়া একটা ইঞ্জিন—লোহার! নেই তাদের প্রাণ, জীবন নিয়ে বেঁচে থাকে কোনো রকমে; না আছে মমতা—যত সব বড়ো বড়ো কথা। এই তো ব'লবে? দোষী দু'দল। কেউ দোষ চাপা দিতে পারে, কেউ তা আরো উলঙ্গ করে ধরে, সবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়! তফাৎ এইখানে।

—নিজের ঘায়ে নিজে কেউ নুন দেয় না! যার বুকে কোনোদিন ঘা হয় নি, যে ব্যথা কি বোঝে না সেই দিতে আসে নুনের ছিটে;

দাপানো দেখে হাসে, রঙ্গ দেখে, আর ব'লো না ঢের হ'য়েছে। পঞ্চমী হাঁপায়।

—হ'য়েছে ঢের কেন—প্রচুর। তবু ব'লবো। সুশীল আর বলেনা। সে বলবো ব'লেই হার মেনেছে হেসে।

—কুমারীর জীবনটা নিয়ে কে যে ছিনিমিনি খেলে গেল—সে কথা কেও জিগ্‌গেস ক'রবে ? করবে শুধু তাই, যা-তে কুমারীর সমস্ত দিক হ'য়ে আসে পঙ্গু, জড়। উঃ, কী বিশ্রী ব্যাপার! ও মেয়েটার কথা ভাবতে আমার গায়ে কাঁটা ছায়, বুকে ফোটে কাঁটা। সারাপথ আত্মহত্যা ক'রবে—প্রাণের ঘেন্নায়। নিশ্চয়ি ও চেনেনি তা'কে! নইলে— পঞ্চমী কত আর ভাবতে পারে!

কুমারী হয়ত' এখন হাওড়ায়। তা'র মা তাকে দিচ্ছে হয়তো গালাগাল! সে নির্ব্বিকারে হজম ক'রছে। এ-ছাড়া এখন ওর উপায় কি ? কাশীতে নিয়ে যাচ্ছে, কি হবে তার সেখানে গিয়ে—তা'কে হয়ত' দিয়ে আসবে দশজনের মাঝে বিলিয়ে; তাকে সঙ্গে আনবে না ফিরিয়ে নিশ্চয়ি, পঞ্চমী তা' জানে। অত লোকের মাঝে সে নিজেকে নিয়ে কেমন বিব্রত হ'য়ে প'ড়েছে। গাড়িতে লোক ছিল ক'জনই বা, তারি মাঝে ও নিজেকে ক্ষণে ক্ষণে ফেলছিলো হারিয়ে ; আর এখন অত লোক, কুমারী কি ক'রছে ? নিজেকে সামলাচ্ছে কি ক'রে ? গঙ্গায় ও ঝাঁপিয়ে প'ড়লে ঠিক ক'রতো! ওর প্রাণের আগুন নিভতো! কুমারী বোকা, এত দিনো বেঁচে আছে! ও মরুক শীগ্‌গির মরুক। তোমায় পঞ্চমী স্বেচ্ছায় বর দিচ্ছে কুমারী, তুমি নাও।

পঞ্চমীর আকাঙ্খা জাগে মনে, কুমারীর জীবন যেমন ক'রেই কাটুক,

জীবনে যেন একদিন অন্ততঃ মুহূর্ত্তের জন্যেও অমিতর (পঞ্চমী ভাবে সেই দুর্ব্বৃত্তর) সঙ্গে ওর দেখা হয়! সেদিন যেন দু'জন দু'জনকে চিনতে পারে,—সে যেখানেই হোক্—বৃহৎ প্রাসাদে, ক্ষুদ্র পর্ণ কুটীরে, অথবা স্যাঁতা খোলার বস্তিতে। কুমারী যেন সেদিন তা'র প্রতিহিংসা না নেয়। তা'র সন্তান যদি জীবিত থাকে তবে তাকেই উপহার দেয়, আর তার নিজের জীবনের দুর্গম গতি অমিতকে দেয় বুঝিয়ে, দেখিয়ে।

—একমনে কি ভাবছো মুখে আঙ্গুল দিয়ে? এতদিন পরে দেখা হ'লো তা কি তুমি ভুলেই গেলে? কথা কও! সুশীল দেখছিলো এতক্ষণ পঞ্চমীর ঔদাস্য তবু কোনো কথাই বলেনি। —যাও এবার মুখটা ধুয়ে এসো, চা-ফা খেয়ে একটু জিরোও, সারা রাত ঘুমোওনি তো। প্রিয়টা ফিরলো না এখনো; আরে এইতো, ব্যাটা বাঁচবে বহু; রাখ্ ও সব আগে, নে চা কর। তেলে-ভাজা খাবে পঞ্চমী? না থাক্; এই প্রিয়ো, যা-তো কচুরি নিয়ে আয় আনা দু'য়ের, পয়সা আছে না দেবো, তবে যা, জল চাপিয়ে গেলে পাত্তিস্, তো যা আমি চড়াচ্ছি।

সুশীলও তো কম কথা বলে না।

—যাও এবার মুখটা সত্যিই ধোও। আর ভাবতে হবে না তোমার কুমারীর কথা—যা হবার তারাই বুঝে নেবে! অযথা তুমি ভেবে শরীর মন মাটি ক'রোনা। নিজের ভাবনা ভাবো তো! যাও যাও চট্‌পট্ সেরে নাও।

দাড়িতে হাত বুলোয়ঃ আজ না কামালে চ'লবে না? তোমার কি মত?

—চলে না আর কিসে ? তবু কামাও। ও মুখ ধুতে গেল, দাঁত নিশ্চয় মুক্তো হয়েছে, এতক্ষণের দলন !

সুশীলও চললো ঘরে। ষ্টোভ জ্বালিয়ে জল চাপালো। তারপর দাড়ি কামাবে।

পঞ্চমী দুয়োরে এসে হাজির: ওটা খুলে কাপড়টা দাও, এখনই নাইবো। তুমিও সেরে নাও না ! কথা আছে অনেক !

সুশীলেরও কথা আছে তা'র সঙ্গে।

বললো,—এইটুকু সেরেই ওদিকে সারবো। তোমার হ'তে-হ'তেই আমার সব হ'য়ে যাবে। রাখ্ এখেনে নে জল বোধ'য় ফুটলো। চট্‌পট্ তৈরি ক'রে নে, রান্না-বান্না আছে আবার। ঐ প্যানটাতে ক'রে আগে চাপাবি আতপটা। ওঃ, দু'পয়সার মাখন আনবি রে। নে চট্‌পট্ সার্।

প্রিয় লোকটাও চট্‌পটে।

—পঞ্চমি, একটা সাবান দেবো ? আমার ব্যবহার-করাটায় আপত্তি আছে ? দিয়ে আয় তো প্রিয় ; ঐ যে তাকের ওপর, আর এট্টু ডানে, হ্যাঁ, যা দিয়ে আয়।—দিলি ? প্লেটে সাজা কচুরি। নে জল ফুটেছে, চা ফেলে দিয়ে নে আগে—সব তোর গুলিয়ে গেল ! ঐ যে রে কৌটো, ঐযে আমার মুখে নয় ঐযে টেবিলের নিচে। দে ষ্টোভ নিভিয়ে, দুধটুকু ফুটিয়ে নে না-হয়।

একটা মানুষ সবদিকে তাল দে'য়া মুস্কিলই বটে। তবু প্রিয় ব'লেই সুশীলের চাকরী করে। ও ফরমাসটা বেশিই ক'রে থাকে, তবু প্রিয় চটেনা এই যা, এর আগে দু'জন তো স'রে প'ড়েছে। একটাকে পঞ্চমী দেখে গিয়েছে সেবার শীতে।

সুশীল মানুস হ'য়েছে এবার। নাইলে বোধ'য় মাথার চুলও বশে আসবে। দেখতে তখন নিশ্চয়ি এত কদাকার লাগবে না। কদাকারত্বকে সুশীল গ্রাহ্যও করে ভারি!

পঞ্চমী না'ক্।

—শিগ্‌গির এসো পঞ্চমী, চা কিন্তু জুড়োবে! আমি আরম্ভ করি? না, থাক তুমি এসো। উনুনে আগুন দিলি নাকি রে প্রিয়? একটু পরেও দিতে পারিস্ কিন্তু, একটু জিরো অনেক খেটেছিস্। তোর চা নিয়ে যা। বোকা নাকি তুই? এই প্রিয়, গেলি কোথায়; দেখো আক্কেল, বাক্কেল কোথাকার! এই প্রিয়—

পঞ্চমী এলো: অত ডাক্‌ছো কেন?

সুশীল হেসে উঠ্‌লো চাৎকার ক'রে। পঞ্চমী অপ্রতিভ হ'য়ে দাড়িয়ে রইলো।

—মানে? অত হাসছো যে? গামছা দিয়ে কপাল মোছে কপোল মোছে, প্রশ্ন করে। সুশীল গম্ভীর হ'য়ে যায়: এমনি। ক্ষুর ষ্ট্রপ করে, বলে,—এসো! সব গেল জুড়িয়ে!

—তবু? কেন হাসলে? আব্দারী স্থর এ প্রশ্নের। পঞ্চমী ওর মুখ থেকে শুনবেই জবাবটা মানে, কারণটা।

সুশীল উঠে সাবান-দাড়ি মাখা কাগজটা জানলা দিয়ে ফেলতে গিয়ে বলে,—আমি যখন চাকরকে ডাক্‌বো তুমি উত্তর দিয়ো না।

—এই? কাপড়টা মেলবো কোথায়? শিগগির বলো। পঞ্চমীর তাগাদা লেগেছে।

—কি ব'ললে ? কাপড় ? থাক্ মেলতে হবে না। রাখো দরজার ওপরে, দেবে এখন প্রিয়োই মেলে।

—তুমি কি ভাবো সারাদিন ব'লতে পারো ? কান রাখো কোন দিকে ?

—ভাবি ? কেন, যদি তোমার কথা ভেবে থাকি, অপরাধ আছে ? সুশীল চাঁদির ওপর হাত কাঁপিয়ে তেল মাখে।

—নাঃ, অপরাধ আর কি ! অপরাধ কে ধ'রবে তোমাদের। তোমরা নিজেরাই তো নিজেদের মনিব। পঞ্চমী আর্শির সাম্নে দাঁড়িয়ে বোধ'য় নিজের রূপ দেখছিলো। এবার চুল আঁচড়াবে।

—নাও চা-টুকু খাও তো এবারে, বিবি সেজো পরে। ঠাণ্ডা জল হ'য়ে যাবে যে।

—বিবি ব'লো না। যা-তা কথা মুখে আনবে না। পঞ্চমী ভাণ করে বেজায় চ'টেছে।

—আমাদের তোমরা বাবু সাজা ব'লতে পারো আর আমরা বিবি সাজা ব'ললেই মহা অপরাধ ?

—অপরাধের কথা তো মিটেই গেল আগে। অপরাধ নেই তোমাদের, এ হ'চ্ছে আমার অনুরোধ। পঞ্চমী যা-হোক পেয়ালায় চুমুক দিলো ! চুল পরে আঁচড়াবে ঠিক ক'রেছে।

সুশীল এখন শুধু চা খাবে। তেলে-হাতে কচুরী কামড়াবে না।

পঞ্চমী এখনই খাবে দু'টোই। কচুরির গুঁড়ো কাপড়ে ঝুরে পড়ে, ও সে-সব খেয়াল ক'রবে না।

সুশীল নাইতে গেছে। এরি মধ্যে ফিরে এলো ?

পঞ্চমী বলে,—কেগো রোগ দেখছি! তার মানে বুঝলে না? কাগের মতো নাইতে শিখেছ।

—তোমাদের মতো নাইতে যাবে দেড ঘণ্টা, গা মুছতে আড়াই; চুল বাঁধতে তিন, গল্প ক'রে খেতে শ'দুই, ঘুমোতে দশঘণ্টা। তবে জীবনে বেঁচে থাকা কতটুকু? জগত কতটুকু কাজ পাবে তোমাদের দিয়ে? থিয়েটার বায়েস্কোপে যেতে হ'লে সে দিনটাই মাটি—কাপড় পরতে, সাজ গোজে। ষাট বছর যদি বাঁচো, আমি ব'লবো বেঁচেছো পাঁচ বছর। চিত্রগুপ্ত-র খাতায় লিখবে—ষাট, আর আমার, এই সেনগুপ্ত-র ডায়রীতে—পাঁচ! বুঝলে? আনন্দ-ফ্যামিলীর মতো তোমাদের জীবন। অমুক সাধু বিশ বচ্ছর মৌন ব্রত ধারণ ক'রে ব'সে আছেন তাঁর আশ্রমে, তমুকজন আজ তিরিশ বছর ধ্যানই ক'রছেন। তাঁদের দিয়ে কাজটা কি হ'লো? তা'দের আবার লোকে করে শ্রদ্ধা, করে সাপোর্ট। ওরা সব জগতের জঞ্জাল। অপমান নেই তাদের—দোরে-দোরে ভিক্ষে ক'রতে,—গতর খাটিয়ে খাওনা বাপু! ওঃ, তোমার কুমারীকে পাঠিয়ে দিলে পাত্তে, কি বলে ওটাকে ঐযে ভবানীপুরে-গতি ক'রে দিতো। যত সব ভণ্ড-তাপস!

কি কথার থেকে একেবারে কিসে। পঞ্চমী মনে মনে বেজায় হাসছে।

—তোমার মাথার চিকিৎসা করাও, নইলে থাকো গিয়ে রাঁচিতে। নাও, এবার খাবে নাকি এ-দু'টো?

নিশ্চয় খাবো। দাও, হাতে তুলে। প্লেট থাকনা, ওটা তো খাবার জিনিষ নয়! পঞ্চমী তা' জানে। কচুরি দু'টো দিলো ওর হাতে।

একদা

সুশীল ঘুরে বেড়াচ্ছে এখানে-সেখানে এ-তাকে সে-তাকে কি যেন খুঁজছে, বাঁ হাতে কচুরি ধ'রে মাঝে মাঝে কামড়ো দিচ্ছে।

—আবার ধরালে ওটা? এ-টা বুঝি বাজে ব্যয় না? পঞ্চমীর ভালো লাগে না ঐ গন্ধটা।

—বাজে ব্যয়? টেনে দেখো কেমন চমৎকার। নেয়ে-খেয়ে টানতে লাগে মধুর! টেনে দেখো। একটু কড়া লাগবে। সিগারেট আনিয়ে দেবো একটা? খুব মাইল্ড্ দেখে, যে-গুলো মেয়েরা খায়? ঠোঁট কালো হবে না আমার মতো! যদিই বা হয় একটা লিপষ্টিকো দিচ্ছি আনিয়ে।

সুশীলের ফাজলামো পঞ্চমীর ভালো লাগে না। তবু গা জ্বালা করে না এই যা রক্ষে।

অনেক দিন পরে ছ্যাখা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ আর তার ভেতর কুমারীর বিষাদ খুব সামান্য।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কুমারীর স্মৃতি অনেকটা ম্লান হ'য়ে আসচে।

—আজ-কাল কতো পাচ্ছো? এই রোজগারের কথা ব'লছি। পঞ্চমী এ-কথা জিগেস ক'রতে পারে, অভদ্রতা হয় না মোটেও।

—পাচ্ছি তো না কিছুই, জোর ক'রে যে-টুকু আনছি—এই টাকা চল্লিশ। কেন? তাই জেনে তারপর বুঝি বিবেচ্য? সুশীল হাসে।

—সবি বুঝি ওড়াচ্ছো?

—তার মানে তুমি একটা হিসেব চাও। আনি চাল্লিশ। ব্যয় করি বাড়ি ভাড়া বারো, খাওয়া দাওয়া দু'জনের টাকা বারো সব নিয়ে চা-ফা ইত্যাদি চব্বিশ হ'লো—ধরো পচিশ। আর পনেরো, ওর মাইনে পাঁচ, এই ছাই টাকা তিনের, বাজে ব্যয় করি এদিক-ওদিক সে-ও ধরো পাঁচ,

কত হ'লো ? তেরো। আটত্রিশ। চিঠি পত্র লিখতে হয়—তোমার কাছেই তো যায় আনাআটের। হ'লো ? বাকিটার কিছু হারাই কিছু করি দান! ব্যস্, মাসের শেষে ফতুর।

—হঠাৎ অসুখ ক'রলে ?

—হাসপাতালে যাবো। সুশীলের জবাব ঠোঁটের ওপরে।

—হোটেলে থাকলে কমে হয় না ?

—ঢের, কিন্তু বাঁচতে হ'লো বাড়িই ভালো।

—কতদিন এ-রকম ছন্ন-ছাড়া জীবন কাটাবে ? পঞ্চমীর ভাবনা হ'য়েছে বেজায় সুশীলের জন্যে।

—যতদিন চলে। যতদিন না মনের মতন মনটাকে গ'ড়ে তুলতে পারি

—তার মানে ?

—অত মানে নেই সব কথার। চিৎ হ'য়ে শুয়ে শুয়েই এবার টানছে সিগারটা, পঞ্চমীকে ব'ললে,—যাও এবার চুলটা আঁচড়ে সিঁদুর পরো, খুড়ি বিনুন করো। মাটিতে ব'সে আছো কেন ? উঠেই ব'সো না চৌকীর ওপর! নিয়ে এসো আয়নাটা। আমি আঁচড়ে দেবো ? কেন পারবো না ভেবেছো ? সব পারি; দেখে নাও।

পঞ্চমী বললে,—থাক্, আমিও পারি, তুমিই ত্মাখো!

—দেখছি, ব'সো এখেনে। অতদূরে গেলে আমার ভা'লো লাগে ? তুমিই বলো! এতদিন দূরে থেকে-আশা মিটলো না ?

পঞ্চমী চেনে সুশীলকে। না এলে টেনে এনে বসাবে। এসে ব'সলো তাই সুশীলের পায়ের দিকটায়।

—থাক্, ভক্তি যথেষ্ট ক'রেছো। এ-দিক এসোতো।

এক-কথার রাজি। পঞ্চমী বিনুন ক'রবে না। বিধবাদের চুল থাকাই উচিত না ; যদিই বা রাখে, এলো-খোঁপা করতে পারে খুব বেশি ক'রলে—পঞ্চমীর এই মত।

—বালিশ দেবো একটা ? শোবে ?

—দাও, শোয়া তো উচিতই, সারারাত ব'সে ! পঞ্চমী শুলো।

—আমার তবে কি করা উচিত সারারাত জানলায় ছিলেম দাঁড়িয়ে।

—ঘুমোও। পঞ্চমী পন্থা ব'লে দিলো মুহূর্ত্তের মধ্যে।

—আমি ঘুমোলে তোমায় পাহারা দেবে কে ? এখন আমিই দায়ী তোমার জন্যে !

—আমার দায়িত্ব কা'রো নয়, সব আমার নিজের।

—উঃ, চমৎকার কথা যে। তুড়ি দিয়ে হাই তাড়ায়, চোখ র'গড়ায় সুশীল।

—সত্যিই ঘুম পাচ্ছে। সুশীলই বলে।

—আমি একা-একা বেশ জেগে থাকতে পারবো, ঘুমোও না। পঞ্চমী বোধ'য় রাগে।

—মুখে ব'লছো ঘুমোও না কিন্তু মন তোমার ঠিকই ব'লছো, ঘুমিয়ো না।

—উঃ, কত বড়ো মনস্তাত্ত্বিক ! পঞ্চমী হেসে ফেলে।

সুশীল মনস্তত্ত্ববিদ্ না হ'তে পারে কিন্তু সে কি সত্যিই পঞ্চমীর মনের কথা বলেনি ?

আবার কিছুকাল থাকে চুপ করে সুশীল চোখ বুজে সিগার টানে।

পঞ্চমী নিচু-গলায় প্রশ্ন করে,—তুমি বিয়ে করো না কেন ব'লতে পারো আমাকে ?

—তুমি যে জন্যে করো না ঠিক সেই কারণে !

—আমার সমাজে বাধে, তাই !

—আমার বাধে মনে ! তোমার যেদিন হ'য়ে পুনর্ব্বিবাহ আমারো সেলদিনই হবে এটুকু জেনো !

পঞ্চমী মানে খুঁজে পায় না।

সুশীল চোখ বুজেই বলে,—বিয়ে আমি আজো ক'রতে পারি, এই আয়েই চ'লে যাবে, চাকরটাকে দেবো ছাড়িয়ে, কিন্তু কারণ কি জানো ? সুশীল নিশ্বাস ফেলে নেয় : বহু দিন আগে একটা মেয়েকে ভালোবেসেছিলাম, সে-ও বাসতো আমাকে কিন্তু তা'র সঙ্গে আমার বিয়ে হ'লোনা। এখন ত'ার বিয়েও হ'য়েছে ছেলে পিলেও হ'য়েছে মেলা। বেশ সুখে আছে। সেই সুখেই আমি সুখী। বিয়ে ক'রবো কিসের জন্যে, কামনার জন্যে বিয়ে ক'রলে সে সংসার সুখে চলে না ! এখন যদি কেউ আমার কাঁধে তার মেয়েকে গ্যায় চাপিয়ে,—তা'কে আমার ভালো লাগবে না, একসঙ্গেই থাকবো, ছেলে-পিলেও হবে কিন্তু সংসারে সুখের চিহ্ন খুঁজে পাবো না। সুশীল থামলো।

—সব বাজে কথা। এতদিন যে হ'য়ে আসচে, তাদের সংসারে কি সুখ ছিলো না ? তোমার যত আজগুবি কথা ! পঞ্চমী বলে।

—সে-সব দিন তো নতুন যুগ না। যুগের ধর্ম্ম অনুসারে সবাই চ'লবে। যখনকার যা'। এ শুনে বুড়োরা চোখ রাঙালে ব'লবো : নতুনের ছাঁচে ঢালাই হ'য়ে তবে যেন তিনি তর্ক ক'রতে আসেন। তোমাকেও বলছি মনে-মনে বুঝছো ঠিকই কিন্তু আমাকে তুমি চাও ঠকাতে ! সুশীল পঞ্চমীর আঁচলের চাবির তোড়া বাজায় আর বলে,—সত্যি বলো

তুমি বুঝতে পারো নি? বাজে কথা সুশীল সেন বলে না। সুশীল গর্ব ক'রে বলল।

—তবে তুমি চিরকুমার থাকবে?

—তুমি যতদিন থাকবে চির-বিধবা! ভুরু টেনে সুশীল বলে। আরো বলে,—সেই জন্যেই যে চিরকুমার থাকতে হ'বে তার কোন মানে হয় না। কিন্তু তার চেয়েও যদি পরে আর কাউকে ভালো লেগে থাকে, মানে সেই মেয়েটার চেয়ে, তবে তা'কে নিয়ে সংসার চ'লবে শান্তিতে বিয়ে ক'রতে গররাজি হবো না। এই হ'চ্ছে আমার মনের কথা, এই হ'চ্ছে আমার মনকে মনের মতো ক'রে গ'ড়ে নে'য়া! বুঝলে? সুশীল পঞ্চমীর ধরা-আঁচলটা ঝাঁকি দ্যায়।

—যথেষ্ট বুঝেছি। না বুঝিয়ে ছাড়লে কই? পঞ্চমী ছেঁড়া বইটার পাতা ওল্টায়।

—খুব ক'রে বুঝালেম নাকি? এই হ'লো খুব? আমার বন্ধুকে তো দেখোনি। তাকে উদ্ব্যস্ত ক'রে তুলি বুঝিয়ে।

—ক'ার কথা ব'লছো?

—বলছি বন্ধুর কথা।

—তাঁর নাম কি? পঞ্চমী শুনবে।

—আমার নাম যা'—সুশীল।

—কি করেন?

—আমি যা করি। আড্ডা দেন, ঘুরে বেড়ান। সময় কাটে না ফাঁকান, ব্যস্।

আমিও স্বীকার করি সুশীল আমার বন্ধু।

পঞ্চমী জিগ্‌গেস করে : থাকেন কোথায় ?

—থাকেন বাসায়, কিন্তু তাঁর মনটা প'ড়ে থাকে আমার কাছে, বড্ড ভালবাসেন কিনা !

এত কথার মানে পঞ্চমী বোঝে না ছাই !

বলে,—তোমার মাথা। উঃ, ছারপোকা নিশ্চয়ি। রোদে দিতে পারো না চৌকী !

—রোদ কই ? সুশীলও উঠে বসে পঞ্চমীর সঙ্গেই ধড়মড়িয়ে। বলে,—মেরে ফ্যালো, দেশালাইর কাটি দেবো ?

—সারারাত ঘুমোও কি ক'রে ? যেন আশ্চর্য্য হয় পঞ্চমী।

—চোখ বুজে, অনেকে তাকিয়েও ঘুমোয় শুনেছি—আমার সে বালাই নেই ! সুশীল হাসে।

—এ-বালাই তো দূর করো আগে। সে-বালাই পরে হবে। পঞ্চমী ছারপোকা খোঁজে।

—থাক্, ওরা লুকিয়েছে, শোও ! সুশীল শুয়ে পড়ে। আলসে !

টাইম্‌পিস্‌টা ঝক্-ঝক্ ক'রে চ'লছেই। দশটা পর্য্যন্ত কাঁটা টেনে এনেছে যাহোক্। সুশীল মাথা তুলে বলে,—বাজলো কটা, দশ ! প্রিয় এবার আগুন দিক্ ! প্রিয়, এই প্রিয় ! দে আগুন দিয়ে। উনুনটা উঠোনে নিয়ে যা, আর দরজা ভেজিয়ে দে, ধোঁয়া না আসে। মাখন এনেছিস্ তো !

প্রিয়তমের এবমস্তু ভাব। চলে যায় দরজা টেনে দিয়ে ধীরে ধীরে যা-তে না শব্দ হয়।

পঞ্চমী বলে,—এত শিগগির ? এই তো খেলাম।

—উমুন তো খাবো না। রাঁধতেও সময় লাগবে। ওর হাতে খাবে তো? ওকে তো অর্ডার ক'রে দিয়েছি তোমারটাও চাপাতে।

—হাতে খেতে কি যায় আসে। আর কিসেই বা আসে যায়! খুব খাবো! আমারি তো খাটুনি ক'মলো।

সুশীল বলে,—এই তো চাই! এতক্ষণ কাটাই কি করে!

—রোজ যা ক'রে কাটে!

—রোজ কাটাই রোদে টো-টো ক'রে। আজ তবে বেরোই, তুমি প্রিয়র সঙ্গে গল্প করো, কি মত্ তোমার? সুশীলের আজ কথায়-কথায় হাসি।

—ফাজলামো যত সব! সোজা কথায় জবাব দিতে শেখো। পঞ্চমী কেমন ক'রে যেন চায় সুশীলের দিকে—অভিমানে তার বুকখানা গজ-গজ করে।

—ফাজলামোর ধার দিয়ে ঘেঁসি না! সব আমার সোজা কথা।

—বৌ-র সঙ্গে এমনি কথা ব'ললে, সে বুঝবে ছাই!

—কেন, তুমি তবে বুঝছো কি ক'রে? সুশীল গেঞ্জী খুলে ফেললো।

—ডেকে এনে অপমান ক'রছো?

—ডেকে এনেছি? অপমান কর্চ্ছি? সুশীল আকাশ থেকে পড়ে।

—না, আমি উপগ্রহের মতো এসে প'ড়েছি, রেহাই দাও।

সুশীল হেসে ওঠে হো-হো ক'রে: থাক আর রাগতে হবে না।

—আসতাম্ না, যদি না লিখতে যে চাক্‌রির জন্যে চেষ্টা কর্চ্ছি, হ'তেও পারে। যত সব বাজে কথা। যেমন উড়নচণ্ডী মূর্ত্তি হ'চ্ছে দিনকে দিন তেমনি স্বভাব বদলাচ্ছে। পঞ্চমী বোধ'য় সত্যিই রেগেছে।

—বাজে কথা না, শোনো। কর্পোরেশনে যদ্দূর করার চেষ্টা করিছি। হবে একদম সেট্‌লড্‌। টালার ইস্কুলে নেবে দু'জন—তাই শুনে গিস্‌লাম। হঠাৎ মর্জ্জি ছুটলো উল্টো মুখে বাবুদের—দু'জন খৃষ্টান পেয়ে গেল।

পঞ্চমী মন দিয়েই শুনছিলো।

—আর সেবাসদনে? সে-কথা আর ব'লো না! অনেক চেষ্টা করেছি তোমার জন্যে—কিন্তু বিফল। এমন দিনো গিয়েছে দু'বেলা ছুটেছি—হেঁটেছি কম্? যেতাম বাস্-এ কিন্তু আসবার সময় টানা হণ্টন এই ছাই একটা মুখে দিয়ে। এত ঘোরালো! ওদের মনটাই ঘোরালো! শহরের বড়ো বড়ো ডাক্তারদের ধ'রতেও বাদ দিনি। কিন্তু তোমার কপাল আর আমার বরাত! হ'লো না! সুশীল হিসাব দিলো।

—এত সোজাতেই যদি হবে, তবে তোমার খোসামদ করি? তোমার চল্লিশ টাকা রোজগার ক'রতে খাটতে হয় ক'ঘণ্টা?

—ঘণ্টা বারো! যেন খুব কম এমনি ভাবে সুশীল জবাব দেয়।

—তবে এর জন্যে খেটেছো কতটুকু বুঝতে পারছো? পঞ্চমী সুশীলের ওপর কী দাবীটাই খাটাচ্ছে!

—সত্যিই আরো খাটা উচিত ছিল আমার। সুশীল স্বীকার ক'রে ফেললো এক কথায়।—দাঁড়াও না, তোমার কাজ জোগাড় ক'রে দেবোই। সুশীল দৃঢ়।

—আর দিয়েছো। ম'লে দিয়ো। পঞ্চমী এত সহজেই হতাশ হ'য়ে প'ড়েছে। আরো বলে,—টাঙ্গাইল থেকে টেনে আনলে লোভ দেখিয়ে, সেলাই শিখিয়ে দু'পয়সা তবু রোজগার হচ্ছিলো! থাক্ আমার

কাজ, মামার সঙ্গে একবার দেখা ক'রবো ব'লেছি আজ রাত্তিরে নাইনিতাল যাবো! টাইমটেব্‌ল্ জোগাড় করো না একটা—কখন ট্রেন? পঞ্চমী মনে-মনে তৈরী হ'য়ে নিয়েছে।

—এখনি তো যাচ্ছো না। তোমার সেই পাতানো মামা? রাঁচিতে ছিলেন যিনি না আর কেও?

আকস্মিক দুঃসংবাদের মতো পঞ্চমীর আজই চ'লে যাওয়ার কথাটা সুশীলের বুকে ব্যথা দিলো, তবু সে-টুকু গোপন রেখেই সে থামলো। একবারটি নিষেধও ক'রলো না।

—হ্যাঁ তিনিই। এখন নাইনিতাল বদ্‌লী হ'য়েছেন। আমাকে কী ভালোটাই বাসেন, আমার মতো ওঁর একটা মেয়ে ছিল কিনা, সে মেয়ে মারা যাবার পর থেকেই আমার ওপর একটা টান প'ড়ছে!

বছর দেড় আগে এই মামাবাড়ি থেকে ফিরতি পথেই পঞ্চমীর সঙ্গে সুশীলের হয় চেনাজানা। সে এক অদ্ভুত রকমে—সে কথা থাক্। হাওড়ায় দাঁড়িয়ে হয় কথাবার্ত্তা, পুলের ওপরে আলাপ, বাড়ীতে এসেই ঘনিষ্ঠতা—সে অনেক কথা!

সুশীল সেই কথাই ভাবছিলো। ফিরতি-পথে হ'য়েছিলো আলাপ আজ আবার চলতি পথে ওর মনে আসছে অস্ফুট বিলাপ। যদি মামা না আস্‌তে দেন পঞ্চমীকে ফিরে—সুশীলের সঙ্গে জীবনে তা'র আর দেখা হবে না। সুশীল সেখানে গিয়ে দেখা ক'রতে কখনই পারবে না। বললো,—মামা যদি তোমাকে ফিরতে না দ্যান।

—না-ও দিতে পারেন।

—তোমার সঙ্গে আমার আর দ্যাখা তবে হবে না? সুশীলের কণ্ঠস্বর

এত সহজেই ভারি হ'য়ে উঠলো। জীবনের বিনিময়ে কেনা যেন একটা ঐশ্বর্য্য সে খোয়াতে ব'সেছে, যেন তার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হ'চ্ছে। সুশীল পুরুষ, চোখে তাই জল এলো না।

—গিয়ে ছাখা ক'রে এসো। পঞ্চমী তার কণ্ঠস্বর শুনে মাথা তুলে চাইলো সুশীলের দিকে।

—না, তবে তুমি যেয়োনা। চাকরি দিয়ে কী হবে, নাই-ই বা হ'লো! আমার আয়ে দু'জনের চ'লবে না? সুশীল যেতে দিতে চায় না। হঠাৎ তার স্খলন ঘটলো—সে নিজের হৃদয়কে পঞ্চমীর চোখের সম্মুখে স্বচ্ছ ক'রে দিলো।

—পরের আয়ে খাবো কেন? আমার আত্মগরিমায় বাধঁবে না? তুমি এমন কারো ওপর থাকতে পারো? পাল্টে সুশীলকে জবাব দিতে বলে।

সুশীল উঠে ব'সলো: বেশ, আমি পর হ'তে পারি কিন্তু তোমাকে কখনই পর মনে করি না এটুকু জেনো। কিন্তু প্রতিজ্ঞা করছি—তোমার চাকরি আমি ক'রে দেবোই। সুশীল এখন আর হাসচে না।

—তখনকার কথা তখন হবে। চিঠি লিখো অমুক দিন জয়েন ক'রতে হবে ঠিক এসে হাজির হবো। পঞ্চমী শুয়ে-শুয়েই জবাব ছায়।

সুশীল বলে,—বেশ। আবার শুয়ে পড়ে।

সুশীলের প্রতিজ্ঞা। পঞ্চমী চাকরি পেতেও পারে। সুশীল আকাশ কুসুম স্বপ্ন দেখছে: পঞ্চমী চাকরি পেয়েছে, ওরা দু'জন এমনি পাশাপাশি শুয়ে গল্প ক'রছে—সে কত কথা।—আজকের মতো এ

সব কথা নয়,—সে ভিন্ন। সেদিনকার কথার কোন মানে নেই, নিরর্থক বকুনি ; তবু বিশাল সম্পদ তার ভেতর নিহিত।

সুশীল বললে,—সে কথা থাক্। আজ যাবে যখন ব'লছো, যাও। কিন্তু যতক্ষণ না যাচ্ছো—চুপ ক'রে থাকলে ঘড়ির কাঁটা নড়বে ?

পঞ্চমী বললো,—কাঁটা নড়বেই। কিন্তু কি কথা বলি বলো তো ? এক ছিলো চাকরির কথা, তা তো মিটলো। এখন হচ্ছে তোমার বিয়ের কথা। তারো তুমি ভালো ক'রে কিছু জবাব দিচ্ছো না—কি বলি বলো তো ?

—তোমার নিজের বিয়ের কথা বলো কিছু—ঠিক ভালো ক'রে জবাব দেবো। সুশীল আবার হাসতে শুরু ক'রেছে।

—বিধবার বিয়ে ! পঞ্চমী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো।—দেখেছো কোথাও বিধবার বিয়ে হ'য়ে সে সুখী হ'য়েছে ? পঞ্চমী জিগ্‌গেস করে।

—সেই পুরোনো কথায় চ'লে এলে। খবরের কাগজের মারফতে বিয়ে সে সব, স্বামী-স্ত্রী কেউ কাউকে জানে নি, ভালোবাসেনি ; কি ক'রে সুখী হ'বে ?

—সে কেন ? বেশ, জেনে শুনেই বিয়ে হ'লো ধরো না। প্রথমে ছিল দিব্যি একা, পরে স্বামী এতগুলো ছেলে রেখে চোখ বুজলো—কি দশা ব'লো তো ? চৈতীর সে দিনকার দৃশ্য এখনো আমার চোখে ভাসছে। উঃ, পঞ্চমী একটা নিশ্বাস ছাড়লো ঃ এখন সে থাকে ভিখিরীর মতো। সবার মধ্যে নেই তার সম্মান যেমন আর সবাই পেয়ে থাকে। ছেলেকে সোহাগ দেখাবার লোক নেই, চোখ রাঙাবার, শাসন করবার লোকের অভাব নেই। মায়ের প্রাণ তো, কি ক'রে সহ্য করে বল দেখি !

তাঁরা নিজেদের ছেলের দিকে চোখ রাখেন না, চৈতীর ছেলে নষ্ট হ'চ্ছে এই নিয়ে মাথা ব্যথা যথেষ্ট। নিজের ভাইয়ের দোষ ঢেকে করেন চৈতীর ছেলেকে শাসন। যত সব সংসারের কুলাঙ্গার। পঞ্চমীর সর্ব্বাঙ্গ জ্ব'লে যায়। ওর মনে যে আগুন জ্বলে তা দিয়ে তাদের ঘরেও আগুন লাগাতে পারে অনায়াসে। আবার বলে,—একজন ভদ্রলোককে চিনি, তিনি শাসন কি ক'রে করতে হয় খুব জানেন। তার শালাকে ছেলে-বেলা থেকে ক'রতেন বেজায় শাসন—নির্ব্বিবাদে সে-ও সহ্য ক'রতো। শ্বশুরের টাকায় প'ড়তেন আর শালার ওপর খাটাতেন তোম্বি। শ্বশুর গেলেন মারা তার পড়া হ'লো ইস্তফা। চাকরী নিয়ে ক'রলেন বাসা শালাও থাকতো সেখানে—রীতিমতো টাকা দিত মাস-মাস গুণে;—বিশ বছরের ছেলে তাকে একদিন অবিচার ক'রে দিলেন মার। আর সহ্য করিবে কেন সে, সেইদিন প্রথম রুখে পায়ের জুতো তার মুখে ঠুকে দিয়ে সে দিলো রওনা। ঠিক শাস্তি হ'য়েছে ভদ্রলোকের—মুখ চ্যাপটা করে দেয় নি এই যথেষ্ট। তার ভাইরা এখন গুণ্ডামী ক'রে বেড়ায়। পরের ওপর শাসন ক'রলে এমনিই হয়।

সুশীল বলে,—শুধু আমিই বাজে বকি। তোমারো যে দেখছি, কিসের থেকে একেবারে কিসে এসে প'ড়লে!

—কি কথা ব'লছিলেম ব'লো তো? চৈতী, না? সব ঠিক থাকে না-বুঝলে? আমার মন যে যে, কথাগুলো পোড়ায়, যা আমার চোখে লাগে কটু সেই গুলোই বেশি বেরিয়ে আসে মুখ দিয়ে। পঞ্চমী নিজেকে বাঁচায় বদনাম থেকে।

—তা'তো হ'লো এখন বলোই না কি সে কথাটা। সুশীলের আর

তবু সয়না।—কথাটা তো নয়, সে অনেক! ভাবতে অসহ্য ঠেকে।

পঞ্চমী দুনিয়ার কত কথা যে মনে লালন করে তা সব সময় ওর মনেই থাকে না। কখনো কোথায় কিছু ঘ'টলে ওকে হিসেব নিতে হবে কখন, কেমন করে, কেন এ হ'লো! যে দিতে পারে না ও তাকে দেখতেও পারে না। ওর স্বভাব আমি আজো বুঝতে পারি নি। ও যেন সম্মুখে ফুটে থাকা একটা ভাষাহীন সূর্য্যমুখী।

পঞ্চমী বলেঃ চৈতী আমারি বন্ধু, বয়েসে বড়ো যদিও বছর তিনের।

সুশীল বলে,—তাতে আর ক্ষতি কি মা-মেয়েও তো বন্ধু, সব কথাই চলে তাদের মধ্যে—বাসর থেকে ফুলশয্যা তারপর সব, তা এ-তো চৈতী; তারপর নাও বলো কি ব'লছিলে। সুশীল থামলো।

—তুমিই বলো না, দুনিয়ার তো তোমার কিছু অজানা নেই, একেবারে বাসর ফুলশয্যা সবই তো বলে ফেললে। থাক আর হাসতে হবে না। তো শোনোঃ এতক্ষণ ধৈর্য্য ধ'রে শুনতে পারবে?

—ব'লেই দেখো না ধৈর্য্য আছে কি না! যে ধৈর্য্য খাটাচ্ছি সকাল থেকে!

—বাগান বাড়ি।—বেল, চাঁপা, যূথিকা, মল্লিকা, গন্ধরাজ, নাগকেশর এক কথায় সব, অঢেল ফুল ফুটে থাক্‌তো! আমরা দু'জন যেতাম, ভোর না হ'তেই ঐ চুরি ক'রতে, সে আজকের কথা নয়, তখন আমি কতটুকু, পুরুষ দেখে গা ঢাকতে শিখিছি মাত্র (পঞ্চমী একটু হেসে নেয়) বেড়ে আমোদ লাগতো কিন্তু।

—গা ঢাকতে শিখে, না ফুল চুরি করতে। সুশীল উল্টে কথা কইতে চায়।

—বাজে কথা রাখো, শোনো দেখি (এবার পঞ্চমী শৈশব-জীবনের স্বাদ পেয়ে গেছে), যেতাম। আঁচল ভ'রে কুড়োতাম যত রকমের ইচ্ছে।

—মালি কিছু ব'লতো না? ওঃ তোমরা তো পাকা চোর! সুশীল বাধা দেবেই।

—শোনোই শেষ পর্য্যন্ত! কুড়োতাম আর বাড়ি এসে বড়োবড়ো তোড়া বানিয়ে সারাদিন খেলতাম—নানারকম খেলা—আজেবাজে, ফুলগুলো হাতের গরমে হ'য়ে যেতো মাটি; মালা তৈরী ক'রে আমি দিতাম ওর গলায় ও দিতো আমাকে—

—বর-বৌ খেলতে বলো! কে বর হ'তে? তুমি নিশ্চয়! সুশীল বাধা দিয়ে হাসে।

—তুমিই তা'লে বলো। সবই তো জানো দেখছি। শুনবে তো শোনো,—মালা বদলাতেই সন্ধ্যা হ'তো। যে যার বাড়ি চলে যেতাম। আমাদের পাশের বাড়িই ওদের! আবার ভোরের আগেই ও উঠে এসে জানলায় শব্দ ক'রলেই আমিও যেতাম বেরিয়ে—

—কেও সন্দেহ ক'রতো না? সুশীলের সব অকেজো কথা!

—করুক্ গে সন্দেহ; বেরিয়ে গিয়েই ব্যস্ সেই ফুলচুরি, প্রায় দিন পনোরো এমনি কাটিয়েছি ধরা না প'ড়ে; রোজ কি চলে? মালি ফেললো ধরে, কিছু বলে নি যদিও, বললেম: পূজো আছে ফুল নেবো না? তবে ফুল ফুটেছে কেন? বাগান উড়িয়ে দাও না। উড়ে-

মালি সব বুঝতে না পেরে থতমত খেয়ে যেতো। চৈতী উঠ্‌তো খিল্‌-খিল্‌ ক'রে হেসে।

—ব্যস্‌, উড়েমালি ফেললো ভালোবেসে। সুশীল যেন সবই জানে।

পঞ্চমী চোখ রাঙিয়ে তা'র পানে চেয়ে নীরবে শাসন শুরু করে, সুশীল নিজে থেকেই বলে,—বেশ, বলো।

—সেই হাসি শুনতে পেয়ে বেরিয়ে এলো মোটা-কাটা লম্বা একটা ছেলে বাগান-বাড়ির ঘর থেকে—

—বাঃ, চমৎকার নভেল, তারপর? সুশীলের তর্‌ সয়না যেন।

—নভেল না, সত্যি। এসেই আমাদের দুজনকে জিগ্‌গেস করলেন, না, বোধ'য় আগে জিগগেস ক'রেছিলেন মালিকে; যাই হোক আমাদের জিগ্‌গেস ক'রলেন: ফুল নেবে নাকি? চৈতী তো ভয়েই জড়ো-সড়ো। আমি ব'ললেম, উদ্ধত-ভাবে নয় যদিও, খুব ধীরে মাথা নিচু করেই: হ্যাঁ। তিনি দিলেন হেসে।

—বাঃ, চমৎকার, তারপর? সুশীল উঠে ব'সলো: ব'সো তুমিও, শুয়ে শুয়ে এ-গল্প হবে না।

পঞ্চমীও ব'সলো তবে, তার জিরোনো হ'লো না।

—তারপর আর কি! খোদ্‌-মালিকের পারমিশন পেয়ে গেলাম সেদিন। জমিদারের ছেলে! কি যে বলো ছাই, তোমার মনটাই খারাপ, তিনি বাগানে থাকতেন এমনি, না-হয় ভোরেই বোধ'য় এসে-ছিলেন; রাস্তার এপার-ওপার বাড়ি আর বাগান! বললেন: নাও না—

—প্রথমেই স্রেফ 'তুমি'? যাক্‌ গে; তারপর? বেশ, নাও আর একটি বারো বাধা দেবো না, বলো। এই মুখে আঙ্গুল দিলাম।

—মালিকে ব'লে দিলেন রোজ সকালেই সব গুছিয়ে রাখতে, আমাদের দিতে। আমাদের খাটনি গেল ক'মে, চুরি-করা প'ড়লো বাদ। চৈতী আর আমাকে ডাকতো না রোজ—প্রায়ই যেতো একা। শুধু তো যাওয়া আর নিয়ে আসা! আমাকে দিয়ে দরকার তার গেল চুকে। প্রথমদিনের তাকাবার ধরণ দেখেই বুঝতে পেরেছিলেম তাঁর চৈতীকে ভালো লেগেছে (সুশীল বাধা দেবে না ব'লেছে; তাই শুধু হাসচে, কিছু ব'লবে না।); পরে জানতেও পেরেছিলেম সে ভালো-লাগা ভালোবাসায় গিয়ে নোঙর ক'রেছে। চৈতী তবু যেতো, তার রূপের আভায় জমিদারের ছেলের হাবা ব'নতেও বাকি ছিল না। তাঁরও চমৎকার গড়ন, এখনো আমার চোখের সামনে ভাসছে। শ্যামবর্ণ অবয়ব, চোখ দু'টোও চমৎকার ভাসা-ভাসা টানা, সত্যিই তিনি উজ্জ্বল—নামও রেখেছে বেশ মানিয়েই। তাঁর সঙ্গে রোজ হ'তো চৈতীর দেখা—ভোরের দিকটায়, সারারাত বোধ'য় ঘুমাতেন না তিনি। এমনি আকর্ষণ!

—যেমন আমার তোমার জন্যে। মুখ দিয়ে অজান্তে বেরিয়ে যায় সুশীলের! সারারাত ও-ও ঘুমোয় নি কিনা কালকে।

—হ্যাঁ ঠিক তেম্‌নি, হ'লো তো? মুখ ফিরিয়ে কেমন ক'রে যেন চায় সুশীলের পানে। যে চাউনির ভাষা সরল, স্বচ্ছ অথচ ঘোলাটে। সুশীল দম নিয়ে নেয়, আবার বলতে বলে,—বলো। হাসে।

—এমনি ক'রে দেখা-শোনা হ'তে থাকে শুধু ভোরে, তারপর দুপুরে তারপর যখন-তখন। ভালোবাসার আবর্তে প'ড়ে তারা দু'জন খাচ্ছিল হাবুডুবু! উজ্জ্বল তাকে প্রেমপত্রও লেখেনি কোনদিন বলেওনি তোমায় আমি ভালো বাসি। না ব'লে ভালোবাসার মূল্য কত যে বেশি তা

বুঝতে পেরেছিলাম এদের দেখে। চৈতীও তাকে চাইতো কিন্তু মনে মনে। যে চাওয়ার দাম সাতটা নক্ষত্র। আমার কাছে কোনো দিনো ভুলেও উজ্জ্বলের সম্বন্ধে কোনো কথাই ব'লতো না। আমি যদি ব'লতাম, ও বাধাও দিতো না, শুনে যেতো মুখ বুজে। দিনের চাকা ঘুরতো দিব্যি যেমন ঘোরবার, ওরা দেখতো তা'তে টাল হ'য়েছে! থামাতে হবে এক্ষুনি। তা'কে ধ'রে মেরামত ক'রে আবার দিতে হবে ছেড়ে—যেমন চলবার তখন আবার তেমনি চ'লবে।

পঞ্চমী থামে না: উজ্জ্বল সব জিনিষকে দেখতে শিখেছে উজ্জ্বল চৈতীর হাতের পালিশ-করা চুড়ি দু'গাছির মতো; চৈতী দেখছে চারিদিকে খড়ানি, শুধু হুহু-হাওয়া আর শুনছে কেবল আকুল কাকুতি, তাদের বাড়ির পেয়ারা গাছের পাপিয়াটার কণ্ঠস্বর যেন সবটাতেই মাখা। মালি রাখতো মালা গেঁথে, চৈতী নিয়ে আসতো। বাসায় ফিরে গলায় প'রতো চুপ ক'রে যা'তে না কেউ ছ্যাখে! আমাকে দেখে পর্য্যন্ত ও পেতো বেজায় ভয়। আমি শুধু হাসতাম মজা দেখে। শিব-পূজো ক'রতো, পুকুর-পূজো ছিল বাঁধা, সব চ'লতো ওই তার-আনা ফুল দিয়ে। শিবের মাটির ড্যালা সামনে নিয়ে চিন্তা ক'রতো আর বোধ'য়, বোধ'য় কেন নিশ্চয়, দেখতো উজ্জ্বলকে। দিন চ'লেছে। চৈতীর প্রাণের আগুনের ফুলকিটুকু হ'চ্ছে দিন-কে-দিন মশালের মতো দাউ-দাউ। কারণ আছে বই কি, বলছি দাঁড়াও না। কারণ হ'চ্ছে চৈতীর বিয়ে যে একেবারে ঠিকই হ'য়েছিল আগে থেকেই। সেবার শ্রাবণে হ'লো তার বিয়ে। দূর, শুনছো কি যা'র সঙ্গে ঠিক ছিল হ'লো তার সঙ্গেই, না না উজ্জ্বল তখন কোথায়! তার নাম মিহির! চৈতী গেল চ'লে রাজসাহীতে—শ্বশুরবাড়ি। ব্যস্,

বাগানবাড়ির পালা হ'লো সাঙ্গ। সেখানে সে পাচ্ছিলো অসীম যত্ন—সবাই ভালোবাসতো তাকে প্রাণ দিয়েই। দেওর ভাসুর সবাই। এখানেও বেশ কাটালো। অষ্টমঙ্গলের পর আবার ফিরে এলো টাঙ্গাইলে। আমার সঙ্গে দেখাও ক'রতে এলো, আমিই যদিও আগেই গিস্লাম। বাগানটায় তখন থাকতো শুধু মালি। উজ্জ্বল তো. নেই-ই সেখানে। তখন সে বলে চ'লে গিসলো দার্জ্জিলিঙে—গরমের দাপটে! আমার সঙ্গে আবার তা'র যাওয়া হ'লো শুরু সেই বাগানেই—অত ভোরে না যদিও, রোদ উঠ্‌লে যেতাম দু'জনে। মালি হাসতো, ও বোধ'য় আনন্দ পেতো খুব আমাদের দেখে। অনেকদিন যাওয়া-আসা ছিল না কিনা ফুল দিতো মেলা। চৈতী সেই ফুল টেবিলে সাজিয়ে রাখতো। ওর বর এলে বোধ'য় তার গলাতেই মালা পরাতো নিশুতি রাতে। আর সেই মুহূর্ত্তেই হয়তো উজ্জ্বল ঘরের মধ্যে মেঘ নিয়ে ক'রতো খেলা, বিছানায় ছট্-ফট্। তা'র দুঃখ যে কত বড়ো হ'য়েছিলো তা কেও বুঝবে না। মুখ-চোরা ছেলে একবারটি বলেনি পর্য্যন্ত তা'র মনের দুরবস্থা! অনেকেই তো জনে্তো তা'দের বাড়ির যে চৈতীর সঙ্গে তা'র দেখাশোনা হচ্ছে! সে কিছু না ব'ললে কি তাদের বোঝার দরকার হবে না? উজ্জ্বল মৌন হয়ে থাক্‌তো ব'সে, শুনেছি অনেকদিন পরে, নিজের ঘরটায়, যেদিন থেকে সে শুনতে পেয়েছিলো চৈতী বিয়ে ক'রে চ'লে যাবে অনেক দূরে। কারণটা কি কেউই বোঝে না? উজ্জ্বল ব'লবে না, তাই বুঝবে না কেউই? উজ্জ্বল ভাবতো! আরো ভাবতো এরা কি বোকা! সে কি ভাবে বোঝে না ঘুণাক্ষরে, না, বুঝেই গুমোট মেরে থাকে! যাক্, সে তারপর তো চ'লে গিয়েছিলো দার্জ্জিলিঙেই। চৈতী ত গিয়েছিল

রাজসাহী,—চৈতী তাকে মাথায় ক'রে ব'সে থাকতো কিন্তু তাদের মধ্যে কতটা ব্যবধান। অনেক দিন কাটলো।

পূজোয় সেবার দু'জনেরি ছাখা। চৈতী পালাতে চায়, বিসর্জ্জনের বাজনা শোনা তার উঠ্‌লো মাথায়। উজ্জ্বল শুধু চেয়েছিলো তার পানে করুণ নয়নে, অনেক দূর থেকেই। ব্যস্‌, আর ছাখা-শোনা হয় নি। চৈতী বোধ'য় ভুল্‌তে চায়। আর উজ্জ্বল চায় মনে পোষণ করিতে। মিহির ওর হাত ধ'রে ফিরে আসে বাড়ি। আজ তিনমাস তাদের দু'জনের হ'য়েছে মিলন আর এদের দু'জনের হ'য়েছে বিচ্ছেদ।

ঝলমলে ব্রিজ ভাঙার খবর উঠলো কাগজে। সবাই প'ড়লো বাসার। চৈতী কাছে এসে শুনতে চায় কিন্তু দূরে স'রে যায় তা'র অজান্তেই;—ওর বুকে নিরেট ব্যথা! বিরাট পাথরের একখানা প্রকাণ্ড খণ্ড ওর বুকের ওপর। তশু´ গিয়েছে বিসর্জ্জন আজ আবার... বাড়িময় একটা চাপা-হাহাকার, ক্রন্দন। চৈতীর বুকে নিবিড় স্পন্দন। সর্ব্বনাশের আবহাওয়া বাড়িটা ময়। কে গেল? গেল কেমন ক'রে?

হ্যাঁ, মিহির সেই মোটরেই ছিল তো। পশু´দিন এখান থেকে রওনা হয়। এই সব কথা চৈতীর মনের, আমাকে ব'লেছিলো, আজ আমি ব'লছি তোমাকে। ব্রিজটা হ'চ্ছে নাটোর থেকে রাজসাহী যাবার পথে। বিসর্জ্জনের পরদিন মিহির হয় রওনা টাঙ্গাইল থেকে। ব্যস্‌, ইস্তফা।

সুশীল ব'লে বসে,—ব্যস্‌, ও-দিকেও চুকলো?

—চুক্‌লো। পঞ্চমী নিশ্বাস ফেলে নেয়: কিন্তু কি আশ্চর্য্য বলো, একটা সংবাদ পর্য্যন্ত দেয় নি তারা এ দুর্ঘটনার। দেবে কি ক'রে? কেন,

টেলি! যাক্, চৈতীকে নিয়ে তার বাপ-মা ছুট্‌লেন রাজসাহীতে। নাম-টাম সবি যে দে'য়া ছিল কাগজে, এটুকু আর বুঝতে পারবেন না তাঁরা? পনেরোজন যাত্রী আর একজন ড্রাইভার সবার হ'লো সলিল সমাধি—বন্দী অবস্থায়, আর চৈতীর হ'লো সমাধা। পরদিনি দেহ পৌঁছলো বাসায়, চৈতী গিয়ে তা-ও দেখতে পায়নি। কে মুখাগ্নি ক'রেছে ওরাই জানে। দিন সাত পরে চৈতীকে নিয়ে তাঁরা ফিরে এলেন—সঁাথের সিঁদুর, হাতের লোহা সব বিসর্জ্জন দিয়ে, থান পরিয়ে। একটা মূর্ত্তিময়ী নিস্তব্ধতা বাড়ির আশ-পাশ ঘিরে রাখতো, মাঝে-মাঝে আবার শুনতাম বেদনার উচ্ছ্বাস, যাতনার মর্ম্মন্তুদ আর্ত্তনাদ, সব-হারিয়ে-যাওয়ার বিহ্বলতা। উঃ, সে দিন ক'টা যা কেটেছিলো এখনো ভাবতে পারি না। পঞ্চমী গা নাড়া দিয়ে ওঠে। সুশীল নির্ব্বাক।—আমরা যেতাম আসতাম, মা-ও যেতেন কিন্তু এই যাওয়া-আসা যেন চুরি করা। চোরের মতো সবার মুখে দুর্ভাবনা বিষাদ! আবার না গেলেও চলে না, বোঝোই তো! আমার সঙ্গে ও কথা কইতো না, আমারও লজ্জা ক'র্‌তো ওর সম্মুখে যেতে! অনেক দিন এমনি ক'রে কাটিয়েছি, তারপর একটু একটু কথা হ'তো—চোখের-জলের সাক্ষ্যে। সান্ত্বনা দিতাম কিন্তু সে সব ভুয়ো, শুধু ওষ্ঠ্য। এর আবার সান্ত্বনা কি হ'তে পারে? মা ব'লতেন, একটু একটু কথা বলবি, ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা করবি। কিন্তু তাকে ভুলিয়ে রাখতে পারি এমন আমাদের কি কথা জানা ছিল?—ওর সম্মুখে গেলেই যা-ও মনে ক'রে যেতাম, সব যেতো গুলিয়ে। তবু কিছু ব'লতে তো হবেই, ব'লতামও। চৈতীর বাবা গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে চোখ মুছতেন, ওর মা রাধতে ব'সে চোখ

মুছতেন, চারিদিকে মুছে-যাওয়া, শুধু হারানো, ফিরে-পাওয়ার বালাই নেই।

একটা বছর কাটলো অশ্রু আর নৈরাশ্যের আবহাওয়ায়। হাসি কান্না এখন পালা ক'রে আসতে শুরু ক'রেছে। কোনোটারি উত্তাল তরঙ্গ গর্জ্জন করে না। শুধু ছোটো খাটো ঢেউয়ের মেলা। পড়ন্ত বেলায় আমরা, পাড়ার মেয়েরা, খেলি কানা-মাছি ওদেরি উঠোনে, চৈতী র'কের কোণে ব'সে থাকে, ম্লান-হাসি হাসে আমাদের রঙ্গ দেখে। এমনি ক'রে ওর বিকেলের সময় কাটাতেম।

চৈতীর বাবা কা'রো শাসন মানতেন না। তিনি ঠিক ক'রলেন আবার চৈতীর বিয়ে দেবেনই। সমাজ তাঁকে ত্যাগ করে করুক; তাঁর আর মেয়ে নেই অনূঢ়া যা'র জন্যে তাঁকে মানতে হবে সমাজের রক্ত-চক্ষু। সবি তিনি মনে মনে ঠিক ক'রেছিলেন বহুদিন আগে, বেদনার কলরোলের মাঝে তাঁর কথা চাপা প'ড়বে এই ভয়ে মুখ ফুটে ব্যক্ত ক'রেছিলেন না। একদিন ব'লে বসেন চৈতীর মার কাছে। পাড়ায় সে কথা র'টলো। একটানা ছি ছি ব'লে কেও মুখ চুলকালেন, কেও খেলেন কাণ-মলা আবার অনেকেই দিতো সায়।

চৈতীর মত না নিলেও চ'লবে। তবু তাঁরা জিগ্‌গেস করায় উত্তর পেয়েছিলেন আর এক ফোঁটা অশ্রু আর সেখান থেকে উঠে-যাওয়া। চৈতী নিজেকে সাম্‌লে নিলো। আবার জিগ্‌গাসায়, সে কিছুই জবাব দিলো না। এবার ওর বাবা ঠিক ক'রে ফেললেন দেবেনই এই ফাল্গুনে যদি সুপাত্র জোটে তার মধ্যে। উজ্জ্বল সব কথাই শুনেছে, তার বাড়িতে সে দেখেওছে কা'রো ভালো লাগছে না চৈতীর বাবার এরকম

বিদ্যাসাগরি ঢঙ, তবু তাঁর জ্ঞান ছিল কিন্তু ইনি কিসের গরমে এমন ক'রছেন? যাক্, উজ্জ্বল ওকে ভালো যখন বেসেছে একবার, আর ভুলবে না। এবার কিন্তু ও নীরব ছিল না, যেমন ক'রেই হোক্ ও জানিয়েছিলো: বিয়ে ও নিজেই ক'রতে পারে। চৈতীর বাবার হ'লো মহা আনন্দ। উজ্জ্বলের বাবার হলো ক্রোধ। ছেলেকে শাসন ক'রলেন: কিছুতেই এ হবে না। উজ্জ্বলও আর মানবে না।

কিছুদিন পর—ফাল্গুনেই হ'লো নব-শুরু বিবাহিত জীবনের। চৈতীর কপালে আবার প'ড়লো সিঁদুরের রক্ত-চিহ্ন। নবীন পতাকা উড়িতে তারা ডঙ্কা বাজালো স্বাধীনতার! উজ্জ্বলকে ওর বাবা ক'রলেন ত্যাগ। তা করুন। উজ্জ্বলকে যে ধন-দৌলত থেকে বঞ্চিত ক'রলেন তার চেয়ে ঢের বেশি সম্পদ উজ্জ্বলের বুকে সঞ্চিত হ'লো। উজ্জ্বল আজ দরিদ্র-ধনী। রাজপ্রাসাদ সে চাইবে না, স্বর্ণ-মুকুট সে ক'রবে পদ-দলিত। চৈতী কতটা সুখী হ'য়েছিল তা বুঝতে পারিনি আজো, কিন্তু এ-টুকু বুঝতে পেরেছি সে তা'র কাম্যকে পেয়ে ধন্য হ'য়েছে। তার মুখে হাসি বেশি দেখিনি কিন্তু যা দেখেছি তা লক্ষ-মাণিকের হাসির চেয়ে কম কিসে? যাক্, বিয়ে তো হ'লো দু'জনের। পৈতৃক ঐশ্বর্য্য তা'র ছোটো ভাই উপভোগ করুক। ও চায় না।

আমারো বিয়ে হ'লো বৈশাখে—হাসি না—বিয়েই তো বটে! শোনো, গেলাম শ্বশুর ঘর ক'রতে। গিয়েছি, মার কাছ থেকে চিঠি পেলাম, উজ্জ্বল নাকি কি একটা চাকরি নিয়ে আমার শ্বশুর বাড়ির দেশেই এসে হাজির হ'য়েছে। চৈতীও নাকি সঙ্গেই অছে। খোঁজ করালেম ওনাকে দিয়ে। দু'তিন দিন পর জানা গেল ও-পাড়ায় ওরা

ছোটো একটা বাড়ী নিয়ে বাস ক'রছে। এ-সব ঘটনা মাণিকগঞ্জের।

—ওঃ, তুমি তবে ঢাকার বৌ! সুশীল কথা ব'লে ফেললো।

—হ্যাঁ। পঞ্চমী আর ও-সব কথায় কাণ দেবে না। আবার বলে,—গেলাম একদিন দ্যাখা ক'রতে দুপুর-বেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে শ্বাশুড়ির সঙ্গে। চৈতীতো আমাকে দেখে আহ্লাদে আটখানা : খোঁজ নেবো ভাবি তোর, হ'য়েই ওঠেনা। আসুন। আসন দিয়ে শ্বাশুড়িকে বসালো ঘরে নিয়ে। আমরা দু'জন ব'সলাম গায়ে-গায়ে। বেশি গল্প সেদিন হ'ল না—শ্বাশুড়ি ঠাকরুণের জন্যে। ওঁর চোখ দেখলেই আমার বুক কাঁপতো—নইলে শুধু শুধুই শ্বশুর বাড়ির দেনা চুকিয়েছি! পরদিন ও গেল, উজ্জ্বলো গিয়েছিলো এগিয়ে দিতে তারপর নিজের কাজে। দুপুর বেলা বাসার চাকরটাকে সঙ্গে নিয়ে আবার গেলাম ওদের ওখানে। সেদিনটা যা কাটলো—চমৎকার!

—আজকের থেকেও ভালো? সুশীল আবার বলে।

—দাঁড়াও তো! শোনো। সারাদিন ব'সে ব'সে কত কথা! এখনো মনে আসচে সে-দিনকার ছেলে-মানুষি! হাসি পায়। কি হাসি-তামাসাই হ'লো! মিহিরের কথা ও বলেই না। বলা বোধ'য় বারণ! মিহির ব'লে কাউকে ও যেন কোনোদিন চেনেনি, জানেনি। সব কথাই উজ্জ্বলের, এর ঔজ্জ্বল্যে মিহির প'ড়েছে ঢাকা! আশ্চর্য্য! সত্যি ব'লতে কি চোখে যেন কেমন বাধো-বাধো ঠেকছিলো। যার জন্যে সেদিন অত মালিন্য তার ওপরেই এত শিগগির এতটা ঔদাসীন্য? শুয়ে, ব'সে, দাঁড়িয়ে, ঘুরে-ঘুরে অনেক কথা হ'লো। যে কথা

গুলোর মানে হয় না—আজকে বুঝতে পারছি। শুধু আবোল-তাবোল!

দিন গেল গড়িয়ে। উজ্জ্বল এসে হাজির। আমার তো লজ্জায় প্রাণ আইঢাই আর কি। আমার দিকে চেয়ে দাঁড়ালো তারপর ব'ললো সংক্ষেপে: চিনি। আপনি চেনেন আমাকে? চৈতী, তোমার সেই বন্ধু না? চৈতী বললো: বলো দেখি কোনটা! উজ্জ্বল হেসে উঠলো হো-হো ক'রে: মাসতুতো ভাই! চুরি ক'রতে গিস্‌লে মনে নেই? চৈতী বুক ঠুকে বলে: চুরি না গো ডাকাতি! লুট ক'রতে গিস্‌লাম।

লুটই বটে! সব লুট ক'রেছে সে আজকে!

অনেক কষ্টে দেখেছিলাম উজ্জ্বলের দেহের সে সৌন্দর্য্যে সূর্য্যের ঝলসানি প'ড়ে কালচে প'ড়েছে। সারা-দিন বোধ'য় টো-টো ক'রে ঘুরে বেড়ায় চাঁদির ধান্দায়, মাথার চাঁদি ফাটিয়ে। নিয়তির কুটিল হাসির ছায়া তার সর্ব্বাঙ্গে। ব'সলো: চৈতি, তোমার বন্ধুটিকে কিছু জলযোগ করাও, সেই সুযোগে আমরাও কিছু পেয়ে যাই। পাখাটা দাও। থাক্‌, নিজেই পারবো। খাবেন তো আপনি এ-বাড়িতে? আপত্তি নেই?—জিগ্‌গেস ক'রলেন। আমি হেসে ব'ললাম: নিশ্চয় খাবো, খাবার পেলে যে না খায় সে তো বোকা! লজ্জা মুহূর্ত্তের মধ্যে দিলাম জলাঞ্জলি।

উজ্জ্বল তো হেসেই আকুল। খাবার এলো, মানে চৈতী তৈরি ক'রে নিয়ে এলো। তিন জনে ব'সে খুব এক পেট খাওয়া গেল।

কী আনন্দের মেলা দেখে এলাম সে-দিন ওদের বাসায়! সে কথা ভুলবো না। কিছুই ভুলবো না আমি। ম'লে, না

পুড়িয়ে মাটিতে পুঁতো, তারপর হাড়গোড় কুড়িয়ে এনে দেখো প্রত্যেক অস্থিতে সুস্পষ্ট হরফে লেখা আছে আমার জীবনের ইতিবৃত্ত। কত কী-যে দেখেছি তা জানে পঞ্চমী দেবী আর জানেন তার স্রষ্টা। বিশ্বেস ক'রবে না, যতই আনন্দ আমি দেখি আমার মন আসে মীইয়ে, বুক করে টনটন, আমার চোখ সুখ দেখবার জন্যে সৃষ্ট হয়নি। (পঞ্চমীর চোখে জল এলো) তারপর একদিন শুনলাম উজ্জ্বলের নাকি অসুখ ক'রেছে......

—বাবু এখন খাবেন? সব তৈরি। প্রিয় এসে ডাক্‌লো।

—চলো, খেয়েই আসি কি বলো। এসে শেষটুকু শুনবো। বাজলো ক'টা, ওঃ, মোটে বারোটা!

পঞ্চমীও উঠ্‌লো।

প্রিয়র বুদ্ধি আছে। দু'পাত পেতেছে তফাৎ ক'রে। একপাতে ডিমের ডালনা, আর একটায় সেদ্ধ-ভাজা। না ব'লতেই ও সব গুছিয়ে নিয়েছে। পঞ্চমী মন্তব্য প্রকাশ ক'রলো: বেশ গোছালো!

—কার চাকর দেখতে হবে তো! মুনিবকা মাফিক্‌। সুশীল হাসলো।—ভাত ভাঙো লজ্জা কি?

—তোমায় দেখে লজ্জায় তো আর আমি চোখে দেখিনা। পঞ্চমী সুশীলকে মানেই না দেখছি।

প্রিয় ঠিক তত্ত্বাবধান ক'রছে। ওর কাজে কামাই নেই।

খাওয়া-দাওয়া শেষ ক'রে মুখ ধুয়ে আসতে বেজে গেল সাড়ে বারো।

—উঃ, কত খেলাম আধ-ঘণ্টা ধ'রে! ঢেকুর তোলে বিরাট একটা।

—তোমার পেট ভ'রেছে তো?

ওরা ব'সলো আবার চৌকীর ওপর। পঞ্চমী শেষটুকু ব'লবে এবার। সুশীল উঠে প'ড়লো: দাঁড়াও, একটা সিগার ধরিয়ে নি। অনেক্ষণ টানা হয় নি !

—চোখে বোধ'য় ধোঁয়া দেখছে ! নেশা বলে একেই !

—দেখছি কই ? ধরিয়ে নি দেখবো বই কি ! সুশীল এসে ব'সলো। পঞ্চমী এবার আরম্ভ করুক।

—নাও, বলো। সেই অসুখেই হ'লো কাবার। এই তো ? সুশীল সব জানে।

—ব'লতে যখন আরম্ভ করিছি—শেষ করবো আমিই। সেই অসুখের মধ্যে দেখেছিলাম ভালোবাসা বলে কা'কে। সারারাত্ত জেগে চোখ দু'টো রক্ত-জবা। তবু বিরাম নাই, নাই বিশ্রাম, অশ্রান্ত পরিশ্রমে চৈতীর নিটোল গড়নে টোল প'ড়ছে। আমি বাপু অত ভালো কাউকে বাসিনি, এ জন্মে আর বাসা হ'লোও না। লজ্জা দিয়েছে উড়িয়ে। ডাক্তারের সাম্নে দিতো কেঁদে: যেমন ক'রেই হোক, আপনার বাঁচাতেই হবে। গায়ের গয়না বাঁধা দিয়ে, বিক্রি ক'রে চালাতো ভিজিট, ওষুধের দাম। মাণিকগঞ্জ জোড়া একটা ঠাট্টা-বিদ্রূপ হ'য়ে আছে আজ অবধি তার কপালে। একা-মানুষ সাত দিন সমানে নিঃঘুমে কাটিয়েছে। সতন্দ্র চোখ অতন্দ্র দিবস। ওর তখন মনের অবস্থা কেমন বলো তো ? একটা স্বামীকে চিবিয়ে আর একটার স্কন্ধে ভর্ ক'রেছে, চৈতীই ব'লতো এসব আমাকে, আমার মনের কথা ভেবো না যেন। মুখটা ঘুরিয়ে টানো, আমার মুখে ধোঁয়া আসচে যে !

সুশীল স'রে গিয়ে শুলো।

—থাক্ সে তা'র স্বামীকে বাঁচিয়ে তুললো। এত আকাঙ্খার জিনিস্ অত সহজে জল হ'তে পারে না। বাঁচাবে না? বাড়িতে একটা খবর পর্য্যন্ত দেয় নি—কে দেবে? আমি শুধু লিখেছিলাম মা-কে: উজ্জ্বলের একটু অসুখ ক'রেছে। মা-ও বোধ'য় সে-কথা ব'লে ওদের চিন্তিত করেন নি। আমাকে লিখেছিলেন: উজ্জ্বলের সুস্থ সংবাদ দিস্। ইত্যাদি।

কেও জানলো না। রোগ-ভোগ কপালে ছিল, ভুগে উঠ্‌লো সেরে। চৈতী সেই সুযোগে একটু ভুগে নিলো—তেমন মারাত্মক কিছু না। এমন সময় আমার এই দশা হ'লো। কান্নাকাটি কর'তে হয় ক'রলাম? আসন্ন আষাঢ়ের সঙ্গে আমার চোখে ঘনালো কালো মেঘ। বেশ বেঁচেছি বাবা বুঝছি। খুব ভাগ্যি আমার! পঞ্চমী থেমে নিলো (নিজের ভাগ্যের যতই সুযশ গাক তার তন্ত্রীতে তখন কী সুর বাজছিলে তা' জানে কেবল পঞ্চমী নিজে)। আবার বলে দম্ নিয়ে: আমার নিজের কথা চুলোয় যাক তা নিয়ে ভাবি না। যা বলছিলেম, হ্যাঁ,—বাঁচিয়ে তুল্‌লো। আমার তখন কী মনে হ'তো জানো?—মনে হ'তো এর নাম যদি চৈতী না হ'য়ে হ'তো বেহুলা হ'তো সাবিত্রী, অত বড়ো নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য তা-হলে আর কিছুতেই পাওয়া যেতো না। হাসির কথা নয়, সত্যি। সত্যিকারের ভালোবাসা বলে একে। মিহিরকে এতটা বেসেছিল কি না কে জানে।

—বাসতেই পারে না বললাম না তোমার এর আগে।—সুশীল সায় দিলো।

—কঙ্কালসার চেহারা। কে ব'লবে সেই চৈতী এই। রঙ ব'দলে

ছাই হ'য়েছে, পাংশুল কালো। ঠোঁট দু'টো, যা' ছিল ওর সর্ব্বাঙ্গের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য্য তা হ'য়েছে ফ্যাকাশে। কি বিশ্রী! এ যেন আর কেউ। উজ্জ্বল সেরে উঠ্‌লো। আচ্ছা আমি বলি উজ্জ্বলের মার হৃদয়খানা কি! তিনি কি একটীবারের জন্যে ভাবেন নি তাঁর ছেলে কত সুদূরে ব'সে তাঁকেই স্মরণ ক'রে বালিস মুখে চেপে ফোঁপাচ্ছে কি না? তিনি এর জন্যে দৈনন্দিন দু-ফোঁটা চোখের জল উৎসর্গ করেন নি মঙ্গল কামনা ক'রে? করাই স্বাভাবিক না করা পাশবিক! যাক্‌, উজ্জ্বল কিন্তু ভাবতো তার স্নেহের উৎসের উদ্দেশে বেদনাশ্রু দিতো উপহার খুব গোপনে, তবু চৈতীর চোখকে ফাঁকি দিতে পারেনি। চৈতী যদি জিগ্‌গেস ক'রতো কি ক'রছো বসে? চোখে জল কিসের? বুদ্ধি তার কম' ছিল না, দেখোতো কি পড়িলো চোখে—ব'লে কথা দিতো পালটে। চৈতী বুঝতো এ অভিমানের উচ্ছ্বাস, তবু চোখ দেখতো, বলতো একটু ওপর দিকে চাও, ওঃ, ছোট্ট একটা কুটি। আচলের কোণ পাকিয়ে চোখ থেকে বা'র ক'রতো শুধু শুষে-আসা দু'ফোঁটা অশ্রু।

দিন আবার দুললো—দুলে দুলেই এটা চলে কি না। দোল দিয়ে ঝাঁকি ছায়, জানায় আমি চ'লেছি। সেই প্রতি ঝাঁকুনিতে আসে আশা দুরাশা, হতাশা, আর আসে সুখের তরণী দুঃখের ঢেউ, আবার সেই দোলনেই তরী যায় তলিয়ে—অগাধে। ঢেউ ওপর-ওপর ভাসে, হাসে ক্রূর অট্টহাসি, বিকট চীৎকারে গলা খাঁকরায়, কিনারে করে আঘাত—যার ওপর কোনো প্রতিবাদ চলেনা। দিন দুল্‌লো।

চৈতীর বাসায় আবার ফিরে এলো হাসি, আনন্দ, আশা। আবার তা'দের সুখের জীবন শুরু হ'লো।

ভ্যাখা ক'রতে যেতাম প্রায়ই—কিন্তু উজ্জ্বলকে দেখে আমার মন চনমন ক'রতো—ভালো লাগতো না। সে ঔজ্জ্বল্য গেলো কোথায়? সে মধুর কণ্ঠস্বর! বড়োলোকের ছেলে—তোয়াজে মানুষ, এমন নিদারুণ পরিশ্রমে শরীরে শৈথিল্য এসে পড়ে, আসে অলসতা। খাটতে যেন আর পারেনা ও। কারুর কাছে তবু এক বিন্দু সাহায্য চাইবে না। ও প্রতিজ্ঞা ক'রে বেরিয়েছে বাড়ি থেকে একটি দিনের তরেও সে কারো করুণা যাচনা ক'রবেনা—যেমন দুর্দ্দশাতেই পড়ুক না কেন। তাই কোনো দিন কারো কাছে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ ক'রতো না। বাড়িতে দিতো না একখানা চিঠি, দেবে কেন ও, কিসের দুঃখে? তাড়িয়ে দে'য়ার প্রতি দান? একদিন বললাম, আপনার শরীর তো বড় খারাপ হয়ে গিয়েছে। হেসে বললেন ও কথা ব'লতে নেই, শরীর তবে আরো খারাপ হ'বার সম্ভাবনা। কারণ হ'চ্ছে, এ শুনে আমি ওই কথাই ভাববো, ফলে হবে—যা বললাম। ব'লতে নেই। মোলায়েম কথা বলবার ধরণ। ব'লে আমিই অপ্রস্তুত। যাক তবু কি ফুর্ত্তি তাঁর মনে। ডাকলেন চৈতীকে: এদিকে এসো তোমার বান্ধবী কি বলেন শোনো—অমি নাকি রোগা হ'য়ে গেছি—মাথা খারাপ নাকি চাঁদকে মুহূর্ত্তে তারা ব'লে ফেলতে পারেন দেখছি। অমন ব'লবেন না আর চৈতী কিন্তু আপনার সঙ্গে তা'লে আড়ি ক'রবে। কি বলোচৈতী, ঠিক না? আর হাসতেন প্রাণ খুলে।

আমার এমন হওয়ার কথা চৈতীকে কখনো তুলতে বারণ ক'রে দিয়ে ছিলেন, ব'লেছিলেন: শুধু ভুলিয়ে রাখবে অন্য কথা ব'লে ও-কথা যেন কখনও ভুলেও ব'লো না!

চৈতী তবু যে কিছু বলে নি এমন না। ওর ধারণা ছিল আমিও ওর মতন কিছু করবো—কিন্তু আজ অবধি তো করিনি, শেষ জীবন পর্য্যন্ত না দেখে বলা কঠিন—মনের কথা তো, কখন বিগড়ে যায় কে জানে তা। (এ শুনেও সুশীল কিছু বলবেনা।)

সুশীল হঠাৎ মাথা তুলে ব'ললো দু-মিনিট ফাষ্ট। ঐ যে তোপ প'ড়লো! গির্জ্জার ঘড়িও উঠ্‌লো গুঙিয়ে বেজে। এ-টা পঞ্চমী বেশ শুনতে পেয়েছে।

—আমাকে বাবা এসে নিয়ে গেলেন মায়ের অসুখে। চৈতীকে ছেড়ে যেতে বাধ্য হ'লাম। সে দিন আমার মনের অবস্থা যেমন হয়েছিল তা বলবার নয়—ভাবতে এখনো মন খারাপ হ'য়ে ওঠে। অলঙ্কারের পারিপাট্য এসে দাঁড়িয়েছে নিরাভরণায়। তখন তার গলায় একটা শরু চেন-হার হাতে দুগাছি মাত্র চুড়ি। যাবার সময় দ্যাখা ক'রতে গেলাম ওর সে কি কান্না—এখনো শুনতে পাচ্ছি। চোখ মুছে বারে বারে বারণ করে দিলো : আমাদের এ-কথা কাউকে বলিল্ না ভাই মা যেন ঘুনাক্ষরে না জানতে পারেন—দুঃখ পাবেন। দিব্যি রইলো বুঝলি? আবার দুচোখে এলো বন্যা। সমবেদনায় আমার চোখেও যে জল আসেনি এমন না। তার চোখ মুছিয়ে দিতে আমার হাত ওঠেনি। চৈতী তার আঁচল দিয়ে আমার চোখ দিলো মুছে, আবার বললো : কি চেহারা হচ্ছে ওঁর দেখছিস্ তো? সারাদিন ঘুরবেন তবু বাধা মানেন না কি করি বলতো? না খেয়ে থাকা এর চাইতে ঢের ভালো। আমি তাঁকে চিবোচ্ছি—দগ্ধে দগ্ধে—চৈতী ফুপিয়ে কেঁদে উঠলো।

সেদিন বিদায় নিয়েছিলাম প্লাবনের মাঝে। সারাটা পথ আমার

মনে দাপাচ্ছিল চৈতীর মনের হাহাকার, মর্ম্মদাহী বিকট কারুণ্য। তার দুঃখে আমার নিজের মনের পাপিয়া থেমে গিয়েছিলো।

চৈতী ব'লেছিলো তাদের ঘরে যে অতিথি আসচে তাকেই বা কি খাওয়াবে। গরুর দুধের পয়সা পাবে কোত্থেকে?

সান্ত্বনা দিয়েছিলাম,—নিজের সংস্থান নিজেই ব'য়ে আনে ভাই। কেও কাওকে খাওয়ায় না। দেখবি তার খাদ্য তার জুটবেই।

বাড়ী এসে মাকে নিয়ে কান্নাকাটি হ'লো যথেষ্ট। সে-কথা না-ই শুনলে। বছর দুই ছিলাম বাবার কাছে—মাকে খেয়ে-দেয়ে!

চৈতীর চিঠি পেতাম—পেন্সিল দিয়ে কোনো রকমে মাসে একটা চিঠি ও লিখতোই আমাকে। সে চিঠির ভেতর তাদের দৈন্যের আভাস পাই নি। ভাবলাম, বোধ'য় সংসার শুধ্‌রে নিয়েছে। তারপর দীর্ঘ নীরবতার পর মাস ছয় পরে সুসংবাদ পেলাম চৈতীর আঙ্গিনায় ফুল ফুটেছে।

শ্বশুরবাড়ি থেকে তলব এলো—যেতে হবে। ঘরের বৌকে পরের বাড়ি রাখা নাকি তাদের দেশের রীতি নয়! এর আগেও যে আসে নি এমন নয়, কিন্তু বাবাকে একলা ফেলে যাওয়া কি বীভৎস বল ত তুমিই! এবার বাবা আমাকে এক রকম জোর ক'রেই দিলেন পাঠিয়ে। ও-বাড়ির দেওয়ানজী এগিয়ে দিয়ে এলেন। সে আর এক বিদায়ের পালা। চিরজীবন আমার বিদায় নিয়েই কাটছে। কবে যে শেষ বিদায় নেবো তাই ভাবি। পঞ্চমী নিবিড় দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো। সুশীল ব'ললো,—আবার গেলে শ্বশুরবাড়ি?

—গেলাম কি আর? নিয়ে গেল জোর ক'রে। মেয়ে-মানুষ তো!

জীবনটা গোলামি ক'রেই কাটবে—এ তো তাদের ভাগ্যলেখা। শ্বাশুড়ি আড় চোখে চেয়ে দেখে নিলেন,—এলামই তবে! থাক্, আমার কথা!

চৈতীর সঙ্গে আমার দেখা করা বিশেষ কর্ত্তব্য। যাবো-যাবো কিন্তু যাওয়া হ'য়েই ওঠে না। শ্বাশুড়ি কে জিগ্‌গেস করতে পেতাম ভয়। চাকরটাকে ডেকে চিঠি লিখে পাঠালেম:

ভাই চৈতী,

আমি দিন ছয়েক এসেছি। তোর সঙ্গে আজো দেখা করে আসতে পারিনি ব'লে আমি নিজেই লজ্জিত। কেন যাই নি তার জবাব দেবো সাক্ষাতে। তোকে দেখতে আমার বড়ই ইচ্ছা। বছর দু-আড়াই তোর সঙ্গে তো দেখাই নেই। যদি পারিস্ নিজেই আসিস্ একটাবার।

চাকার চিঠি হাতে এলো ফিরে। বাড়ি নাকি খালি—ভাড়া দেবার নোটীশ ঝোলানো! এবার কাকে দিয়ে তাদের সংবাদ নি? আর তো আমার কেউ নেই। বাচ্চা দেওরটাকে ধরলাম, লক্ষ্মী ভাইটী, একটা কাজ করবে? ঘুড়ি ওড়াবার পয়সা দেবো দুটো। ইস্কুল থেকে ফিরে তোমার সেই বৌদিটার খোঁজ করে আসবে? বুঝলে না ঐ যে আমার বন্ধু, চৈতী। চিনলে তো? খোঁজ ক'রো, আচ্ছা?

তাকে রাজি করালেম। ইস্কুল থেকে ফিরে, আমার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে বেরিয়ে গেল। সন্ধ্যেয় ফিরে এসে ব'ললো: কই বাড়ি? নাও, তোমার পয়সা ফিরিয়ে, শুধু শুধু খাটনি। দুঃখেও হাসি এলো। তার পয়সা তাকে দিয়ে ব'লে দিলাম। রোজ খুঁজবে, আরো দু-পয়সা দেবো।

একদা

সেদিন সকালবেলা ছুটে এসে বললো, বৌদি শোনো, শিগগির এসো জানালার কাছে। ঐ ভদ্দরলোক না? ইয়ের বর।

দেখি, উজ্জ্বল ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলেছে মথো নিচু করে। বললেম, যারে দৌড়ে, আসতে চাইলে ডেকে আনবি। কোথায় আছেন জিগগেস করবি, বুঝলি তো?

ফিরে এসে বললো কিছুতেই এলেন না। বললেন, হামনডাঙ্গায় গেলেই পাওয়া যাবে! আমি আজকেই খুঁজে আসবো, দেবেতো পয়সা, দু'টো না বৌদি চারটে!

উজ্জ্বলই কি? যাকে দেখলাম এতো উজ্জ্বলের মতো না। ময়লা জামা, পিঠ ছেড়া—গা বার করা। এদের হ'লো কি? ভাবলাম।

দেবো চারটেই ঠিক খুঁজে আসবি। পাওয়া চাই-ই বুঝলি? ব'লে তাকে আরো উৎসাহ দিলাম।

তা'দের আশায় দু'দিন কেটেছিলো। কোনোই সংবাদ পেয়েছিলাম না। কি-যেন একটা অশান্তি ঘুরতো, নিয়ত, অবিরত।

প্রথম দিন এসে বললো,—আজ আমাদের ম্যাচ্ ছিল বৌদি, রাগ ক'রো না। বলো, রেগেছ কি না।

পরদিন আমিই তাকে ধরলাম,—যাবে কিন্তু আজকেই বুঝলে?

ঘাড় নেড়ে বাড়ি থেকে লাটাই হাতে বেরিয়ে গেল, বুঝলাম তা'দের খবর আজও পাবো না কিন্তু সংবাদ পেলাম সেই দিন সন্ধ্যায়।

—ওরা ভদ্দরলোক না বৌদি? তবে অমন বাসায় থাকে কেন?

তার কথার কোনই উত্তর দিই নি।

ওকে নিয়েই তার পরদিন সন্ধ্যেয় গেলাম চৈতীর সঙ্গে দেখা

করতে, হাতে দুটো টাকা নিয়েছিলাম ওর ছেলে দেখবার জন্যে।

অদৃষ্টের প্রগতি কতদূর কে জানে।

অন্ধকারের সুরঙ্গ পেরিয়ে কত পথ হাঁটলাম তা কি ব'লবো। গলিতে ঢুকলাম অবশেষে, ছুঁচোগুলো কিচকিচ ক'রে সরে গেল। দু'পাশের ভিতে ঘুঁটে শুকোতে দেয়া। কাদায় গলিটা প্যাচ্‌পেচে, গন্ধে বমি আসে। তার ভেতর দিয়ে ভোঁদর আমায় নিয়ে এগিয়ে চললো। বললাম ঠিক যাচ্ছো তো?—না পথ ভুল্‌লে?

—এসো না তুমি আমার সঙ্গে, দ্যাখো ঠিক নিয়ে যাই কি না। কাল এসে দেখে গেলাম। আমায় আশ্বাস দিয়ে ব'ললো। আমার গা করছিলো ছম-ছম; পা তুলে মাটিতে ফেলতে করছিলো ভয়-ভয়, কার ওপর পা পড়ে কে জানে,—পোকামাকড়ের অভাব হবার কারণ নেই এখানে। এখানকার মুন্সিপ্যাল বোধ'য় জানে না যে এ দেশে এ গলিটা আছে—একটা আলো পর্য্যন্ত দেয় নি কেন তবে? আরো নাকি যেতে হবে। এ পাশের দেয়ালে চার-কোণা একটা আলো প'ড়েছে—অস্পষ্ট। উল্টো দিকের ঘরে প্রাণী আছে বোঝা গেল, এখানে কি লোকের বাস নয়? একটা কথা পর্য্যন্ত শোনা যাচ্ছে না। সবগুলো খোলার ঘর, বাতার চ্যাল, মাটি ল্যাপা। অন্ধকার যতই হোক এ-টুকু ঠিকই বোঝা যাচ্ছিলো। ভোঁদর বললে,—চলে এসেছি বৌদি! উত্তরে ব'ললেম,—তুই ঠিক আসচিস্‌ তো? দেখিস্‌—। একটা কুকুর শুঁকে-শুঁকে এগিয়ে যাচ্ছিলো,—মাটির কী পদার্থ ও শোঁকে ওই জানে।—এই টে। ভোদর থামলো, ডাকতে প্রথম মুখে রা বেরুচ্ছিলো না, লজ্জা করছিলো; তবু

ডাকলাম,—চৈতী। কড়া নাড়লাম। অল্প পরেই দুয়োর গেল খুলে; কে? ভয়ার্ত্ত কণ্ঠস্বর। আমি উত্তর দিলাম। —পঞ্চমী বুঝি? চৈতী আশ্চর্য্য হয় নি। ও যেন প্রতীক্ষাই করছিলো।

ভেতরে নিয়ে গেল। কাদা মেখে ছেলেটা মাটির উপর ঘুমোচ্ছে কুপির আলোয় দেখতে পেলাম—তার কালো ধোঁয়া এঁকে-বেঁকে আকাশে উঠ্‌ছে! ছেলেটার কোমরে একটা ডোর—আধলা ছ্যাঁদা ক'রে ঝোলানো। এতক্ষণ দেখতে পাই নি উজ্জ্বল ও-কোণে মেঝের উপর মাদুর পেতে শুয়ে। বললাম, কি বাসায়ি আছেন দেখছি। শুয়ে যে, শরীর অসুস্থ বুঝি? উত্তর দিলো,—সুস্থাসুস্থের বাইরে, রকম দেখে বুঝছেনই তো! ব'সো না খোকা, এসো এ-দিক। ভোঁদরকে বসালো।

চৈতী কোনো-রকমে লজ্জা-নিবারণের উপায় ক'রে নিয়েছে তা'র ছোট্টো ছেঁড়া কাপড়টা দিয়েই। তবু যেন বিশুষ্ক যৌবনকে আবরণ দিতে অতটুকু জিনিস্‌ আর পারছে না। চৈতী নড়া-চড়া একদম বন্ধ ক'রেছে তাই। রোয়াকে খুঁটি হেলান দিয়ে ব'সে আছে চুপ ক'রে। ওকে ডাকলাম না। ওর কাছে গিয়ে ব'সলাম: কেমন আছিস্‌ সব? নিয়ে আসবো বাচ্চাকে? খোকাটাকে তুলে নিয়ে এলাম। এত রোগা ক'রে ফেললি কি ক'রে? উত্তর দিলো: না খাইয়ে। কি খাওয়াবো! সেই চাকরিটা গিয়েছে তারপর কি দুঃখে সংসার চ'লছে তা-তো দেখ্‌ছিস্‌ই। দেখছি ঠিকই! —দেড় বছরের ছেলে হবে তাগরা, কিন্তু দেখ তো কি মহাপাপ করছি আমি, মাই দেবো' তাও টিপলে এক ফোঁটা দুধ বেরোবে না। শরীরের রস যে সব শুকিয়ে গিয়েছে! তারপর কি

দুঃখে থামলো ; তা'র চোখে জল নেই, পাগলের মতো চাউনি। আমার কাছে ওর কিছু মাত্র লজ্জা নেই, সমস্ত কথা আমার কাছে চিরদিনই খুলে বলে। আমি শুনলাম, দেখলাম। আমি কি সাহায্য ওদের ক'রতে পারি? আমার সেদিন তো আর নেই! আর আমার সাহায্য ওরা গ্রহণই বা ক'রবে কেন?

চৈতীর হাতে সেবার দেখে গিয়েছিলাম দু'গাছি চুড়ি এবার দেখলেম তা-ও খুইয়েছে। চারগাছি বেলোয়ারী চুড়ি, একটী লোহা হাতে সম্বল— শাখাগাছ পর্য্যন্ত নেই। এত বড়ো দৈন্য এত শিগগির আস্‌তে পারে— আশ্চর্য্য।—এ বাসায় এসেছিস্ কত দিন হ'লো? জিগ্‌গেস করলাম ; বললো,—এই মাস দু-আড়াই। ভদ্র সমাজে থাকা দায় হ'য়ে উঠ্‌লো। ভাড়া বোনা হ'য়ে উঠ্‌লো অসম্ভব। বেশ আছি ভাই, লোকের মুখ দেখতে হয় না ;—নিজেরটা দেখাতে হয় না কাউকে। আমি কি অলক্ষ্মী বল্ দেখি, উঃ—চৈতীর চোখে আবার জল এলো। সান্ত্বনা দিলাম,—ছিঃ, ও সব কি কথা : কিন্তু মনে-মনে বুঝলাম সব সত্যি। চৈতীর উপর আমার এলো করুণা, আমার ব'লে যা আছে সর্ব্বস্ব বিলিয়ে দিতে আমার ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু আমারই বা কি ছিল আর ওরাই বা নেবে কেন! আজ সারাদিন ওরা আছে না খেয়ে—খাবার জোটে নি ভাগ্যে। চৈতী খুলেই ব'ললো ;—তাই উজ্জ্বলকে বাড়ি থেকে বেরোতেও দেয়নি ও। কি জানি পথে মাথা ঘুরে প'ড়ে কি-বিপদ আস্‌বে কে জানে! খোকার হাতে টাকা দুটো দিলাম। চৈতী বলে উঠ্‌লে বাধা দিয়ে : ও কি ভাই! ও তুই নিয়ে যা। এ জান্‌লে তোকে কিছুতেই সব কথা ব'লতাম না। ব'ললাম : সে কি কথা, এ যে দিতে হয় ভাই—প্রথম দেখতে এসেছি।

আরো বললো : আমার কিন্তু বেজায় লজ্জা ক'রছে ছিঃ ছিঃ। বাধা দিলাম : লজ্জার কোনোই কারণ তো দেখি না, কিসের লজ্জা ভাই? আমি একে দেবো ব'লেই নিয়ে এসেছি। তাতে কি! ও বোধ'য় ভেবেছিলো তাদের উপবাসের কথা শুনেই আমি সাহায্য করছি। উজ্জ্বলকে ডাকলো,—এদিকে একটু আসতে পারবে তুমি? দেখে যাও কাণ্ডটা। উজ্জ্বল উঠে এলো : কি, হ'লো কি বলো তো! চৈতী সব বল্‌লো খুলে। উজ্জ্বল কোনো কথাই বললো না আবার ঘরের ভেতর চ'লে গেল। তা'র পরণেও দেখি একই মলিন শতচ্ছিন্ন উত্তরীয়। চৈতী জিগ্‌গেস ক'রলো দেশের কথা : সবাই কেমন আছে ভাই? আমাদের বাড়ির শিউলি গাছটা এখনো বেঁচে আছে? মা বোধ'য় বুড়ি হ'য়ে গেছেন? বাবার কাশীটা কেমন? রাজুর মেয়েটা কত বড়ো হ'য়েছে? তুই নদীর ধারে বেড়াতে যেতিস্‌? অনেক দিন যাই না দেশে, সংবাদ নি না কারুর, কেমন হয় মনটা বল্‌তো? এ দুর্দ্দশা নিয়ে কারো সঙ্গে আর... চৈতীর চোখে-মুখে আসে ঔদাস্য।—মা আমার' কথা জিগ্‌গেস করতেন না? বাবা? কাঁদেন? চিঠি দি না ব'লে দুঃখ করেন? ওঁদের কত চিঠি এসে জমা হ'য়েছে ঘরে কিন্তু একটা উত্তর পর্য্যন্ত দি নি, ইচ্ছে করে না ভাই। প্রায় এক-বছর হ'য়ে গেল বাবা এসেছিলেন এখানে—দেখাশুনা ক'রে গেলেন। তখনই দেখেছি হাঁপানিটা যেন কেমন-কেমন। দেশে একবার যেতে বড্ড ইচ্ছে করে, দিন যদি ঘোরে, তবে দেশে একবার যাবোই। চৈতীর প্রাণের ডাক প'ড়েছিলো দেশের—দেশের মাটির জন্য তা'র প্রাণ বিরহ বেদনায় ভুগছিলো। এমন ছন্নছাড়া জীবন চৈতী আর উপভোগ ক'রতে হয়তো পারছিলো না। এ-দেশ

ছেড়ে অন্য কোথাও সে যেতে চাইছিলো! উজ্জ্বল বেরিয়ে এলো ঘর থেকে : তোমরা দু'জন মৌনব্রতধারী নাকি? কি ভাবছো ব'সে দু'জন? আপনার কেমন মনে হ'চ্ছে আমাদের সংসারটা? টাকা দু'টো নিয়ে যান আজকে, অন্য দিন দেবেন, আজ দিলে বেআড়া দেখায় না কি? বলুন আপনি? উজ্জ্বলের মুখে তবু হাসি। আরো ব'ললো,—আপনার সঙ্গে কোনো কথা বলিনি ব'লে মনে কিছু ক'রবেন না। এ-বেশে বেরোতে লজ্জা ক'রছিলো। কিন্তু দেখলাম লজ্জা করাটাই লজ্জাকর অন্ততঃ আপনার কাছে। ব'স্‌লো সেখানেই।—আপনার দেওর একা ব'সে থাকলো ঘরে, এখানে ডাকি কি বলেন?

রাতের অন্ধকার;—রোয়াকেও অন্ধকার। কুপির আবছা আলো আসছিলো, সেইখানে পাঁচটি প্রাণী আমরা নির্ব্বাকে ব'সে ছিলাম। চারিদিকে কুটিল কালো ছায়া অশরীরী অপদেবতার মতো। আমাদের রকম দেখে তারকা হাসছিলো আকাশে—তা হাস্থক,—হেসেই তো ওরা সবার ভালবাসা পায়। ফিরে যাবার কথাই ভাবছিলাম শুধু, এ প্রেত-পুরীর থেকে বেরোবার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে তো? চৈতীদের আমি বিদ্রূপ করছি ভেবো না, সত্যিই সেটা প্রেতপুরী ছাড়া আর কিছু বলবার মতো এতটুক চিহ্নমাত্র ছিল না। চৈতীর অসাড় কালো চোখ জ্যোতিহীন তবু অন্ধকারে জ্বলজ্বল করছিলো, আলোয় দেখলে ছাখা যেত সে চোখ করছে ছল-ছল। এ-দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও গেলে তো আর আমার দেখতে হ'তো না এদের।

এর চেয়ে চৈতী যখন রাজসাহী ছিল তা'কে তালাইমারীতে দাহ ক'রলেই সব যেতো চুকে,—মিহিরকে যেখানে দিয়ে এসেছে ছাই ক'রে।

চৈতী বলতো, সেই আমার ভাল ছিল ভাই, কিন্তু এ-ও নিতান্ত খারাপ কিসে ?

এত দুঃখকেও চৈতী নিতান্ত খারাপ জ্ঞান ক'রতো না—আশ্চর্য্য !

অনেকক্ষণ নির্ব্বাক কাটলো। ভেঁাদর বললো,—চলো বৌদি, যাবে এখন ? চৈতী বাধা দিলো না। কেবল ব'ললো মাত্র : আবার আসিস্ ভাই,—কাল দুপুরে আসতে পারবি ? সময় যে কিছুতেই কাটাতে পারি না। সারাদিন খোকাকে নিয়ে প'ড়ে থাকি একা ! উঠে প'ড়লাম। উজ্জ্বল গলিটা পার ক'রে দিয়ে গেল।

সারাপথ ভেঁাদরকে হাজার কৈফিয়ৎ দিতে দিতে হাঁটতে ক'রলাম শুরু। ধর্ম্ম-সভার পাশ দিয়ে হেঁটে চ'ললাম। সেখানে 'কথা' শুনতে এসেছে লক্ষযাত্রী। ঠাকুর মশাই উচ্চ গলায় ব'লে উঠ্‌লেন : সাবিত্রী তার স্বামীর সঙ্গে গেল প্রেতপুরী। তারপর সুর ক'রে গান ধ'রলেন। ভাবতে ভাবতে গেলাম এ-কথা আমাকে শোনাবার কারণ কি ? ব'সে যাবো, শেষটুকু শুনে ? তবু বসি নি, ফিরে এলাম বাসায় রাত্তির দশটায়। শাশুড়ির খোঁটা শুনলাম যথেষ্ট : প'ড়ো ছেলের একটা রাত মাটি ক'রে ধিতিং নাচন পাড়ায় পাড়ায়—এ কি ঘরের বৌ-র কাজ গা ? কাকে জিগ্‌গেস করলেন উনিই জানেন। শাশুড়ির চোপা নাড়া সহ্য হয় নি ব'লেই আজ আমার এই দশা !

চৈতীর ওখানে আরো অনেক দিন গিয়েছি—সকলের হ'য়েছি চক্ষুশূল। তবু বন্ধুর সংবাদ ন' নিয়ে সবার সুনজরে আমি থাকতে কোনোদিনই চাই না—সবাই আমার নিন্দে করুক আমি তবু উচ্ছৃঙ্খল।

ওর ছেলেটা দিন-দিন ক্ষীণ হ'য়ে আসচে। ওর আয়ু ফুরিয়ে

এসেছে বুঝতে আমার বাকী ছিল না। চৈতী মরুক,—সে আর কত সইবে। কেঠো প্রাণ, জ্যাম্তে তারা মরে আঘাতে আঘাতে, প্রাণ বেরোয় না। চৈতী আজো তাই বেঁচে আছে।

অমাবস্যায় তাদের ঘর দেখে এসেছি,—বর্ষানিতে দেখতে আমার কুষ্ঠিতে ছিল লেখা। মেঘ মাথায় নিয়েই বিকেলের দিকে পথ নিয়েছিলাম,—ওদের ও-দিকে যাবো ব'লেই, আবার রাত হ'লে যাওয়া ঘটে উঠ্‌বে না। উজ্জ্বল এসে ব'লে গেছে চৈতীর বেজায় অসুখ। ছেলেটার রিকেট্‌স তাই চ'লেছিলাম। গলিটায় ঢুকতেই বাজ উঠ্‌লো হানা দিয়ে মেঘের মুখ গেল খুলে,—পশ্চিম দিকে ছুটে এলো লক্ষ সাপের সরু ফণা।

ঘরে ঢুকে যা দেখলাম,—তা আর না শুনলে। একটু শোন মাত্র উজ্জ্বল বুক দিয়ে আগলে আছে বাচ্চাকে। চৈতী ও-কাণে ব'সে ভিজে কাপড় প'ড়ে কাঁপছে। ওদের উলঙ্গ মূর্ত্তি—সামান্য মাত্র আবরণ। চোখে দেখলাম ধাঁধা। ঠিক বাড়িতে এসেছি তো? সমস্ত ঘরই ভেজা। চাল চুয়ে জল প'ড়ে ভাসিয়ে দিয়ে যাচ্ছে—মজা দেখে বিজলী হাসছে। নির্লজ্জ বেহায়া! ব'সতে আমায় ওরা বলেনি। নিদারুণ লজ্জা দিলাম তাদের আমি। ইচ্ছে হচ্ছিলো যাই ফিরে। চৈতী মাথা গুঁজে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিলো। ভাবলাম গায়ের চাদরটা ওকে উপহার দিয়ে এখান থেকে ছুটে চ'লে যাই। কেও কোনো কথাই ব'লছে না আমাকে। খোকাটা কাঁপছে তখনও শীতে—উজ্জ্বলের বাইরে যাবার কাপড়টা দিয়ে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকেছে ওর। পৃথিবী প্রলয়ে ডুবুক তবু যেন খোকা তাদের ফাঁকি না দ্যায়। উজ্জ্বল কোনো-রকমে তার ছেলেকে বাঁচাচ্ছে প্লাবন থেকে

চৈতী নিজেকে বাঁচাচ্ছে সরম থেকে। দু-জনেই চায় যদিও তাদের বুকের ধন থাকুক বুকে।

চৈতীর অসুখ। কিন্তু সেই অসুখের হ'চ্ছে এই চিকিৎসা। মুখ বিবর্ণ—ফুল গিয়েছে শুকিয়ে কিন্তু সেটা কি ফুল তা তখনো বোঝা যাচ্ছিলো। আমার গায়ের চাদরটা ভেজা হ'লেও চৈতীর পাশে ব'সেই তাই দিয়েই তাকে আচ্ছাদিত ক'রে নিলাম। গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম জ্বর তখনো লাগা। বললো,—খোকাটাকে ছাখ তো ভাই হাত-পা সরু হ'য়ে গেছে, কোমরে পায় না বল্, জ্বরে চোখ মুখ ফন-ফন করে, বাঁচানো যাবে তো ? চৈতী ধুকে গেল। বাতার দেয়ালে মাথা রেখে হাঁফাচ্ছে।

বৃষ্টির দৌড়ে টান প'ড়লো। মেঘ তখনো গোঙড়াচ্ছে—গোঁয়ার স্বভাব তাই। এততেও ওর ক্রোধ কমেনি বোধ'য়। আকাশে নীলে ছোপ প'ড়ছে। গাছপাতার রঙ ব'দলে হ'য়ে আসছে গাঢ় উজ্জ্বল সবুজ ! বাতাবি লেবুর গাছে কাক ব'সলো, ডাকলো। চৈতী মাথা কাৎ ক'রেই ধীরে ধীরে ব'ললো : রাম রাম বলো। কাগের ডাকো বেড়েছে বড্ড, কি যে আছে কপালে ! দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো তারপর। ওর চোখের সুমুখে আসচে অচেনা কুজ্ঝটিকা, অনামা দুর্ঘটনার ছায়া।

খোকা ককিয়ে কেঁদে উঠলো, ক্ষিদে পেয়েছে। উজ্জ্বল দৈন্য ঢেকে ব'ললো : এতো জ্বরের ওপর কিছুতো খেতে নেই, বাবা। মাথা ঝুঁকিয়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে সোহাগ ক'রলো। খোকা চাইলো করুণ নয়নে উজ্জ্বলের মুখের দিকে—সে চাউনি ক্ষুধার্ত্তের, সে চাউনি অতটুকু ছেলে চাইতে পারে না। উজ্জ্বল মুখ ফিরিয়ে কাঁদছিলো।

এক কৌটা গোরুর দুধ জোটাবার শক্তি যার নেই তা'র সন্তান হওয়া কেন, কেন বিয়ে করা—উজ্জ্বল হয়তো তাই ভাবছিলো। ও-দিকে সানাই বাজলো, কি করুণ সুর! ওঃ, আজ বুঝি ও-বাড়ীর বিয়ে তাই বুঝি বৃষ্টি হ'লো। অতদূর থেকেও এ সুর আসচে এতদূরে? জলোদিনে শব্দ ছোটে বেশি শুনিছি, তাই হ'য়তো।

চৈতী সানাইয়ের সুর শুনলো, উজ্জ্বল শুনলো—করুণ সুর, তাদের ভালো লাগলো নিশ্চয়ি।

সুশীল শুনছে সব, কোন কথার জবাব দিচ্ছেনা।

—ঘুমোও নি তো? শুনছো? পঞ্চমী ব'লে চলে: কিছু কিনে এনে দেবার ইচ্ছে ছিলো। দিতে মন উঠ্ছিলো না! যদি তাতে এদের অপমান করা হয়! সঙ্গে চাকর এসেছিলো রোয়াকে বসিয়ে রেখেছিলাম। তা'কে ডেকে, আনতে দিলাম গোপনে কিছু ফল-মূল আর প-টেক দুধ। উজ্জ্বলের চোখ থাকে সব দিকে: ওকে পাঠালেন কোথায়? এতে আমরা কতটা বিব্রত হই বোঝেন তো! মিছিমিছি এমন ক'রলে তো আপনাকে আর ডেকে আনাই চ'লবে না।

খোকাকে দুধ খাওয়ালেম! চৈতীকে দিলাম ফল, উজ্জ্বল কিছুতেই খেলো না, ব'ললো এই মাত্র ভাত খেলাম সত্যি ওই দেখুন হাঁড়ি! নিজে থেকেই যখন বিশ্বাস করিয়ে দিতে চাইলো তখনই বুঝলাম এ বিশ্বাস্য নয়!

অন্ধকার ঘনাচ্ছে। একপাল বক দলবেঁধে উড়ে গেল আকাশে এপার থেকে, ওই কিনারে বোধ'য় ওদের ঘর।

সেদিন ফিরলাম। সমস্তটা পথ আমার কাট্লো অশান্তিতে,

দুর্ভাবনায় ! চৈতী এত ভুগছে আর বোধ'য় বাঁচবে না, খোকাটার যা অবস্থা দেখলাম, বাঁচবার মতো নয়, এত স'য়ে উজ্জ্বলই বা কি ক'রে বসে ! একটা সংসার চির-বিদায় নেবে এ পৃথিবী থেকে। রাত্তিরে ওরা সব খাবে কি ? ক-দিন খায় নি ? উজ্জ্বল পথে-পথে ঘোরে, দিনে চার আনা রোজগার ক'রতে পারে না ?

হাত উপুড় ক'রে আমি করবো দান, আর হাত পেতে ওরা ক'রবে গ্রহণ ! কি ভয়ানক সমস্যা। কিন্তু এর যে কোনোটাই ঠিক না, সত্যি না, সব কল্পনা। এ-হচ্ছে দুনিয়াকে শিশুর মতো ছাখা, তা'র কপালে চাঁদের টিপ্, কালো চুলের সঙ্গে ঝোলানো একশো পুঁটে। এ হ'চ্ছে যৌবনে শিশু-ভালোবাসা।

পৃথিবী ঘুরছে সূর্য্যের চারপাশে ! আর কতদিন এদের ও বইবে এতটা পথ এমনি ভাবে ? শূন্যের মহাসমুদ্রে মধ্যপথে বিসর্জ্জন দিক্ ! সবাই বাঁচবে ! যে মহাসাগরে নাই দুঃখ, নাই খেদ ; মর্ম্মবেদনা, অশান্তি, পিপাসা কিছুই নাই যেখানে !

বাসার পথ আমার আর ফুরোয় না ! পিছনে আমায় কে যেন টেনে ধরে, যাকে আমি চিনি কিন্তু যে আমার চির-অপরিচিত ! যাকে আমি ভালোবাসি কিন্তু যার কথা ভালো লাগে না ! চৈতী, তুমি ভেজা মেঝেয় খোকাকে নিয়ে শুয়ে থাকো ; উজ্জ্বল, তুমি ওদের পাহারা দাও। দোরে খিল দিয়ে রেখো কেও অজান্তে এসে খাজনা না চায়। তাগাদা দিক্ ! বলো,—পরে শুধ্বো ! এমনি সব কথা মনে মনে আওড়াতে আওড়াতে বাড়ি ফিরি।

বাসার দুয়ারে এসে দাঁড়ালেম। যদি আমায় এরা ছুটি দিতো আমি

চৈতীর সঙ্গী হ'তাম। তার সঙ্গে থাকতাম। ওর দুঃখ ভাগ ক'রে নিতাম।

তবু ঘরে ঢুকলাম। এত বড়ো কেলেঙ্কারী নাকি কেও করে না— শাশুড়ির মন্তব্য শুনলাম। কানে আমি মোম ঢেলেছি, কারো কোনো কথা শুনবো না। তাই নির্ব্বাক রইলাম!

প্রায়ই যেতাম, আমার যতদূর করবার ক'রতাম। সাহায্য যা না ক'রে পারতাম না, যেটুকু ছিল আমার সাধ্যে জোর ক'রেই ক'রেছি! অসুখে ভুগেভুগে হাড় জির-জিরে চেহারা ক'রে ফেলেছে। ওর দু-চোখে মহামৃত্যুভয়! তাই দেখে আমার ভয়ে সর্ব্বশরীর উঠ্‌তো কেঁপে! খোকাকে নিয়ে এসে কোলে দিতাম, বলতাম, এই তো তোর কোলেই আছে। ভালোবাস্‌ কল্যাণ কামনা কর্‌, ভাই! আমার চোখে আসতো জল! কোনো-রকমে বুকে কথা বলবার শক্তি সঞ্চয় ক'রে জবাব দিতো: তুই ভালোবাসিস্‌, আমার আর ক'দিন! তোর কাছে স'পে দিলাম; দেখিস্‌, জীবনে যেন আর দুঃখ ও না পায়। ওঁর কথা আর কি বা ব'লবো! চৈতী আর কথা ব'লতো না।

উজ্জ্বল ডাক্তার এনে হাজির, সে চৈতীকে বাঁচাবেই। কোত্থেকে, কি ক'রে এত বড়ো দুঃসাহসের মধ্যে ঝাঁপ দিয়েছে ওই জানে। ডাক্তারকে ধ'রে ব'সলো: কেমন দেখলেন, বাঁচাতেই হবে কিন্তু। চৈতী তখন কাঁদছিলো! আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিলাম। ডাক্তারবাবু আশ্বাস বাণী দিয়ে গেলেন: ভাববেন না। তা না হ'লে তাদের কেই বা ডাকে। ও-টা ওঁদের কর্ত্তব্য। কিছুক্ষণ পরে লাল ওষুধ নিয়ে এলো এক শিশি, আর দুটো পুরিয়া কাগজে করা। বললো: খাও, ঠিক

সেরে উঠ্‌বে। উজ্জ্বল পাগলের মতো টৈ-টৈ ঘুরছে। তা'র আয়ের পন্থা ঠিকই গুছিয়ে নিয়েছে! চৈতী উজ্জ্বলকে ডাকে হাত তুলে ইসারায়ঃ অত ঘোরা কেন? ডাক্তারের, দরকার কি ছিলো? খোকাকে দেখিয়েছ? ব'সোনা এখানে, রাতদিন বাইরে! উজ্জ্বল ব'সলো। মুখের ওপরের চুল গুলো সরিয়ে তুলে দিলে মাথার ওপরে। কেমন মনে হ'চ্ছে? ভালো লাগছে এখন? ঠিক সেরে উঠ্‌বে, কেমন? চৈতীর চোখের জল মোছালো! উজ্জ্বল প্রথম দিন তাকে যতটা ভালোবেসেছে তার থেকে আজ এক কোণা ভালোবাসা বিয়োগ হয় নি। কোথেকে টাকা পেলে? ওষুধের দাম কত? ভিজিট ক'টাকা! চৈতী জানতে চায়। উজ্জ্বল বাধা দিয়ে থামাতে চেষ্টা করেঃ টাকা আসেই, ও-সব কথা কেন? খোকার ওষুধও এনেছি। ও-তো আজ কাল ভালোই আছে। সব সেরে উঠ্‌বে। দেখো, আমাদের সুখের সংসার হবে, এ শুধু অগ্নি-পরীক্ষা, পাশ হ'য়ে গেলাম আর কি! উজ্জ্বল হাসে জোর ক'রে! চৈতী অসাড় হ'য়ে প'ড়ে থাকে। আর কথা কইবার মতো শক্তি তার নেই! খোকাকে বুকের মধ্যে টানে যতটুকু তার জোর আছে সব দিয়ে।

সারাদিন ওদের ওখানেই কাটাতেম। চৈতীর প্রাণ নিয়ে টানা-হ্যাঁচড়া চ'লতো যথেষ্ট। প্রায় দিন কুড়ি কাট্‌লো।

এত বড়ো আকাঙ্খা কখনই বিফলে যেতে পারে না! উজ্জ্বল তাকে বাঁচিয়ে তুললো বুঝি। চৈতী আজ-কাল কথা বলে স্পষ্ট। খোকাকে আদর করে, উজ্জ্বলকে পাশে বসিয়ে কাঁধে হাত দিয়ে থাকে! মাথার কাছে গোটা দশেক শিশি, বলেঃ এত ওসুধ আমি খেয়েছি। কত

টাকার ঘাটী বলো তো? উজ্জ্বল বাধা দেয়ঃ শুধু তুমি নাকি? খোকাও যে খেয়েছে। দু'জনে মিলে কী আর এমন খেলে! ওটুকু ওষুধ সর্দ্দি কাশীতেই খায়, এ-তো কতো বড়ো ব্যারাম। ডাক্তারকে ভিজিট্ দিতে হয় নি। শুধু ওষুধের দামটা তাও কমিয়েই চার্জ করেছেন। তোমার অসুখে খরচ করিনি কিছুই; ক'রবো কোত্থেকে। উজ্জ্বল স্বাভাবিক স্বরেই বলে! চৈতী শুধু ফেলে দীর্ঘ নিশ্বাস, যা তার সম্বল!

চৈতীর রোগ তখন মীইয়ে আসচে! খোকার শরীরটাও আগের মতো অতটা খারাপ নয়। উজ্জ্বল ভাবলো,—যাক্, এবার বুঝি বাঁচা গেল! অবশেষে চৈতী সত্যিই সেরে উঠ্লো। খোকার চেহারাটা রোগা-পট্‌কা। কিন্তু রোগটা ক'মেছে। আগাছার মতো বাড়ছে ঘরের মাটিতে!

উজ্জ্বল খাটে ঘুরে ঘুরে—টাকা রোজগারের চেষ্টায়। এত খাটলে টাকার আণ্ডিল আসে কিন্তু উজ্জ্বলের ভাগ্য তেমন না! কোনো-রকমে দিনের সংস্থানটুকু সে কুড়িয়ে আনতো! কোমর ধ'রে গেল এবার শুই, তুমিও শোও।

সুশীল আর পঞ্চমী আবার শুলো। সুশীল এ-কথা ব'সে ব'সে শুনতেও চায় না। পঞ্চমী যেমন ব'লতে আরম্ভ ক'রেছে! সুশীলের কণ্ঠনালী রুদ্ধ, ও কথা কইবেই না আর, শুধু ধোঁয়া যাবার পথটুকু বোধ'য় আছে গলার মধ্যে তাই আর একটা চুরুট ধরিয়ে নিলো—তাও নির্ব্বাকে।

—কোনোদিন ছিল না খাটবার অভ্যেস্। অত বাড়াবাড়ি সইলো না। উজ্জ্বলের ভুগবার পালা এলো। প্রথম দিন কতক বুকে তেল্

মালিস ক'রলো, ব'সে ব'সে কাশলো। তারপর ধীরে-ধীরে শুলো!—এলো কাঁপুনী, তারপর জ্বর তারপর সব একসঙ্গে। আবার এক এলাহি কাণ্ডকারখানা। চৈতী দুর্ব্বল শরীর নিয়েই যেটুকু করবার ক'রেছে। দিন দিন শরীরে শৈথিল্য আসচে। খোকা দেয়াল ধ'রে দাঁড়ায় চাঁদ ধ'রবে, পায়ে নেই বল, প'ড়ে যায়। উজ্জ্বল উঠ্‌তে চেষ্টা করে, চৈতী উঠে গিয়ে তুলে আনে! উজ্জ্বল শুয়ে শুয়েই খোকাকে আদর করে, শুধু হাত বুলোয় পায়ে।—ডাক্তার দেখাবার কি করি বলো তো? চৈতী জিগ্‌গেস করে।—ডাক্তার লাগবে কিসে? সেরে উঠ্‌ছি দুদিন সবুর করো! চৈতী আবার শুধোয়ঃ টাকা তো লাগে না, সেদিন ব'ললে যে! উত্তর ছায়ঃ ওষুধের দাম! আর কিছু ব'লতে চায় না! চৈতী বিপদের মধ্যে সাঁতরে বেড়ায়, ডাঙা পায় না। ম্লানমুখে ব'সে ভাবে কত কী যে তা চৈতীই গুছিয়ে ব'লতে পারে নি।

একদিন সন্ধ্যার সময় নাকি উজ্জ্বল আবোল তাবোল ব'কছিলো, চৈতীর মন উঠ্‌লো চঞ্চল হ'য়ে, বাড়ী থেকে বেরিয়ে প'ড়লো। বিছানার চাদর খানা টেনে তা দিয়ে গা ঢেকে। অন্ধকার ঘুপচি গলি, সেই যে ঢুকেছিলো আর এমন ছাখেনি, বাইরে আসেও নি তাই, ভয় করছিলো ডিঙোতো, তার ওপর এখানকার রাস্তা সবই ওর কাছে চীনা প্রাচীর—অচেনা। তবু চ'ললো, রাস্তায় হ'লো বেজায় ভাবনা একা ফেলে চ'লে এলাম! থামেনি, এগিয়েছে যতদূর পারে, চৈতী চ'লেছিলো। ডাক্তারখানা এ চুলোর দুয়োরে কি একটাও নেই? ও লাল আলোটা কিসের? অন্ধকারে ছুটে গেল—নিশ্চয় ডিস্‌পেন্সারী। এবার আর ভাবতে হবে না। এগিয়ে এলো, দেখলো মোটর দাঁড়িয়ে

তারি পেছনের লাল আলো ওটা। ড্রাইভারকে শুধোলো : এখানে ডাক্তারখানা কোথায় ব'লতে পারেন ? উত্তর দিলো : আপনি ভুল ক'রেছেন। ডাক্তারখানা এ-দিকে তো একটাও নেই, অনেকদূর! পাগলের মতো উত্তর দিলো : তবে কি হবে বলুন না, আমার স্বামীর যে ভয়ানক অসুখ!—আপনাকে দিয়ে আসচি উঠুন গাড়িতে, ড্রাইভার ব'ললো। চৈতী বলে,—সে সেদিন একটুও দ্বিধা করে নি। গাড়িতে উঠে ব'সলো আর ভাবতে লাগলো কোথায় চলিছি! যাক্ গাড়ি ঠিকই এলো দেখছি। ঐ তো ডাক্তারখানা, চৈতীর আর ভুল হ'লো না। গাড়ি থেকে নেমে প'ড়লো। লজ্জাহীনার মতো নির্ব্বিকারে ঘরে ঢুকে প'ড়ে বললো : আপনি একটু চলুন না, আমার স্বামীর ভয়ানক অসুখ, বড় গরিব আমরা কিছু দিতে পারবো না। আসুন না, একটু তাড়াতাড়ি করুন, একা ফেলে এসেছি। চৈতীর মন করছিলো ছট্‌ফট্, ডাক্তারবাবু উঠে প'ড়লেন, চৈতীর মুখের দিকে চাইলেন—এ-যে চেনা, ডাক্তারবাবু একে চেনেন! শুধোলেন : আপনার না অসুখ ক'রে-ছিলো ? অসুস্থ শরীর নিয়ে অ্যাদ্দূর এলেন কি ক'রে ? চৈতী এ সব কথার উত্তর দ্যায় নি, বলেছিলো : তাড়াতাড়ি আসুন না!

আড়গাড়া থেকে গাড়ি ভাড়া ক'রে ডাক্তারবাবু চৈতীকে তুলে নিয়ে রওনা হ'লেন।

দরজার কড়া নাড়লো। সুশীল ডাকলো,—প্রিয়, দ্যাখোতো কে। চিঠি বোধ'য়। প্রিয় ব'ললো ফিরে এসে,—বাবু মণিঅর্ডার।

সুশীল উঠে গেল রিসিভ্ ক'রতে। পঞ্চমী একা-একা শুয়ে ভাবছে — কদ্দূর বললাম ? গাড়ি চ'ড়ে তারা রওনা হ'লো।

সুশীল এলো হাসতে হাসতে : হকের ধন যায় কোথা? টাকা রাখলো দেয়ালে ঝোলানো জামার পকেটে।

পঞ্চমী জিগ্‌গেস ক'রলো : কি?

সুশীল উত্তর দিলো,—অন্যকথা, আজকের কথার মধ্যের কিছুই না।

সুশীল শুলো : তারপর? তারা উধাও?

—কি যে বলো ছাই! ভাগ্যি ডাক্তারবাবু বাসাটা চিনতেন নইলে চৈতী যে কী বিপদেই প'ড়তো! অত রাতে খুঁজেই পেতো না। ডাক্তারবাবু চৈতীর সঙ্গেই এলেন ঘরের মধ্যে। উজ্জ্বল তখন সংজ্ঞাহীন, তার পেটের ওপর মাথা দিয়ে খোকা দিব্যি ঘুমোচ্ছে। চৈতী দৌড়ে কাছে গিয়ে দু'জনের বুকের কাঁপুনী অনুভব ক'রলো হাত দিয়ে—বেঁচে আছে তো? ডাক্তারবাবু দেখলেন, ধীরে-ধীরে ডাকলেন : উজ্জ্বলবাবু উজ্জ্বলবাবু? কোনো সাড়াই পেলেন না। চৈতী জিগ্‌গেস ক'রলো,—ডাকলেন কেন? উত্তর পেলেন না কেন? ডাক্তারবাবু কোনো কথার জবাব দিলেন না, উঠে দাঁড়ালেন। ব'ললেন,—খোকাকে সরিয়ে শোওয়ান।—আরে, করেন কি, ওষুধ দিচ্ছি সেরে উঠ্‌বেন; ঘুমোলে কেও উত্তর দ্যায়? চৈতী চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠেছিলো, ধীরে-ধীরে থামতে চেষ্টা ক'রলো কিন্তু বুদ্বুদের মতো ফোঁপানী উঠছেই, তার বুকের পাঁকে ঢিল প'ড়েছে। ডাক্তারবাবু ব'সেই রইলেন। চৈতী ব'লেছে : আপনি যাবেন না, একা আমি তবে দম আট্‌কে ম'রে যাবো। তার দম আট্‌কে মরাই ছিল শ্রেয়ঃ। ডাক্তারবাবু তাই ব'সে রইলেন। ঘণ্টা খানেক পরে উজ্জ্বল চোখ চাইলো, আস্তে ব'ললো,—একটু জল! খোকা পাশ ফিরে শুলো। চৈতীর নিঃশ্বাস

এবার একটু পরিষ্কার হ'য়ে আসচে। ডাক্তারবাবু ব'ললেন,—এই ওষুধটা শোঁকাবেন। কাল সকালেই আসবো, ওষুধ পত্র নিয়ে। রাত্তিরে যেন একা একা যাবেন না আবার.........কি উজ্জ্বল বাবু, কেমন মনে হ'চ্ছে? বুকে বুঝি একটু ব্যথা না? উজ্জ্বল সাশ্চর্য্যে চেয়েছিলো তাঁর দিকে, ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিলোঃ হ্যাঁ ব্যথা আর একটু জল। চৈতী আবার জল দিলো।

ডাক্তারবাবু চ'লে গেলেন।

সারারাত চৈতীর কেমন কেটেছিলো তা সে আমায় ব'লে শেষ ক'রতে পারেনি। পশুদিন দুপুরেও তার সঙ্গে এই নিয়ে গল্প হ'চ্ছিলো আমার। সে শুধু কাঁদলো। সব কথা খুলে ব'লতেই পারলোনা। অশ্রুতে ওর গলা আসছিলো বুঁজে, ব'লবে কি ক'রে? ব'লছে,—চারিদিকে শুনতে পাচ্ছে শুধু কান্না। চীৎকার ক'য়ে গলা ফাটিয়ে কারা যেন কাঁদছে আবার থেমে যাচ্ছে, আবার উঠ্‌ছে ডুকরে কিন্তু কান পেতে ভালো ক'রে শুনতে গিয়ে বুঝতে পেরেছে,—সব ফাঁকি, ও-সব পিশাচের নৃত্য। একা দু-টী রুগী নিয়ে ফাঁকা বাড়িতে থাকা কী ভয়ানক ব্যাপার চৈতী ব'লতে গিয়ে শিউরে ওঠে এখনো। উজ্জ্বলের চাহনি এক একবার এমন ভয়ানক হ'য়ে উঠ্‌ছিলো চৈতীর ভয়ে সর্ব্বাঙ্গে দিচ্ছিলো কাঁটা, দু-হাতে চোখ চেপে দিচ্ছিলো তাই-বুজিয়ে। উজ্জ্বল গোঙাচ্ছিলো আর জানলার পাশে দাঁড়িয়ে কে যেন ভ্যাঙাচ্ছিলো।—সে স্বর চৈতীর কানে এখনো নাকি লেগে আছে। বাদামি লেবুর গাছে একপাল কি যেন এসে প'ড়লো শব্দ ক'রে। চৈতী উজ্জ্বলকে চেপে ধরে এক হাতে আরেক হাতে ধরে খোকাকে—কোনটাকে সামলাবে।

জানলায় খট্‌-খট্‌ শব্দ হ'লো, চৈতী চ'মকে উঠে শুধোলো : কে ? কিন্তু গলা দিয়ে তার স্বরই বেরোলো না। দরজা খুলে বাইরে চৈতী যেতে পারবে না। কেও যদি দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে পড়ে চৈতী একা ঠেকাবে কি ক'রে। রাত্তিরটা এতো বড়ো চৈতী এর আগে জান্‌তো না,—এর চাইতে তাড়াতাড়ি তো একটা বছর কেটে যায়। চোখ বুজলে দেখে হাবিজাবি, চেয়ে থাকলে ত্যাখে হিজিবিজি,—চৈতী মহা বিপদে প'ড়েছে। অনেকটা এই রকম মনের অবস্থা হ'য়েছিল কাল ট্রেণে আমার একা একা চুপ ক'রে ব'সে থাকতে, তবু তো অত লোকের মধ্যে, চলন্ত গাড়িতে। আর চৈতীর কী অবস্থা হ'য়েছিলো তা আমার মতো আর কেও বুঝবে না। সকালে যখন কাক ডাকলো চৈতীর মনে এতো আনন্দ হ'লো যে ও ভাবলো উজ্জ্বল বুঝি সেরে উঠ্‌লো। খোকা ডাক্‌লো,—মা। কেঁদে উঠ্‌লো। চৈতী এখন হাত-পা নাড়তে পারছে ভালো করে, তাকে কোলে তুলে মুখে মাই দিলো। উজ্জ্বলের মুখে আস্তে আস্তে একটু জল দিলো। ডাক্তার বাবু ব'লে গিয়েছেন,—জল দেবেন মাঝে-মাঝে।

চৈতীর মনে একটা আনন্দ এসেচে। ভাণ্ডারের দুয়োর ওর কাছে খুলে দিয়েছে, ওর ঝুলি উঠেছে পূর্ণ হ'য়ে। এইবার ডাক্তার বাবুর আসবার সময় হ'লো। তিনি এলেন ব'লে। চৈতী খোকাকে অজস্র চুমো খাচ্ছে, বুকে চেপে ধ'রছে। উজ্জ্বলের চুলের মধ্যে আঙ্গুল দিয়ে ঘুম পাড়াচ্চে তাকে।

ভোর বেলাই ডাক্তার বাবু এলেন ওষুধ-পত্র সব নিয়ে। চৈতী তাঁকে শ্রদ্ধা ক'রছে অতিরিক্ত মনে-মনেই। মাত্রা গুণে বুঝিয়ে-সুজিয়ে

ওষুধ দিয়ে চ'লে গেলেন আবার, উজ্জ্বলের সঙ্গে তাঁর কথা বার্ত্তা হ'লো না, উজ্জ্বল তখন অকাতরে ঘুমোচ্ছে। যাবার সময় বলে গেলেন: আপনি ডাকতে গিয়ে হাজির হবেন না যেন, আমি সময় মতোই আসবো। ভাববেন না, ঠিক সেরে উঠ্‌বেন।

এত যে হ'য়ে গিয়েছে আমি জানিই না।. সেদিন দুপুর-বেলা গেলাম চৈতীর ওখানে। অনেকদিন যাইনি। ঢুকে দেখি চৈতী উঠোনের ওদিকে ব'সে উনুনে কি যেন জ্বাল দিচ্ছে—ধোঁয়ায় বাড়িটা শাদা! বললো,—ভিজে কাঠ নিয়ে কি মুস্কিল বল্‌তো! যা ঘরে, ওঁর অসুখ। ভাবলাম,—কি হ'লো এদের, অসুখ যে থামেই না। ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। উজ্জ্বল চোখ বুজে অকাতরে ঘুমোচ্ছে, খোকা তা'র মাথার কাছে ব'সে আছে জরাজীর্ণ চেহারা নিয়ে, উজ্জ্বলের গালে-লাগা মিছরীর গুড়ো খুঁটে-খুঁটে খাচ্চে। এই মাত্র বোধ'য় চৈতী উজ্জ্বলের মুখে মিছরী দিয়ে কাজে গিয়েছে। খোকা কোনোদিকে চাইছে না,—একদৃষ্টে উজ্জ্বলের মুখের দিকে চেয়ে ব'সে। এ-দৃশ্য দেখে আমার সে দিনটাই কেটেছিলো ভয়ানক বিশ্রী। আজও দেখছি চোখে। চৈতী ঘরে এসে ঢুকলো,—হাতে বার্লির বাটি।—ও কিরে খোকা ছিঃ, চৈতী হাস্‌লো কিন্তু সেটা হাসিই না। খোকাকে সরিয়ে বসালো। ডাক্তার-বাবুই নাকি তা'দের সংসার চালাচ্ছেন, মানে ওষুধ-পথ্য সবি জোগাচ্ছেন। শুনে আমি মর্ম্মাহত হ'লেম, আমার যেটুকু সাধ্য তা নিতে চায় না কিন্তু একজন অপরিচিতের...। চৈতী বললো,—এখন যে আর উপায় নেই ভাই, যে যা দেবে হাত পেতে নিতে বাধ্য।

উজ্জ্বলের সঙ্গে আমার আর কোনো কথাই হ'লো না। সারাদিন

সে নাকি ঘুমিয়ে কাটায়। ডাক্তারবাবু এলেন, দেখলেন, শুনলেন সবি ক'রলেন। কিন্তু তার যা কর্ত্তব্য আজ সে-কথা না বলেই বেরিয়ে যাচ্ছিলেন; চৈতী ছুটে গিয়ে দাঁড়ালো, ওর লজ্জা-সরম কিচ্ছু নেই আজ: এত শিগগির চ'লে যাচ্ছেন যে? দেখলেন কেমন কিছু ব'ললেন না! ডাক্তার বাবু হেসে ফেললেন কিন্তু আমি লক্ষ্য করিছি সে হাসির ভেতর অশ্রু আছে: যাবো না? সারাদিন থাকতে বলেন নাকি? দেখলাম বেশ, আবার আসবো রাত্তিরেই। তিনি চ'লে গেলেন আমার সামনেই।

চৈতী ঘরে ব'সে ব'সে কত প্রলাপ ব'কলো সে-সব এখন তলিয়ে গিয়েছে। আমিও সে সব কথা গিয়েছি ভুলে।

পরদিন ভোঁদরকে পাঠালেম চুপ ক'রে খবরটা জেনে আসতে। কিন্তু ভোঁদর যে এই দুঃসংবাদ নিয়ে আসবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। যাক্ চৈতী আবার হ'লো বিধবা। ছুটলাম আবার। শ্মশানে মরা নিয়ে যায় নি তখনো। ডাক্তার বাবু গিয়েছেন লোক-জনের খোঁজে,— আমাকে দেখে আরো চীৎকার ক'রে উঠলো কেঁদে। আশেপাশের বাগদীরা দোর-গোড়া থেকে দেখছে রকমটা! তাকে সান্ত্বনা দিলাম আবার, এই ছিল চৈতীর কপালে! যাক্ ওকে নিয়ে গেল সবাই। চৈতীর বাবার কাছে দিলাম টেলি ক'রে সরকারকে দিয়ে, বাসায় ফিরেই।

চৈতী বলেছিল,—দিন ঘুরলে দেশে একবার ফিরে যাবেই, তার দিন ঘুরলো। তিনি এসে টাঙ্গাইলেই নিয়ে গেলেন চৈতীকে। উজ্জ্বলের বাড়িতে খবর পৌঁছালো। সেখানে শুরু হ'লো কান্নার। ব্যস্, সব শেষ।

এখনো চৈতী টাঙ্গাইলেই আছে—তার ছেলেও হ'য়েছে বড়ো কিন্তু কি দুর্দ্দশায় আছে দেখে এসো একবার চোখ দিয়ে। মামারা এসে আছেন এক সঙ্গে, রাতদিন ক'রছেন নির্য্যাতন। বাবা-মা মুখ বুজে সহ্য ক'রছেন চৈতীর সঙ্গে, যেন মহা অপরাধ ক'রে ফেলেছেন। ছেলেটা রাতদিন খায় পিটুনি। চৈতীর খাটুতে হয় বেজায় খাটুনি, আছে সুখে। ওর ছোটোমামা আর বড়োমামী দু'টী মাণিকজোড়, তাঁরা দু'টীই ওদের আত্মহত্যা করাবেন। ভদ্র সমাজে এমন লোক আছে জানতাম না। এমন বিয়ে ক'রে কি লাভ? বলো, উত্তর দিচ্ছো না যে? পঞ্চমী থামলো।

—কি শেষ হ'য়ে গেল? কি ব'লবো বলো! সুশীল জিগ্‌গেস্ করে।

—চৈতীর বিয়ে করার মধ্যে ভালোবাসা তো ছিল কিন্তু তবু দেখো দুর্দ্দশা!

—এতো গেল অন্যদিকে! প্রথম বিয়ে দিয়েও এমন হ'তে পারতো। তাদের সংসারটা ছিল সুখের কিন্তু অশান্তির। অস্বীকার ক'রবে? ও তুমি একদম বাজে উদাহরণ দিলে। সুশীল থামলো।

পঞ্চমী বলে,—সংসারের সুখ ছিল বই কি কিন্তু অশান্তি যে আরো বেশি!

—তা হোক্, সুখ তো ছিল, ব্যস্। অশান্তি দৈন্যের সঙ্গে আসবেই। কুঁড়েয় বাস ক'রে প্রাসাদের শান্তি পাওয়া কঠিন না? সুশীল বাধা দিলো।—প্রাসাদেই অশান্তি বেশি,—লোক বলে কিন্তু সে-সব মিথ্যা, দৈন্য দারিদ্র্য সেখানে উঁকি দিতে পারে না, এতো টুকু ফাঁক নেই যে, কিন্তু দারিদ্র্য মহানই করুক আর খৃষ্টের সম্মানই দানুক—

সে-সব কবি-কল্পনা, সব নিরেট মিথ্যা! দারিদ্র্যে শান্তি হয় নষ্ট কিন্তু সুখের ওপর তার দাবী-দাওয়া নেই, সেটা তার এলাকার বাইরে। তোমার চৈতী দুঃখ পেয়েছে তার স্বামী বেঁচে থাকতে জিগ্‌গেস ক'রো তো একবার। আমি শান্তি-র পক্ষের ওকালতি করি না   সুশীল থামলো!

পঞ্চমী আঁচল দুলিয়ে-দুলিয়ে প্রশ্ন করেঃ সুখ আর শান্তি আমি তো বলি এক, তোমার কথায় মানে বোঝা তো শক্ত, কি বলো তুমি এ-কে!

—বলি কি? সুখটা হচ্ছে মানসিক, শান্তি সাংসারিক; সুখ ভেতরটায় শান্তি বাইরে, এর কারবার বাইরের জগতে!

পঞ্চমী সুশীলের কথার সায় দিতে পারে না   কিছুক্ষণ থাকে চুপ ক'রে শুয়ে ছবি-ওলা ক্যালেণ্ডারটার দিকে চোখ রেখে! চাবির তোড়া বাজায় আর বলে,—তা হোক, কিন্তু ওর ছেলেটার দুর্গতি ..

সুশীল তাকে শেষ ক'রতে ছায় নাঃ

"Tis nature's plan

The child should grow into the man,"

সবই প্রাকৃতিক, প্রকৃতিই তা'কে তুলেছে বানিয়ে শিশু-রূপে, তা'কে দুঃখের-জলে জাইয়ে তাজা ক'রে তুলবেই; ওই সব ছেলেরাই হবে সংসারের অতিমানব, দেখে নিয়ো যদি বেঁচে থাকো, আর যদি আমিও বাঁচি ছাখাবো তোমাকে।

পঞ্চমী প্রত্যুত্তরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে।

—জগতের বড়ো হ'য়েছে যারা তাদের জীবনী ঘাঁটলে পাওয়া যায়, —তারা মানুষ হ'য়েছে নির্য্যাতনে, উৎপীড়নে! ধ্রুব যে দেবতা পেয়েছে

তাও কতো বাধা বিঘ্ন ভেদ ক'রে, যদিও ঘটনাটা মিথ্যা সেটা কেবল একটা উদাহরণ—ইসপস্ ফেব্‌ল্-এর মতো, আর তারাটা হ'চ্ছে বিশ্বাস করাবার একটা জ্বলন্ত পন্থা।

পঞ্চমী তবু কোনো কথা ব'লবে না ঠিক ক'রেছে। ওর ঘড়ায় নেই পদার্থ, নেই পানীয়, শুধু বুদ্বুদে ভরা ; দীর্ঘনিঃশ্বাসের হাওয়ায় বুদ্বুদ উঠ্‌ছে কেঁপে !

সুশীল গায়ে আস্তে ছায় একটা ঠেলা ঃ অঙ্গস্পর্শের অপরাধ মার্জ্জনীয়, অনধিকারের কাজ ক'রলাম, কিন্তু কথা কইছো না কেন ? সুশীল হাসে খিল-খিল ক'রে মেয়ে-মানষের মতো।

ভালো আবহাওয়ায় সবার গতর ফুলে কি ঢ্যাপসা হয়,—পঞ্চমীকে সুশীল হাসাতে পারে নি।

পঞ্চমী ভাবছিলো গত যুগের কথা—যেখানে ফুলের পাপড়িতে, সুগন্ধে পথ-হাঁটা হ'য়ে উঠ্‌তো দায়, যেথায় ছিল শুধু হাস্না, শুধু গোলাপ ; যে-সবের কথা এখন দাঁড়িয়েছে কেবল প্রলাপে আর বিলাপে। পঞ্চমী হঠাৎ এ কোন্-দেশে এসে প'ড়লো !

এ-দেশে ফুল ফোটেনা, ঘাসের রঙ কটাশে !

সুশীলও সেই যে হাসি ছেড়েছে, আর কথা বলেনি,—সে একদম প'ড়েছে তাল গাছের ডগা থেকে ধানী মূলে ! পঞ্চমীর বুক খানার দিকে চেয়ে আছে একদৃষ্টে, ভেতর-ভেতর ও যে ফোঁপাচ্ছে সুশীল বেশ বুঝ্‌ছে পারছিলো ; শত আবরণের মধ্যে দিয়েও সুশীলের চোখ ছিলো পঞ্চমীর হৃৎপিণ্ডের ওপরে ! তার বুকেও এলো স্পন্দন কিন্তু কারণ তার অন্য ! যাক্।

পঞ্চমী বুকের ওপর আর একপর্দ্দা কাপড় দিয়ে পাশ ফিরে শুলো। সুশীল কিন্তু এ চায়নি আদৌ : মুখ ফিরিয়ে শুয়ে থাকলেই বুঝি কর্ত্তব্য শেষ হবে দু-জনের! এবার পঞ্চমী মুখ খুয়লছে : তবে কি ক'রতে হবে শুনি! রাতদিন পচাল পাড়তেই হবে? জিভের জড়তা নেই?

কিন্তু পঞ্চমীর জিভে জড়তা নেই! কথাটা আমি অস্বীকার ক'রতে পারিনি। সুশীল ব'লে ওঠে : আছে নাকি? চৈতীর গল্পটা অত ক'রে না ব'লে একটু ছেঁটে ব'লতে পাত্তে তবে! তুমিতো কথার রাণী—

—আর তুমি হ'লে রাজা। কথাটা হঠাৎ ব'লে ফেলেই পঞ্চমী উবে যাচ্ছিলো, সুশীল এবার পুরুষের মতো উঠ্‌লো হো-হো ক'রে হেসে : অস্বীকার করোনা তুমিও? এইতো চাই তোমার কাছে।

লজ্জায় পঞ্চমীর মুখ রাঙ্গা হয়ে উঠ্‌লো।

আলতো ক'রে আঁচল তুলে সুশীল ব'লে,—ঘোরো! যেন মিনতির বাণী!

পঞ্চমী ঘুরেই শুলো।

হঠাৎ সুশীলের মন্দিরে ঢুকলো একটা ঘেয়ো কুকুর, শকুণ উড়ে প'ড়লো চূড়ায়। আর পঞ্চমী তার মন্দিরের দু'য়ারে তাকে রেখেছে রুখে, হাত তুলে তাড়িয়ে চূড়ো বাঁচিয়েছে।

যাক্ নিষ্পত্তি। পিশাচের কবল থেকে তারা নির্ব্বিবাদে নিজেদের খুব বাঁচিয়েছে। এ শক্তি দৈহিক বলের চেয়ে অনেক শক্ত। ওদের তা আছে বুঝলাম।

সুশীল ডাক্‌লো প্রিয়কে—চা চড়া। পঞ্চমী উঠে প'ড়লো—জল খাবো। কুঁজো নেই বুঝি? না থাক্ পিতলা ঠিলির জলই যথেষ্ট!

সুশীল যখন-তখন খায় চা। মর্জ্জির বলে করে চলা-ফেরা। প্রিয় বেচারাকে কিছুতেই ঘুমোতে দেবে না।

পঞ্চমী জলের শেষে ঢোঁক দিয়েই বললো: আর চা খায় না এই রোদে! বাব্বা যে গরম!

—থাক্ রে তবে চা, যা তুই ঘুমো। তোমার আদেশ অমান্য ক'রতে পারবো না কখনই। এসো, শোও।

—শুচ্ছি, দাঁড়াও। পঞ্চমী উড়ো চুল টেনে-টুনে খোঁপা গুছোয়। গুছিয়ে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো, কান পেতে কি যেন শুনলো: বাঃ, দিব্যি গায় তো, কা'রা ওরা? সুশীলকে শুধোয়।

—নিশ্চয়ি কেউ। চিনিনা। তুমি এসো। আর গান শোনে না! ওর চেয়ে ভালো তুমি নিজেই গাও।

—থাক্, আর ঠাট্টা ক'রতে হবে না! ঠোঁট ফুলিয়ে পঞ্চমী জবাব গ্যায়, হেসে ফ্যালে।

—সরো তো ওদিকে, ঠিক হ'য়ে শোও। দ'ংসে তো বালিশের তুলো বা'র করবার জোগাড় ক'রেছো। পঞ্চমী বিছানায় ব'সে প'ড়েই বলে।

পঞ্চমী শুলো। দু'জনেই জুটেছে মন্দ না—আলসে কুমড়!

ওরা দম নিয়ে নিচ্ছে—ধুঁকে প'ড়ছে কিনা এত গল্প ক'রে। সুশীলের নিস্তব্ধতা শুধু আলসেপনা।

—যাক, অনেক্ষণ চুপ ক'রে থকো পেল—মিনিট দুই-তো অন্ততঃ! এবার আবার আরম্ভ হোক। সুশীল হাসে।

—কি আরম্ভ হবে? ছাই পাঁশ তো অনেক হ'লো! বিজ্ঞের মতো কথা ব'লে তো কথার পুঁজি শেষ ক'রে ব'সে আছো! পঞ্চমীর মুখে আজ ফূর্ত্তির ফিন্‌কি, শুধু হাসি আর ঠাট্টা!

সুশীল বলেঃ কথার কি শেষ আছে?—শেষ আছে সমুদ্রের শেষ আছে আকাশের। আর তার ওপর তুমি, যে কথায় গোমুখী!

পঞ্চমী ঘাড় বাঁকিয়ে সুশীলের মুখখানা দেখে নেয়। বলে,—আর কথায় তুমি হ'চ্ছো কি সেটাও ব'লে দাও। যাক্, বাজে কথা রাখো। কি কথা হ'চ্ছিলো?

—তা তো শেষ হ'য়ে গেছে! তোমার চৈতীর ছেলে...

—এর চেয়ে আর বিয়ে না হওয়াই কি ভালো ছিল না?

—মোটেই না। সুশীল কথা প'ড়তেই গ্ধায় নাঃ কি ভালোটা ছিল তুমি নিজেই বলো! দু'দিন তো অন্ততঃ সুখে সংসার কাটালো। ভালোবেসে বিয়ে হ'চ্ছে অপার্থিব। কোর্টশিপ জিনিষটা রোমাঞ্চময়, সুন্দর, কল্যাণ! সুশীল থামে।

—ধান্দায় তবে ঘোরো! পঞ্চমী রেগে গেছে!

—আর ঘুরবো কেন? ঘুরে ঘুরেই তো বন্দরে নোঙর করিছি! পঞ্চমীর মুখ ছোট্টো হ'য়ে যায় সুকুমারীর মতো—চমৎকার! ঠোঁটটা কাঁপে পাপড়ির মতো! সুশীল চেয়ে গ্ধাখে শুধু! মনে-মনেই পঞ্চমীর মুখ-চুম্বন করে—সে চুম্বন গাঢ়, নিবিড়, উত্তপ্ত! পঞ্চমী হ'য়ে আসে বিবশ, সুশীল আবেশে সতন্দ্র।

একটা প্রজাপতি—রঙ-চ'ঙে তা'র পাখা—পঞ্চমীর মাথায় ব'সে প'ড়লো উড়ে এসে, আশীর্ব্বাদ ক'রছে হয়তো!

—মাথার ওটা উড়িয়ে দেবো, না থাকবে? সুশীল মিথি-গলায় বলে।

পঞ্চমী শুধোয়ঃ কোনটা?

—ভাখো হাত দিয়ে।

পঞ্চমী হাত দিতেই গেল উড়ে—আবার পাখ্না বুজিয়ে সুশীলেরি গায়ে গিয়ে ক'য়েক মুহূর্ত্ত জিরোলো। উড়ে গিয়ে তখুনি আবার ব'সলো দেয়ালে।

পঞ্চমী চেয়ে দেখলো দেয়ালের ওপর পাখনা বুজিয়ে বিশ্রাম করছে একটা রঙিন, উজ্জ্বল রঙিন বার্ত্তাবাহী। পঞ্চমীর আঙুলে খানিকটা কেয়ার রেণুর মতো কি যেন লেগেছে। অনুভব ক'রে ও আরাম পায়। তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো : চমৎকার।

সুশীল আরেকটু বাড়িয়ে ব'ললো, মারভেলাস্, সুপার—

মধ্যপথে থেমে গিয়ে সুশীল পঞ্চমীর মুখের পানে চাইলো, সে চাহনির কোন অর্থ নেই, সে চাহনীর ভাষাও অজানিত। তারপর খানিক্ষণ থেমে নিয়ে কি-ভাবে বলা কঠিন।

প্লট্ তার হয়তো জুটে গেছে, বললো,—প্রজাপতি দেখে আর সিচুয়েশ্যন দেখে একটা গল্প মনে প'ড়ে গেলো।

পঞ্চমী ব'ললো—বেশ, বলো। দুপুরটুকু সম্ভোগ করি ভালো ক'রে।

সুশীল ব'লছেঃ এই ধরো, হ্যাঁ, কি বলছিলেম—প্রজাপতি নিয়ে। এই মনে করো, আচ্ছা দাঁড়াও ভেবে নি! ব্যাপারটা হ'চ্ছে কি—এই, এই, এই, সাপোস্ সাগর নামে একটি ছেলে ছিলো, আর এই তট্—তটিনী

নামে একটি মেয়ে। ব্যাপারটা ক্লিয়ার? তবে শোনো, এ-হেন যে মেয়ে যার মুখের ডৌল অতি খাসা, তোমার থেকে যে কোনো অংশে কম যায় না; তার সঙ্গে সাগরের ভাব আঁট-সাঁট,—ঠিক তটিনীর যৌবনের মতো। হঠাৎ হ'লো কি তপেশ নামে আর একটি ছেলে—যার সঙ্গে তটিনীর ভাব নেই, আলাপ নেই, যাকে সাগরদের দল বলে স্নব, ইডিয়ট্—উড়ে এসে জুড়ে ব'সলো, তটিনীকে ছোঁ মেরে নিয়ে চ'লে গেলো। সাগর আকাশের পানে চেয়ে লোক-চক্ষে বোকা ব'নলো। সে-ও এই প্রজাপতির আধিপত্য। সাগর থাকে সাগর পাড়ায় (এবার সুশীলের প্লট্ জ'মে এসেচে) লোকে বলে রত্ন, বন্ধুরা বলে মাণিক, রত্নাকরের সেরা। সোজা উঠে গিয়ে এমব্যাঙ্কমেণ্টে ওঠে, ফুর-ফুরে পদ্মার হাওয়ায় উড়ে উড়ে চ'লে আসে ইঞ্চির ঘাটে। পঞ্চমি, পদ্মা দেখেছ? জ্যোৎস্নার পদ্মা? অমাবস্যার পদ্মা? মনে হয়, কি মনে হয় জানো?—সেইখানে হই সমাধিস্থ। সাগর দাঁড়িয়ে ওপারের অস্পষ্ট কয়েকটি প্রাণীকে নিরীক্ষণ করবার চেষ্টা করে। উঃ, কী বাতাস! প্রাণ ভরে জীবন পান, প্রাণ ভরে জীবন উপলব্ধি, তুমি হয়তো ভাববে পঞ্চমি, করা যায় না, কিন্তু যাও পদ্মাতীরে, দাঁড়াও গিয়ে সেই ইঞ্চির ঘাটে, তাকাও গিয়ে প্রকাণ্ড শ্যামল আকাশের পানে, সেই সময় ভেবে ছাখো গিয়ে জীবনকে, বুঝবে জীবনটা সত্যিই জীবন—তার মধ্যে মেকি নেই, ঝুটা একদম বাদ। মোটর লঞ্চের ফুর্ত্তিতে ছর-ছর করে জল কেটে নদীর বুকখানা ছেঁড়বার কী অসীম প্রচেষ্টা। ওপারে শ্যামল বনানী, তাদের মাথায় মাথায় কালো মেঘ, তাদের পদতলে কালো ছায়া ভেসে-যাওয়া, পঞ্চমি তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে

না, তাদের ছেড়ে এসে আমি নিজকে কাঙালের চেয়েও নগণ্য জ্ঞান করি। সেই আমার দেশ, সেই আমার জন্মভূমি, সেই আমার মাতা-পিতার শ্মশান, সেই আমার জীবন। আজ আমি প্রবাসী, পেটের চিন্তায়, অর্থের চিন্তায়, বেঁচে থাকবার কঠিন সংগ্রামে! তুমি চাকরি চাও, কি হবে ছাই চাকরি দিয়ে?—

পঞ্চমী বুঝলো—সুশীলের মনে বিচ্ছেদের, বিরহের সুর কঠিন সুরে ঝঙ্কার দিয়ে উঠেছে। সুশীলকে দিয়ে গল্প বলানো চলবে না।

সুশীল আত্মস্থ হলো, বললো—হ্যাঁ, শোনো—গল্প শোনো। সাগর ইঞ্চির ঘাটে এসে দাঁড়াতো। এ পাশে মাঠ বিরাট, ধরণীর সমস্ত বুকখানা যেন সেইখানে আদুল করা,—তারি অসীম নিঃসীমতার পানে সাগর চায়। তার মনের খেই যেন হারিয়ে গেছে—কাকে যেন সে চায়, কাকে যেন চায় ব'লে পায় না, কোমল স্পর্শ দিয়ে কে-যেন ভেসে চলে যায়, আসি-আসি করেও কে যেন আসে না। মাঠে বল্ পড়েছে—ছেলেদের খেলবার মাঠ, গাছের মাথার ওপর দিয়ে ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি উঁকি দিচ্ছে, আরো দূরে কলেজের গম্বুজ আভিজাত্যে স্ফীত, উন্নত। সাগর গিয়ে মাঠে নামলো। আজ তার খেলবার ইচ্ছে নেই তত। ছেলেরা খেলে।

যখন সন্ধ্যে তার নীলাঞ্চল ধরণীর বুকে প্রায় লুটিয়ে দিয়েছে, সাগর উঠ্লো। ও তটিনীদের ওখানে একবার যাবে।

গাছ শুধু গাছ। গাছের প্রাচীর—অশ্বত্থ, পাইকর, কৃষ্ণচূড়া! রাস্তার দু-পাশে। তাদেরই পদতল স্পর্শ করে একটা লাল শুর্কির

রাস্তা সোজা ছুটে গেছে, ডানে বাজার ফেলে—বাঁয়ে রেখে মস্ত দীঘির টলটলে কাজল জলে আকাশের প্রকাণ্ড ছায়া।

পঞ্চমী একটা নিশ্বাস ফেললো।

সুশীল সামান্য আড়চোখে তার পানে চেয়ে ব'লে যায়ঃ সাগর সেই দীঘির পাড়ের একটা বাসায় যাবে। ক্রমেই তার গমক নিস্তেজ হ'য়ে আসচে, কিন্তু না, তাতে কী হ'য়েছে? তটিনী সেজন্য নিশ্চয়ি অপরাধ নেয় নি তার। তথাপি সাগরের মনে পড়ে তার চোখের কী আগুন! ভস্ম হ'য়ে যায়নি কলিকাল ব'লে, নইলে—

দরজার কড়া নাড়লো—বিশ্বাস! বিশ্বাস! খোলো হ্যাঁ আমি। চাকরকে জিজ্ঞেস্ করলো, দিদি আছেন?

আছেন জেনে নিতান্ত অপরাধীর মতো, কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামীর মতো মুখ ক'রে চোরের মতো অন্দরে যাত্রা করলো। সমুখে পিসিমাকে অর্থাৎ তটিনীর মাকে পেয়ে ব'ললো—কি পিসিমা, স'লতে পাকাচ্ছো, পাকাও। তটিনী কই?

খু ব চাপা, ব হু দূর থেকে ভেসে-আসা একটা ভাটিয়ালী সুর তারি সনে সিতারের কোমল ঝঞ্চনা, সুগোপন প্রেমগুঞ্জনের মতো সাগরের কানে এলো। ভেজানো দুয়ারে হাত রেখে সাগর দাঁড়ালো, এই ধরো দু'সেকেণ্ড। তারপর কোনো-রূপ শব্দ না ক'রে, স্বপ্নিত-আকাঙ্ক্ষায় এই ছন্দকে আহত না ক'রে সে ঘরে ঢুকলো। তটিনীর হাত কেঁপে উঠ্‌লো, সুর হ'লো সমাধিস্থ, আকাশের আনাচে-কানাচে অবলুপ্ত, তারায়-তারায় দিশে হারা! তটিনী ঝাঁপিয়ে এসে সাগরের গায়ের উপর

প'লো : সেদিন খুব চ'টে চ'লে গেলে! সত্যি, কী যে মানুষ তুমি! সাধারণের একটু বাইরে। কিছুই বোঝো না!

—হুঁ। বিস্ময়ে পাথর হয়ে সাগর দাঁড়িয়ে রইলো।

তটিনী চেয়ারের ওপর থেকে বিকেলের-ছাড়া ব্লাউজটা তুলে নিয়ে বললো—বসো।

ব'সলো। তারপর কি হবে বলো তো পঞ্চমি, আচ্ছা না ব'ললে, ধরো খানিকক্ষণ ব'সে রইলো, মনে করো সাগর একা ব'সে রইলো, তটিনী ঘরে নেই। সাগর চ'লে যাবে মনে মনে ভাবছে, ঘরে একটা কেরোসিনের আলো মিটির মিটির ক'রে জ্বলছিলো, সেটাকে বাড়িয়ে দিলো। হাতের কাছে কাজ নেই। তটিনীর পুঁথি-পত্তর নিয়ে নাড়াচাড়া করে। আর ধরো, তটিনী এসে প'লো। তটিনীর মুখে হাসির লুকোচুরি, রাঙা ঠোঁটের নিচে অসীম রহস্য, বললো—একটা মজার কথা আছে, অ্যাদ্দিন বলিনি, চেপে ছিলাম। কিন্তু না, তোমাকে ব'লবো।

সাগর ব'সে ব'সে মাথা খানিকটা তুলে তটিনীর চোখের পানে চায়, আ—চমৎকার! কই না, সে-আগুন তো নেই, সাগর আশ্বস্ত হ'লো, ব'ললো—কি ব্যাপার কি? বলো।

—আমাদের স্কুলে থিয়েটার তাই হি হি হি—আমাকে হি হি পার্ট দিয়েছে হিঃ। সাগরের বেজায় হাসি পেলো, বললো,—তা হ'য়েছে কি? কিসের পার্ট?

—বলো তো কিসের? বেশ বলো, কেমন পার্ট আমাকে মানায়। সাগর বলে, এক মানায় তারকা রাক্ষুসী, তা নইলে এই ধরো, মনে করো—আচ্ছা কি বই প্লে হবে?

তটিনী বলে—ধ্রুব। আমাকে দিয়েছে সুরুচির পার্ট। ক্লাস টেন-এর আশাদি উত্তানপাদ, টুনটুনি হবে ধ্রুব, গ্র্যাণ্ড।

সাগর বলে—সুরুচি? কে দিলো? তার রুচি আছে বটে। ঠিক হবে। আচ্ছা, রিহির্শাল দাও তো, দেখি!

তটিনী রাজি, এক কথায় রাজি। সেদিন সে সাগরের সামান্য একটু খেয়াল সহ্য করতে না পেরে তাকে অপদস্ত ক'রেছে। আজ তাই হয়তো, কি পঞ্চমি, ঘুমিয়ো না, শোনো। আজ তাই হয়তো তাকে সেটুকু ভুলে যাবার জন্যে ইঙ্গিৎ পাঠাচ্ছে।

তটিনী বিছানা থেকে একটা বালিশ নিয়ে এলো। সাগরের কোলের ওপর সেটাকে চেপে দিয়ে ব'ললো—ধরো, এইটে ধ্রুব, তুমি আশাদি আর আমি তো সুরুচি আছিই। ব'লে হাসতে হাসতে কোমড়ে জোর দিয়ে কাপড়টা বেঁধে নিলো, দরজার ওপারে চ'লে গেলো।

সাগর শুনছে তটিনীর কাপড়ের খসখসানি আওয়াজ। কিছুক্ষণ পর তটিনী ছুটে এলো, উগ্রচণ্ডা মূর্ত্তি তার, চোখ দু'টো এতো বড়োঃ

এ কী আজি হেরি মহারাজ?
অঙ্ক তব ধ্রুবর আসন?

সাগর বললো—কখনই না। ব'লে গম্ভীর হ'য়ে ব'সে রইলো। তারপর সে প্রায় হেসে ফেলেছিলো আর কি, কিন্তু চেপে গেছে, আর তটিনীর লুটিয়ে লুটিয়ে সে কী হাসি।

সাগর ব'ললো, হবে। অতি গ্র্যাণ্ড! সুপার ফাইন্! নেবে যাও। তটিনী ব'ললো—রাত্তির হ'য়েছে, এবার বাসায় যাবে বোধ'য়? না, আমাকে ক'টা রাইডার বুঝিয়ে দেবে? বেশ, কাল দিয়ো। কিন্তু একটা

একদা

কথা কাল বিকেলে পদ্মার ধারে বেড়াতে যাবো, এসো। বাবা নেই এখানে, একা যাওয়া পোষাবে না, ব'লে রাখছি। —আচ্ছা। সাগর চ'লে গেলো।

পদ্মা। শান্ত পদ্মা। এই সন্ধ্যা হবে। একটা তারা ফুটলো, আকাশর একটি দুহিতা। পদ্মার ওপারে ঘনশ্যামরেখা। এপারে ধূসর গোধূলি। মধ্যে জলের কলকলানী। হাল্কা ঢেউ পাড়ে এসে গান গায়। হাওয়া এসে কানে বলে—কী আনন্দ, কী পরিতৃপ্তি! একটা বেঞ্চ নিলো তারা, বড়ো-পোষ্টঅফিসের কাছের।

গুটি কতক বুড়ো লাঠি ঠুকে ঠুকে চ'লে যায়। তারো বেশি সংখ্যক কয়েকটি ছেলে তটিনীকে দেখতে দেখতে চ'লে গেলো। কা'কে দেখে যেন সাগর বললো—ভাল?

—ভাল। তিনি চ'লে গেলেন। ইনিই তপেশ।

আকাশে তারা ফুটছে যতই এমব্যাঙ্কমেণ্টের লোক ক'মে আসচে। দেরি নেই, আর দেরি নেই, এই এলো. এলো ব'লো,—অন্ধকার, গাঢ়, তটিনীর চুলের মতো।

আরো কিছুক্ষণ পরে: যখন কেউ নেই।. যখন সব শূন্য, যখন তা'রা দু'টি কেবল, আর আকাশে অনেক তারা।

সাগর ব'ললো—আমি তোমায় ভালোবাসি।

তটিনী উদাস সুরে জবাব দিলো—ধন্য হ'লেম, কৃতার্থ হ'লেম।

সাগর ভয়ে ভয়ে ব'ললো: তুমি আমায়, আচ্ছা তটি আমাকে তুমি, তুমি আমায় ভালোবাসো?

একদা

—ভালোবাসা কি অতই সোজা? পরীক্ষা আসুক—কঠোর অগ্নিপরীক্ষা, সেইদিন বোঝা যাবে ভালোবাসাবাসি। বৃথা কেন, আচ্ছা ঐটে বুঝি ভেনাস? ঐ যে লালচে রঙ, জ্বল-জ্বল ক'রে জ্বলচে? সব-চে বড়ো প্ল্যানেট কোনটা? নদীতে আজ বেজায় ঢেউ। আকাশে কতো তারা, উঃ। তুমি একটু স'রে ব'সো। ঐ ছাখো, জেলেডিঙি, উঃ কী স্পীড্!

সাগর ব'ললো,—এখন কি ভালো লাগে জানো? শুধু ব'সে ব'সে ভালোবাসার গান গাই। ভালোবাসার কথা বলি আর পাশে থাকো তুমি......একটা কবিতা শুনবে? আমারি লেখা কিন্তু কা'কে উদ্দেশ ক'রে লেখো জানিনা, হয়তো......আচ্ছা শোনো ঃ

সন্ধ্যাতারা আসার পরে তোমায়-আমায় হঠাৎ হ'লো ছাখা।
আমার সনে কেউ ছিলোনা সঙ্গে যাবার তুমিও ছিলে একা।
একায়-একায় মিলন পেয়ে থমকে থেমে দুইজনাতেই
চোখে-চোখে নিলেম চেয়ে, কিন্তু মুখে বাকি৷ কারো নেই।
তারপরেতে পথটা বেয়ে শুরু হ'লো লোকের আসা যাওয়া—
ঘুরে গেলো আনন তব, ওগো আমার ক্ষণেক-পথে-পাওয়া!
মাঝখানেতে কতটা কাল আশায় আশায় হ'য়ে গেছে গত,
ভুলিনি তার একটি কথা মনে আছে আজকে-ঘটার মতো।
লজ্জা-রাঙা সোহাগ মাখা আনন তব পূর্ণ চাঁদের মতো
ভাটা-মনে আজো প্রিয়ে, আনছে আশা জোয়ার অবিরত।
সাঁঝের কোলে কেমন ক'রে পথের' পরে বাসনু তোমায় ভালো—
সে-কথাটি কেউ জানেনা, আমি জানি, আর জানে ঐ আলো

একদা

মাথায় পরের সন্ধ্যাতারার, আর ঞ্জানে ঐ জোনাকফুলের রাশি,
সঙ্গোপনেই রেখেছিলেম, আজকে জানাই : তোমায় ভালোবাসি।
তুমি আমায় বাসবে বোধ'য়, তাইতে আশা, বুঝলে কিনা প্রিয়া—
প্রেম-প্রদীপের পলতে খানা ভিজিয়ে নেবো তোমার পরশ দিয়া।

—কেমন হ'য়েছে? যেমনই হোক ভালোবাসি সে কথাটি টপ্ ক'রে ব'লে ফেলেছি তো। এখন জবাব দাও। ব'লে তটিনীর মুখের পানে চায় সাগর।

তটিনীর মুখ এতটুকু হ'য়ে গেছে। লজ্জায় ওর সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিচ্ছে। এই নিঃসঙ্গ পদ্মাতীরে, এই গাঢ় অন্ধকারে, বাড়ি থেকে এই এতদূরে, ভালবাসার-কথা-বলা একটি ছেলের সঙ্গে তটিনী কেন যে সাহস ক'রে এলো ভাবতে তার অনুশোচনা হয়। বলে— রাত্তির হ'লো, চলো ফিরি।

—এতো শিগগির? ব'সো একটা গান গাও। একটা বেহাগ, না-হয় একটা ভাটিয়ালী, খুব উদাস ক'রে, নিজেকে একেবারে ভুলে গিয়ে', দিশেহারা হ'য়ে। গাও।

তটিনী কিছুতেই রাজি নয়। কিছুতেই গান সে গাইবে না। এখন তার নাকি তেমন মনের অবস্থা নয়।

সাগর কোমল ক'রে তটিনীর হাতটা নিজের মধ্যে নিয়ে ব'ললো, আমি তোমায় ভালোবাসি। বিশ্বাস হয়? আমায় বিশ্বাস করো। এই আমার অনুরোধ। তটিনী তুমি আমায় ভালোবেসো। আমার তোমাকে প্রয়োজন, তুমি না হ'লে আমার চ'লবে না, কিছুতেই না, কখনই না। তটিনী! তটি।

তার উন্মাদনা বাতাসে ভেসে যায়, তটিন সাড়া দেয় না। সাড়া সে দেবে না। তাকে সাগর বাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে আসুক্। এ-মুহূর্ত্ত কেন জানিনা তটিনীর কাছে অশুভ ঠেকছে।

আরো কিছুক্ষণ কাটলো তাদের নীরবে। নীরবতার অন্তরালে তারা তাদের মনের অনেক, অনেক কথা ব'লেছে। যে-কথা অনেক ক'রে বললেও কিছুই না। যা ব'লে শেষ করবার নয়। দূরের কোনো গাছে গিয়ে ঝাঁপ দিয়ে পড়বার জন্যে এক ঝাঁক বাদুড় উড়ে গেলো। তাদের পাখা ঝাপটানির একটা মধুর আস্বাদন। ভগবান, ঈশ্বর, ক্ষমা করো, দয়া করো, কৃপা করো। এ-শুভ মুহূর্ত্ত অতীত ক'রে দিয়ো না।—ঈশ্বর, ঈশ্বর! সাগর ব'ললো—যাবে? চলো যাই!

তটিনী এতটুকু দেরি করলো না। শাড়ীর খস্‌খস শব্দ ক'রে স্প্রীংএর মতো উঠে দাঁড়ালো, কিন্তু তার মুখে কথা নেই। কথা সে কিছুতেই ব'লবে না। কথা ব'লতে সে ভালোবাসচে না। এমব্যাঙ্কমেণ্ট, এমব্যাঙ্কমেণ্ট! তারা দুজন পরস্পরের সান্নিধ্যে হেঁটে চ'ললো। এদিকে নদী, শুধু ঢেউ আর ঢেউ; ওদিকে মাঠ, শুধু ঘাস শুধু শ্যামলিমা। তারা চ'লেছে। বাঁয়ে কশাইদের মস্ত বস্তি, বাঁধ কোমড় বাঁকিয়ে বাঁ দিকেই মোড় ফিরেছে—ঐ ইঞ্চির ঘাট, ভগবান! সাগর আজ চঞ্চল হ'য়েছে, সাগর আজ তটিনীকে চায়, একান্ত ক'রে পেতে চায়। লগ্ন বুঝি ব'য়ে গেলো। আর বুঝি পাওয়া হবে না। ঈশ্বর!—আনকটা পথ হাঁটলাম। আরেকটু ব'সেনি, আপত্তি আছে?

তটিনী কথা কইবে না।

একদা

সাগর ডাকলো—এসো।

একটা প্রকাণ্ড বিরাট অশ্বত্থ গাছ। সর্পিল অজস্র শিকড় দৈত্যের আঙুলের মতো মাটি আঁকড়ে ধ'রেছে। পদ্মার অতি কিনারে তার বাড়ি। বিগত ভাঙনের যুগে নিজ এলাকার খানিকটা মাটি আহুতি দান ক'রে পদ্মাকে সে শান্ত ক'রেছে,—এখন যা আছে তা দেবার নয়, তাই বোধ'য় লক্ষ আঙুলে শক্ত ক'রে ধ'রে পাহারা দিচ্ছে। প্রেম-মুসাফির এরা, ব'সলো সেই গাছের নিচে, আরেকটু নিচে জল, জলের প্লাবন, মাতাল জল। পদ্মা! পদ্মা! পঞ্চমি, এ আমারি জন্মভূমির পদ্মা। তুমি যাবে আমার দেশে? ভিঁটে-ছাড়া, দেশ ছাড়া আমি, আমি তোমায় আহ্বান করছি, আমন্ত্রণ করছি—যাবে? আর আমায় ডাকছে, সেই শৈশবে পদ্মার যে ছলছলানি শুনেছি রাত্রে চুপি-চুপি বিছানা ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে, সেই সুর, সব সেই, সেই সুরে পদ্মা আমায় ডাকছে—ফিরে আয়! তটিনীরা ব'সলো। নিচে জল, জলের প্লাবন! সাগর বুকে কিসের যেন প্লাবন অনুভব করছে। তটিনীকে সে জড়িয়ে ধ'রবে? না, সে কাপুরুষ নয়। (পঞ্চমী মনে মনে একটু হাসলো)। ষ্টিমার আসচে, উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ তীব্র সার্চ-লাইট ফেলে ওপারের গাঁ দেখে নিলো, নদীর বুকের ঢেউ, এ-পারের কয়েকটি নৌকা ঝিমন্ত। সাগর বেঁচে আছে? তার যেন বিশ্বাস হয় না। কত কথা, কত গান, কত গুঞ্জন তার কণ্ঠনালী পর্য্যন্ত এসে ক্লান্তিতে হতাশ হ'য়ে প'ড়ছে। সে বেঁচে আছে তো? তটিনীকে না দেখিয়ে নিজে একটা চিমটি খেলো,—হ্যাঁ, লাগে তো! বেঁচে আছে, সে বেঁচে আছে, সে মরেনি, সে সমাধিস্থ হয়নি। আশ্চর্য্য !!

—তটিনী, বলো তুমি আমার ওপর রাগোনি। তুমি প্রতিশ্রুতি দাও তুমি আমার......বাড়ি যাবে? চলো। অনেক রাত হলো। ঐ শোনো, আরেকটু বসি, কী চমৎকার, কে ও? শুনছো? ক্ল্যারিয়োনেট, ও ক্ল্যারিয়োনেট্‌এর আওয়াজ। নাঃ, চলো যাই। পেনাল কোড্ হাতে নিয়ে পিসিমা হয়তো তৈরি হয়ে বসে আছেন। ব'লো সব দোষ আমার, আমার একার। আমার ওপর সব দোষ চাপাতে তোমায় বাধবে না? তুমি আজ আমাকে দেউলে করে দিলে! তটিনী, বলো! কথা বলো!

তারপর তারা মাষ্টার পাড়ার কালীমন্দিরে একটা প্রণাম করলো। সেই পথ, সেই অশ্বথ, পাইকর, কৃষ্ণচূড়া।

—বিশ্বাস।

বিশ্বাস নাকি বাসায় নেই, তাদেরকে খুঁজতেই পিসিমা ওকে পাঠিয়েছেন। আর তাদের আক্কেলটাই বা কেমন? এই রাত, নিশুতি হতে চললো। আসতে দেরি হবে ব'লে গেলেও নাকি খানিকটা স্বস্তি পাওয়া যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। শুনছো তো পঞ্চমি?

পঞ্চমী বললো—নিশ্চয় শুনছি, না-শুনে কি করি বলো! ঘুম্‌ও নেই চোখে, ঘুম পায় না। বলো তুমি থামলে কেন?

—আটকে গেছি। তারপর, তারপর, বেশ ধরো সাগর সেদিন বাড়ি ফিরে গেলো। বাড়ি গিয়ে, হ্যাঁ বাড়িতে সে গেলো, গিয়ে সোজা উঠে গেলো দোতলায়; দোতালায় তার শোবার ঘর, শোবার এবং পড়বার। মনে করো এই মাপের, এই আমাদের এই ঘরটির মাপের। কোনো কথা নেই তার মুখে, সোজা মাথা হেঁট ক'রে ওপরে উঠে গেলো।

তারপর দোর বন্ধ ক'রে, পাগল? আত্মহত্যা করবে কেন? আত্মহত্যা কি অতই সোজা, অতই সহজ? মানুষ আত্মহত্যা করবে তখন, যখন সে ভুলে যায় সে মানুষ। যখন সে ভুলে যায় তার প্রাণে জীবন আছে। তার শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্ত যখন হ'য়ে আসে হতাশায় হিম, শীতল, বরফ! সে আত্মহত্যা করে। পঞ্চমী, আত্মহত্যা পাপ, মহা-পাপ! কত পীড়ন, কত লাঞ্ছনা, কত ঘাত প্রতিঘাত তবু মানুষ টিকে থাকে। কারণ সে জানে, সে যে মানুষ! সে যে পশু নয়, তাকে দিয়ে জগতের কাজ আছে প্রচুর। মানসী হ'লে, যাক্ পরে হবে এখন। যদি সুযোগ পাই। সাগর দরজায় খিল শক্ত ক'রে এটে দিলো। তারপর প্রায় টেনে ছিঁড়ে ফেলবার মতো ক'রে মাথার ওপর দিয়ে জামাটা বের ক'রে দিয়ে ঠাস ক'রে পড়লো বিছানার ওপর। তটিনী, তুমি আমায় ভালোবেসো, তা না হ'লে সত্যি বলছি আমি ম'রে যাবো। শুধু এই ক'টি কথা সে আবৃত্তি করছে। জানলা দিয়ে দূর-পদ্মার হিম হাওয়া ভেসে আসে, বড়ই ঠাণ্ডা; দরকার সেই—জানলা সে বন্ধ করে দিলো। বিছানার ওপর উপুড় হ'য়ে শুয়ে সে ভাবে—সত্যি, উন্মাদনায় সে তটিনীর নিকট কী বিশ্রী প্রতিশ্রুতি যাচ্ঞা করছিলো। সে মুহূর্ত্তে সে মানুষ ছিলো না, সেই ছিল তার কাছে আত্মহত্যার পরম সুযোগ! আর তটিনী? তটিনী হেসে-খেলে বেড়াচ্ছে, বিকালের ফেলে-যাওয়া আধখানা টেব্‌ল-ক্লথ ভাজ ক'রে দেরাজে তুলে রাখলো।

চলো, কিছুদিন বাদ দিয়ে এক ঝড়ের রাতের ঘটনায় গিয়ে পড়ি। তাল, নারকেল, শুপারী গাছ গুলো মাটিকে এক হাতে আঁকড়ে ধ'রে ঝাঁকড়া চুলের মাথা ঝাপটাচ্ছে,—কখনই না, কিছুতেই না, এ পৃথিবীর

ভীষণ অন্যায় ;—নিশ্চয় তাদের অধিকার আছে ও-টুকু মাটির ওপর। তারা ছাড়তে কখনই রাজি নয়। কী ধুলো, ধোঁয়ার মতো এঁকে বেঁকে আকাশ আচ্ছন্ন ক'রে ফেলছে। বৈশাখী বাতাস অফুরন্ত ফুঁ দিয়ে ছুটো ছুটি, দাপা দাপি করছে। তটিনীর বাসায় সাগর। দু'জনে ব'সে আছে, বলছে—কী হাওয়া, কী ফুর্তি!

হঠাৎ কিসের ক্রন্দন? আকাশ বাতাস সব যেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলতে চায়! তটিনী চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো। ব'ললো—ও কিসের কান্না? শুনতে পাচ্ছ না ?

সাগর চঞ্চল হ'লো না : কিছু না, কান্না শুনে অস্থির হওয়া পৌরুষ নয়। ঘরে ঘরে ক্রন্দন, হা হুতাশ; দিকে দিকে হারিয়ে-যাওয়া। ব্যস্ত হ'চ্ছো কেন?

তবু তটিনী উঠ্‌লো। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো—কতকগুলো লোক ছুটে যাচ্ছে জেলে পাড়ার দিকে, হ'লো কি? অবিশ্রান্ত ঝড়, তুফান! কার তরণী ডুবলো? কার আঁচলের গেরো খুলে ফুল—

—তটিনী, এসো। সাগর ডাকলো।

তটিনী বললো—যাও না, দেখে এসো গিয়ে, কতজন ছুটোছুটি ক'রে—

—থাক্। এসো, দেখি শুধু তোমার, তোমার মুখের দীপ্তি, প্রসন্নতা। মুখ ভার ক'রো না!

ক্রন্দন থামেনি। হঠাৎ যেন দপ্ ক'রে জ্ব'লে ওঠবার মতো কান্না আকাশটাকে ভেঙে দিলো। সাগর উঠলো না। ওঠবার ইচ্ছে তার আদৌ নেই। তার মনে শুধু এই এক চিন্তা—তটিনীকে সে একান্ত ক'রে পা'ক্। যদি তটিনী মুখে আঁচল দিয়ে ভাবিত হ'য়ে পড়ে, 'উতারো

নেকাব' ব'লে সে কামনার কণ্ঠে চীৎকার ক'রে উঠবে। সে শুধু ব'সে ব'সে দেখে যাবে তটিনীর মুখের ডৌল, তার সুষ্ঠু স্বাস্থ্য!

তটিনীর একটানা নিন্দায় সে উঠ্‌তে বাধ্য হ'লো। তখনো বৃষ্টি হ'চ্ছে। একটা ছাতি হাতে নিয়ে সে বেরুলো। পুকুরের ধারে বেজায় ভিড়। আরে, তপেশ! সাগর আশ্চর্য্য হ'য়ে গেল: তুই এখানে?

তপেশ ব'ললো—যেতে যেতে কান্না শুনে এলেম। আকালুটা মারা গেলো। হ্যাঁ, জলে ডুবে। আধখানা তুলেছি ভাই, প্রাণটুকু তার জলে ভাসচে।

সাগর ব'ললো—প'ড়ে গিয়েছিলো বুঝি? সাঁতার জানতো না, না? আর পাঁচ বছরের ছোঁড়া এত ডেঁপোমি, বেশ হ'য়েছে।

শুভ। তপেশ তার মুখের পানে আড়চোখে চাইলো।

সাগরের সঙ্গে তপেশ তটিনীদের বাসায় এলো, মানে আসতে বাধ্য হ'লো। ভেজা জামাকাপড় ছাড়লো।

আড়ালে সাগরকে পেয়ে তটিনী ব'লেছিলো—দেখলে? কী কাণ্ড! তুমি তো উড়িয়ে দিচ্ছিলে!

পঞ্চমি, কেমন? শুনছো তো?

পঞ্চমী জবাব দিলো—আকালুটা বুঝি জেলেদের ছেলে?

সুশীল ব'ললো—হ্যাঁ, তটিনীদের বাড়ির পাশেই জেলেদের জঙ্গল। তাদেরি আকালু অকালে মারা প'লো। তটিনীর চোখে করুণায় অশ্রু উদ্বেল হ'য়ে উঠেছিলো।

কিছুদিন পরে:

তটিনীর ছোটো ভাইয়ের অন্নপ্রাশন। বাড়িতে একটা বিরাট

ভোজ হবে। আজ সব আসচে এ বাসায়। আত্মীয়, অনাত্মীয় স ব। কারণ তটিনীর পরেই মস্ত গ্যাপ্ তারপরে একটি ছেলে তার আদর বেশি। তটিনীর বাবা মনস্থ ক'রেছেন ট্যাঁক একটু ঢিলে দিয়েই টাকা ঢালবেন।

এলো সবাই, সাগর, তপেশ, সুকুমার, দ্বিজেন, বিজন এবং আরো বহু। সংক্ষেপে বলছি, শোনো পঞ্চমী, এমন সময় ব্যাপার হ'লো কি? হেসো না, সত্যিই বাজে কথা নয়। তারা সবাই খেয়ে দেয়ে নিয়ে জিরোচ্ছে, তটিনী দূরে টেবিলের কাছে দাঁড়িয়ে অযথা সময় নষ্ট করছিলো, এমন সময়, ঠিক আজকের মতো একটা প্রজাপতি, কোত্থেকে জানি না, তটিনীর এলো খোঁপার ওপর ব'সে ভাবছিলো কি-যেন। তটিনী আর সময় নষ্ট করবে না ভেবে চ'লে যাবে, তারি ঝাঁকানিতে সেটা উড়ে গেলো—সাগর সব লক্ষ্য ক'রেছে—উড়ে চ'লে গেলো বাইরে। ওরা সাগরের মুখ থেকে শুনে খানিকক্ষণ হাসলো। কিন্তু কী অদ্ভুত কাণ্ড! কাণ্ড বলে একেই, কিছুক্ষণ গল্প গুজবের পর তারা ছাখে, দেখে আশ্চর্য্য হয় প্রজাপতিটা—সাগর বলে, আল্‌বৎ সেইটে—তপেশের মাথার চারপাশে ফুরফুর ক'রে উড়তে উড়তে একটা শীতল স্পর্শ দিয়েই তপেশের হাত ঝাপটানি খেয়েই উধাও। তাদের সে কী হাসি তখন। কিছুক্ষণ বাদে ওরা সবাই চ'লে গেলো কিন্তু সাগর গেলো না।

তটিনী এলো। সাগর হাসচে। এ হাসির ভেতর একটি রহস্য আছে তা বুঝতে তটিনীর দেরি হয় না কিন্তু হাজার জিজ্ঞাসায়ো সাগর তাকে কিছু ব'ললো না। তটিনী ব'সলো, ঘরময় এঁটো বাসন ছড়ানো, মাছির ভনভনানি, বেড়ালের দৌরাত্ম। তটিনী হাত তুলে বেড়াল তাড়ায়,

সাগরের সঙ্গে হাসি বিনিময় করে। সাগর বলে—তোমার ঐ হাসিটাই মারভেলাস্।

তটিনী উঠে গেলো। এবং চ'লে গেলো সে অনেক কাজে। সাগর একা শুয়ে শুয়ে ভাবছে কত-কী। একটি দিন তটিনীকে না দেখলে তার মন ভাল লাগে না কেন? তটিনীর মধ্যে সে অসাধারণ এমন কী পেয়েছে?—যাতে সে এমন বিভ্রান্ত? সাগর ঘুমিয়ে পড়লো। তাই ব'লে তুমিও ঘুমিয়ে পড়োনা। কি পঞ্চমি, জেগে আছো তো?

আরো কিছুদিন বাদঃ সাগর এবার ক্ষেপে উঠেছে। তটিনী ম্যাট্রিকটা দিয়ে নিলেই, ব্যস্। একদিন নহবৎ উঠ্‌বে বেজে, কী করুণ তার সুর, ভাবতে ভা-রী সুন্দর লাগে। একটা লাল ওড়না— এতো পাৎলা, তার ভেতর দিয়ে তটিনীর মুখের আভাস! চমৎকার! সাগরের বুকটা কাঁপে। সে নিশ্চয় সুযোগটুকু আহরণ করবে যেমন ক'রেই হোক্। ধরণী মাটি হ'য়ে যাক্, সূর্য্য হ'য়ে আসুক স্তিমিত, চাঁদের চোখে ঘুন ধরুক্, তথাপি। এ তার প্রতিজ্ঞা, এ তার আকাঙ্ক্ষা, কামনা, সেই তার উদ্দেশ্য।

তটিনীর মা বললেনঃ মেয়েটার বিয়ে দেবো। একেই বাড়ন্ত গড়ন। সতেরো পার হ'লো। আর ধ'রে রাখা চ'লবে না।

সাগর একটু থিতিয়ে যায়ঃ তা', ইয়ে, কি বলে। পরীক্ষাটা হ'য়েই যাক্ না, পিসিমা।

পিসিমা তাতে রাজি আছেন। সেই কথাই তিনি নাকি বলেছেন। এবং সাগর যদি একটি সৎ পাত্র সন্ধান ক'রে দিতে পারে, তবে যেন ছ্যায়। তাতে পিসিমা সন্তুষ্টই হবেনা।

সাগর ভেবে পায় না নিজেকে সে কী-ক'রে ভোট ছায়। পিসিমা-টার মাথা খারাপ, সামান্য জলের মতো এ জটিলতা, সেইটুকু বুঝতে পারলেন না? তিনি নিজেই সাগরকে নির্ব্বাচন করলে মহাভারত—যাক্ গে।

তারপর একদিন, সাগরের প্রথমে বিশ্বাস হ'লো না কিন্তু অবশেষে বিশ্বাস না ক'রে সে পারলোও না, তটিনী তপেশকেই বিয়ে করবে, তাকেই তার ভালো লেগেছে। প্রথমে সাগর যেন আকাশ থেকে পড়লো, আত্মহারা হ'য়ে উঠ্‌লো--একি! তটিনী তাকে একদম জীবনের জমা খরচ থেকে বাদ দিয়ে দিলো? তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলো-'Frailty, thy name is woman' তারপর সে কিছুক্ষণ স্তব্ধ রইলো। দাঁড়িয়ে ছিলো, তার শোবার খাট্-এর ওপর ব'সে প'ড়লো এবং, পাগল? আত্মহত্যা অতই সহজ? এবং মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে লাগলো কত পুরাণো দিনের ঘনীভূত-হ'য়ে-আসা স্মৃতি, কত রাজ্যের আবোল তাবোল কত-কী। সেই পদ্মাতীর, সেই মাষ্টার পাড়ার রাস্তা। অশ্বথ, পাইকর, কৃষ্ণচূড়া, ক্ল্যারিয়োনেট্। তটিনীর সেই হেসে-ভেঙে-পড়া, হেসে-আটখানা-হ'য়ে-যাওয়া। তারপর জীবনের ওপর হঠাৎ এই বিফলতার আঘাত পাওয়া, জীবনের কোনো মানে না থাকা। সাগরের চোখে ঘুম আসে না। রাত্তির অনেকগুলো বেজে গেলো—গুণে গুণেও সে ভুল ক'রে ফেলে। সারারাত আজ সে জেগে থাকবে। আকাশের নক্ষত্র তাকে বিদ্রূপ করুক; হেসে হেসে, টিটকারী দিয়ে তারা হায়রণ হ'য়ে যাক্, সাগর তোয়াক্কা করে না। উঠে গিয়ে জানালা ভালো ক'রে খুলে দিলো। বাতাস! কার দীর্ঘ নিঃশ্বাস তুমি? আমার? সাগর

নিজের মনে প্রশ্ন করলো। নিজের ওপর, আজ এই প্রথম তার একটা বিতৃষ্ণা এলো এবং হঠাৎ এলো। সে সাগর, সে সাগর সান্যাল, সে তপেশ মৈত্রের চেয়ে কোনো অংশে খাটো নয় তথাপি আজ তার চেয়ে কত হেয়, কত বিশ্রী! তাই সে ভাবছে জীবনটাকে এক তটিনীই তার কাছে কত অর্থহীন, কত নগণ্য ক'রে দিলো! সারারাত সে জেগেছিলো কিন্তু ভোরের পদ্মার হাওয়া জানলা দিয়ে ট্রেসপাস্ ক'রে তার সর্ব্বাঙ্গে মিঠা বিষ ঢেলে তাকে অচেতন ক'রে ফেললো। সাগর ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছে অনেক, জাগলে যা মিথ্যা, অসহ্য রকম মিথ্যা!

তারপর বিবাহের দিন নহবৎ বাজিয়ে, পাড়ায় সোর তুলে উৎসবের আয়োজন চললো। একটি মাত্র মেয়ের বিয়ে আজ, তটিনীর বাবা প্রাণ ভ'রে জামাই বরণ করবেন। তপেশের লাখো অনুরোধ সত্ত্বেও এবং সুকুমারদের পীড়াপীড়ী উপেক্ষা ক'রতে বাধ্য হ'য়েও সাগর কিছুতেই সেদিকে পা দেবেনা ঠিক ক'রেছে। আকাশে তখন তারা, অনেক তারা, যতগুলো এওরি ওদের বাসায় তার চেয়েও বেশি।—ওদিকে কত গান, আমোদ-আহ্লাদ, কত হুড়হুড়ি। সাগর তখন মাষ্টার পাড়ায় রাস্তায়। এখান থেকেই নহবতের একটানা পোঁ কানে এসে বাজে, এবং আঘাত করে। সাগর কালী মন্দিরে প্রণাম করতে ভুলে গেলো, কেমিক্যাল ল্যাব্‌রেটরি থেকে অদ্ভুত পচা ডিমের গন্ধ বাতাসকে বিষাক্ত ক'রেছে, সেদিকে সাগরের মন নেই। সে চ'লেছে সোজা পদ্মাতীর। একটি প্রাণী নেই রাস্তায়, ঘরে-ঘরে দুয়ার বন্ধ, প্রদীপ নিভন্ত, শিশুদের অস্ফুট ক্রন্দন ধ্বনি। সাগর চ'লেছে পদ্মাতীরে—ইঞ্চির ঘাটে।

কয়েক দিনের অশান্ত বৃষ্টিতে পথ কাদায় একাকার। সাগর কোনো

দিকে ভ্রূক্ষেপ না ক'রে সোজা চ'লেছে। সে আজ পৃথিবী থেকে বাদ পড়তে চায়, শোনোই শেষ পর্য্যন্ত, সে আজ থেকে পৃথিবীর হিসাবের বাইরে, পৃথিবীর সঙ্গে সে কোনো সম্বন্ধই আর রাখবে না।

বিয়ে বাড়ি। তুমুল তোলপাড়। স্থকুমাররা সাগরের খোঁজ করছে—সে এলো না! তপেশ একটু গম্ভীর হ'য়ে প'ড়েছে—তার বুঝতে বাকি নেই। কিন্তু উপায় কী? আর তটিনী, সে জানিনা সাগরের কথা ভাবছে কিনা। তাকে এতগুলো গয়না পরিয়ে, শাড়ী দিয়ে সঙ্ সাজিয়ে বন্ধুরা ঠাট্টা তামাশা করছে। তটিনীর মুখে হাসি, খুব সামান্য, ভেতরের দৌর্ব্বল্য যা-তে না প্রকাশ পায়।

নহবতের কী তান। আ—কান জুড়িয়ে যায়।

তটিনী ম্যাট্রিক পাশ ক'রেছে—তপেশের সঙ্গে সে কলকাতায় চ'লে যাবে। সেখানে প্রাইভেট্, না-হয় ভর্ত্তি হ'তেই বা দোষ কি, কলেজে প'ড়েই না-হয় ইনটারমিডিয়েট দেবে। তপেশ মৈত্র কুমিল্লার এক ব্যাঙ্কিং কর্পোরেশনএর কলকাতার এজেণ্ট। জীবনে তার উন্নতি হবার অনেক আশা—আর তটিনী তো তারি, সংস্কৃত ভাষায় যাকে বলে অর্দ্ধাঙ্গিনী এবং বিকৃত ভাষায় যে শয্যাসঙ্গিনী।—তার আর ভাবনা কী? তটিনী খুব একটা লিফ্‌ট্ পেয়ে গেছে। জীবনে সে একটা প্রতিষ্ঠা চায়, অর্থাৎ দাবি করে, আর দাবি ক'রে নাকি সে অন্যায় করে না। এই তার মনের ভাব।

সাগর গিয়ে দাঁড়ালো সেই অশ্বত্থ গাছের শিকড়ের ওপর। নিচে জলের প্লাবন, বর্ষা এবার একটু তাড়াতাড়িই এসে গেছে। শিকড়ের কাছে পাক খাচ্ছে। সাগর দাড়ালো। সে মরীয়া হ'য়ে গেছে, তথাপি

দ্বিধা। কে যেন পিছু ডাক দিচ্ছে, কে যেন তাকে নিষেধ করছে—ওকি ? তুমি মানুষ নও ? পদ্মা, বিশাল পদ্মা, পাগল পদ্মা, আমার জন্ম-ভুমির মাটিমাখা পদ্মা ! সাগর দাঁড়িয়ে রইলো। জলের সে কী ছলছলানী, সে কী ভীষণ তাণ্ডব। এই শিকড়ের ওপর তটিনীর সঙ্গে একদিন সে ব'সেছিলো—সেদিন তার মুখ দিয়ে সাগর একটি কথাও বের করতে পারে নি। শুধু রেখে গেছে তার স্পর্শ, তার স্পর্শের কোমলতা, কমনীয়তা। সাগর চোখ বুজলে, তার ভয় করছে। সে একটু ব'সে নিক্। একটু ভেবে দেখুক, কোন ঘাটের নৌকা কোথায় গিয়ে ভিড়লো, কার গলার মালা ছিঁড়ে জলে ভেসে চ'লে গেলো ভিন গাঁয়ে—অন্য কার কাছে যেন। কিন্তু না, সাগর দেরি করবে না। কিছুতেই সে দেরি করবে না। দুর্ব্বলতা ক্রমেই তাকে আকর্ষণ করছে, আর নয় এইবার। সাগর উঠে দাঁড়ালো, ওখানে ঝাঁপ দিয়ে পড়লে আর রক্ষে নেই, বিশাল আবর্ত্ত পাক খাইয়ে তাকে নিয়ে যাবে নিরুদ্দেশের দেশে, অজানায়। সাগর কিছুক্ষণ চোখ বুজে দাঁড়িয়ে রইলো: মনে মনে শুধু আবৃত্তি করছে—এই পদ্মাই আমার তটিনী, এই আমার সব, আমি পৃথিবীর কেউ নই, আমি এক টুকরা তৃণ, তারপর—

—বাবু চা খাবেন নি ! প্রিয়তম এসে উপস্থিত।

পঞ্চমী ব'ললো—তারপর ?

সুশীল প্রিয়কে ধমক দিলো—খেলে তো ডাকবোই তোকে। আলাপ করতে এসেছো ?

পঞ্চমী ব'ললো—তারপর ?

—এই প্রিয়, প্রিয়, দেখলে? উধাও। লক্ষ্মীছাড়ার কাণ্ড দেখো। কোথায় যেন যাবে সেই জন্যে এতো আলাপ!

পঞ্চমী কোনো কথা ব'ললো না আর—সুশীল কি বলে প্রতীক্ষায় রইলো। কিছুক্ষণ চুপচাপ ক'রে কাটলো। ওঘরে শব্দ শুনে সুশীল জানলো প্রিয় ফিরে এসেছে।

সুশীল হাসলো: দেখলে কত বড়ো দাবি এক প্রজাপতির? তপেশের তপের জোর ছিল, ঠিক এনে জুটিয়েছে।

পঞ্চমী বলে,—জোর না হাতি, তোমার মাথা!

—আমার শুধু মাথা? না আরো কিছু? বলো—সুশীল পাশ ফিরে শুলো। •

এই সামান্য একটি গল্পের অছিলা ক'রে সুশীল পঞ্চমীর নিকট যে ইঙ্গিত পাঠালো, বুঝতে পঞ্চমীর বাকি নেই। এই ইঙ্গিতকে একটি দুর্ব্বল আবেদনও বলা যেতে পারে।

পঞ্চমী কথার স্বর ব'দলে দিয়ে বলে, সত্যি বলো না, গল্পটা তোমার নিজের বানিয়ে বলা কি না!

সুশীল হাসে: জেনে তোমার লাভ? বানানো আছে বই-কি খানিকটা। বলছি তো, সাগর-ফাগর সব বাজে কথা, তোমাকে একটা উদাহরণ দিলাম মাত্র। সত্যি, ঘটনাটা মিথ্যা হ'তে পারে কিন্তু উদাহরণটা সত্যি। বিশ্বেস করো না তুমি, দেখো তোমাকে বিশ্বেস করিয়ে ছাড়বে।

পঞ্চমী বাধা ছায়: থাক্ সে কথা, কিন্তু এ তুমি আগে থেকেই ভেবে ব'সেছিলে, না এখন ভেবে ভেবে ব'ললে? ব'লে উত্তরের আশায় সুশীলের মুখের পানে তাকিয়ে থাকে।

—দেখলে না, ভেবে নিলাম তোমার কাছ থেকে সময় নিয়ে? প্রিয়, এসেছিস্, তবে শোন। এই প্রিয়, আগে বাঁশটা লাগিয়ে দে চৌবাচ্চায়, জল এলো রে। হ্যাঁ, এ আর ভাবা-চিন্তা কি যা-তা বলা ছাড়া তো কিছুই না। সুশীল থামে।

পঞ্চমী একটু দম নিয়ে বলে,—তুমি লিখলেই পারো! এ-গল্পটা লিখে ফ্যালো, বলছি আমি শুনেই ছাখো কথাটা।

সুশীল হাসে: লিখবার অধিকার আমার তো নেই, আমার অধিকার শুধু বলবার।

—সে অধিকার তবে কার?

—আমার বন্ধুর,—যার কথা বললাম তোমাকে তখন। সে শুধু লিখে যাবে। তুমি ভাবছো কি? আজকের ঘটনার আদ্যন্ত সব কিছুর কিছুই অজানা নেই তা'র কাছে। সে সব হুবহু নিজের খাতায় টুকে নিয়েছে। আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, তার গতির সীমানা বাঁধা নেই তো, সর্ব্বত্র সে যাবে। (একটু হেসে নিয়ে) ধরো, কথার কথা: যদি তুমি আমাকে কিংবা আমি তোমাকে একটা চুমু দাও কি দি, তবে আর রক্ষে থাকবে?—সবার হ'য়ে যাবে জানাজানি। কাজ নেই, কি বলো তুমি? পাশ ফিরে শুলে ফের? শোনোই, আরো ঢের কথা আছে। কোনো ভয় নেই, আমি তেমন পুরুষই নই যে.........

পঞ্চমী পাশ ফিরলো। সমস্ত দেহে তার চাঞ্চল্য এসেছে। তার ভেতরটা দাপাচ্ছে। সুশীল থেমে গেল মধ্য পথে। বললো আবার: এবার চা-টা সেরে নে'য়া যাক্, কি বলো? প্রিয়, ষ্টোভটা ধরা। চা কর্। সুজি আছে? তবে জল চড়িয়ে দিয়ে দৌড়ে নিয়ে আয়, একটু

ঘেঁটে দে। সব হজম হ'য়ে গেল, না? এতক্ষণ বক্-বক্ ক'রেই চ'লেছি।

পঞ্চমী আবার তাড়া দিলো: টাইম-টেব্‌ল্ দেখলে না তো? কখন ট্রেণ?

—ট্রেণ যখনি হোক্ না, সন্ধ্যের একটু পরেই বেড়িয়ে প'ড়বো, একটা-না-একটা জুটবেই। সুশীল ঢিমিয়ে চ'লতে ভালোবাসে। তাড়াহুড়ো কোনো কাজে দেবে না, নিজেও ক'রবে না।

পঞ্চমীর এ-সব মন-মতো হয় না, তাই অভিমানে তার গাল ফুলে ওঠে: ফেল্ করি আর কি ট্রেণটা—তোমার তো সুবিধেই।

সুশীল চীৎকার ক'রে হেসে ওঠে: আমার সুবিধে? কেমন—উদাহরণ দাও একটা।

—আমার অত উদাহরণ জানা নেই।

—তবু বানিয়ে বুনিয়ে কোনো-রকমে। সুশীল ঠাট্টা করে।

—সুবিধে আর কি, সুবিধে হাতি! পঞ্চমী চ'টেছে হয় তো।

সুশীল হাসে: আর তা'লে তোমার বড়ো অসুবিধে!

পঞ্চমী কথাটাকে মুহূর্ত্তের মধ্যে তলিয়ে ছ্যায়। সুশীল থেমে যায় ও-কথা আর তোলে না। নীরবতার কিছুক্ষণ কাটে।

ঝাঁঝালো কাকের গলার মতো কে যেন মটোরে হর্ণ বাজালো। সুশীল বলে: স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়বার পর্য্যন্ত অবকাশ ছ্যায় না এরা।

পঞ্চমী বলে উল্টো কথা: দেশে মানুস আছে জানায় শুধু ওরাই। নইলে এমন বিমর্ষ হ'য়ে জড়ের মতো চুপটি ক'রে ব'সে থাকা, এ কি বেঁচে থাকা?

সুশীল হেসে ওঠেঃ তোমার বুঝি জিভ চুলকাচ্ছে। অনেকক্ষণ তোমার মুখের কথা বেরোতে দিনি!

—আমি তো তোমার মতো বাজে বাকি না যে কথার মধ্যে কেবল দেবো বাধা। সুশীল আরো হাসে!

—আমি বুঝি বাধা দি পদে-পদে? যারা বাধা ছায় তারা গাধা, যারা ছায়না ছায়না তারাই! ও মানেটাকে একদম ওর মন গড়া পথে টেনে নেয়ঃ আমি তোমাকে সেই কবে থেকে বলছি বলো তো? তুমি শুনবে না ক'রেছো প্রতিজ্ঞা। থাকো যদ্দিন পারো একা! পঞ্চমীর মুখের দিকে চেয়ে হাসে।

—তোমার সামনে-যে মুখ দিয়ে রা বেরোতে পারবে না। মাতালের মতো পথ ছেড়ে নর্দ্দমা দিয়ে হাঁটতে ক'রেছো শুরু।

—তুমিই তো তুললে বাধার কথা! আমার দোষ কি বলো! আমি নাকি তোমাকে বাধা দিয়েছি।

—কিসের বাধার কথা শুনি? রাঁচি যাও। পঞ্চমী হাসে।

—তুমি বুঝি সেবার সেরে এসেচো সেখান থেকে? আর যাই-বা কি ক'রে! তুমি যেতে, ছিল একটা আকর্ষণ, দরকার হ'লে যেতেও পাত্তাম। তোমার মামা গেলেন আবার নাইনিতাল তুমিও চ'ললে সেথায়; সেখানে গারদ-ফারদ যদি থাকে সংবাদ দিয়ো। যাবো। সুশীল মুচকে হাসে।

—সত্যি তোমার কী যেন হয়েছে—এবার এসে টের পাচ্ছি একটুএকটু।

—একটু একটু পাচ্ছো? সম্পূর্ণ তবে এখনো পাওনি বলো। তা যদি পেতে চাও তবে—

-তবে কি ? বলো।

—নাঃ, আর ব'লবো না বাপু। আবার ব'লে ব'সবে, ডেকে এনেছি অপমান করছি। কিন্তু তুমি মামাবাড়ির আদর কতদিন উপভোগ ক'রবে ঠিক ক'রেছো ? শিগগিরি ফিরছো তো ?

—শিগগির অ-শিগগির সব তোমার হাতে। ঠিক-ঠাক হ'লে সংবাদ দিয়ো। ঠিক আসবো।

—এটা তো আষাঢ় ? এই শ্রাবণেই ঠিক-ঠাক জেনে যাও। দিন দেখে টেলি পাঠাবো। সুশীল হো-হো ক'রে হেসে ওঠে ঃ রাগলে ?

পঞ্চমী উত্তর দ্যায় ঃ রাগতে দিচ্ছো কই ? হেসেই তো হাসি পাইয়ে দিচ্ছো। 'কিন্তু...

সুশীল শেষটুকুন্ শুনতে চায় ঃ কিন্তু কি ব'লে ফ্যালো, আমার কাছে আবার লজ্জা ! বলোই না। কি ? চুপ ক'রে রইলে যে ?

—না ; সে অন্য এক কথা। কি ব'লছিলাম দিলে তো গুলিয়ে। মনে প'ড়লে ব'লবো অখন। সুশীল বুঝতে পেরেছে হয় তো এর নিগূঢ় অর্থ ঃ আমার চেয়েও বেশি চালাক হ'য়ে গেলে যে ! কিন্তু এটা কি ভালো হবে ?—এই বোধ'য় ব'লতে চাইছিলে ?

—হ্যাঁ, যদি তাই হয়, তার উত্তর ?

—তার উত্তর শুধু তোমায়-আমায়। সে কথা বাইরের লোককে জানিয়ে লাভ ? ব'ললেই তো হ'য়ে যাবে রাষ্ট্র বন্ধুর দৌলতে !

পঞ্চমী বিশ্বাস করে না ঃ রেখে দাও তোমার বাজে বুজরুকি ? উত্তরটা দাও দিকি !

সুশীল তবু উত্তর দ্যায় না। মুখ বুজে চুপ হ'য়ে থাকে। এর উত্তরটা

হয় তো : এ ভালো ছ্যাখাবেই, যদি না ছ্যাখায়, দেখিয়ে-দেখিয়ে সব্বাইকে সইয়ে নিতে হবে। মাইকেলের অমিত্রাক্ষর প্রথমে কারোই ভালো লাগেনি, টিটকারি দিয়েছে যথেষ্ট এখন লোকে প'ড়তে আর তার অনুকরণ ক'রতে দিশে পায় না ; আরো হ'চ্ছে, ভালোবাসাটা খোয়ানো কি ভালো কথা ? সুশীল তাকে ভালোই বেসেছে, সে-ও হয়তো বেসেছে তা'কে।

এ-সব কথা মানে, এই ভালোবাসার কথা ব'লতে সুশীল চায় না। এ-টা ঢাক-ঢোল পিটিয়ে জানানো যায় না। এ-টা মনের কথা, গোপন কথা। তাইতেই বোধ'য় সুশীলের উত্তর দিতে দ্বিধা।

বাইরের অগ্নি-আঁখির দাহনে ভালোবাসার অমৃত কখনই ফুটে ধোঁয়া হ'য়ে যেতে পারে না, সুশীল হয় তো এই কথাটাই মনে-মনে ব'লছে কিন্তু মুখে এনে এর মাধুর্য্য খাটো ক'রতে চায় না। সুশীল তাই চুপ ক'রে রইলো।

প্রিয় চা-র জলে পাতা ছাড়লো। সুজির ছোট্টো ঠোঙাটা এখনো খোলেনি। সুশীল হাঁকলো : আর দিস্ না, কড়া তেতো-বিষ হ'য়ে যাবে যে। প্যানটায় দে সুজি ঢেলে চড়িয়ে। যাও না পঞ্চমী, তোমার হাতের একটু রান্না খাই। ও-টুকু ঘেঁটে আনো।

পঞ্চমী এক-কথায় উঠ্লো।

সুশীল অনুভব ক'রলো নিজেকে গর্ব্বিত। সে আর একা নয়।

পঞ্চমী কাপড় জড়ো ক'রে বাঁ হাত দিয়ে তাতা-প্যান ধ'রে ষ্টোভের মুখ থেকে তুলে-তুলে নিচ্ছে মাঝে-মাঝে—না ধ'রে যায়, ডান হাতের খুন্তি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গুঁড়োগুলো উল্টে-পাল্টে দিচ্ছে। সুশীল চেয়ে-চেয়ে দেখছিলো। সেবার এসে একদিন খাইয়েছিলো আলুর শিঙারা, এবার

খাওয়াবে সুজি। রান্নায় পঞ্চমীর হাত আছে। পনেরো বছর বয়েস থেকে তো শুধু ঠেলছে ব'গনে, রাঁধছে শুধু ফ্যানসা ভাত আর সেদ্ধ। আজ চার বছরেই সে পাকা রাঁধুনি কেবল ও-দিকেই, কিন্তু আমি যে কেমন সুশীল পরের বার দেখা হ'লে খেয়ে দেখবে। ছ্যাঁৎ ক'রে খানিকটা জল দিলো ঢেলে, সুজিগুলো টপ্-টপ্ ক'রে ফুলে উঠে ফেটে ধোঁয়া ছাড়ছে। সুশীল বললো,—চিনি ছেড়ে স'রে ব'সো, গায়ে ছিটে প'ড়বে নইলে।

পঞ্চমীর রাঙা-মুখখানা ফিরিয়ে বলে,—দলা পাকিয়ে থাক্ আর কি! তখন দেবে দোষ। তাই খুন্তি দিয়ে শুধু ঘোঁটে।

আগুনের তাতে ঘামিয়ে উঠেছে। সুশীলের দরদ গজিয়ে ওঠে: আহা হা, বেজায় কষ্ট দিলাম হয় তো। কিছু মনে ক'রো না। এ-দশা না হ'লে দু-বেলা দশমুখের ভাত রাঁধতে তো হ'তোই। শেষটুকু ব'লে আবার একটু ঠোঁট বুজেই হাসে।

শুকিয়ে এসেছে, জোরে-জোরে প্যানের তলা ঘ'ষছে খুন্তি দিয়ে তাই। সুশীল বলে,—থাক্, ও-সব প্রিয় ঠিক ক'রে দিচ্ছে।

পঞ্চমীর আর না ব'লে পারলো না: আর অপ্রিয়রা শুধু আগুন সইবে, না?

হঠাৎ শুনেই সুশীল ভ'ড়কে যায়, তৎক্ষণাৎ হাই-হাই ক'রে ওঠে: সে কি কথা, সে কি কথা, তুমি অপ্রিয় হ'তে যাবে কোন্ দুঃখে? তুমি আমার প্রিয়র আরো দু-এক কাঠি ওপরে যে ছাই। হো-হো ক'রে হাসে তারপর।

ঘটির জল দিয়ে হাতের সুজি ধুয়ে কাপড়ে মুছতে-মুছতে উঠে বলে, —থাক্ ঢের হয়েছে। ও-ও হাসে।

—আজ কতবার তোমার কাছে আমার ঢের হ'লো বলো তো। কিন্তু আমার কাছে এ ঢের নয়, এ ঢেরের অণু—তা জানো না বুঝি? সুশীল খানিকটা মুখে দিলো : বাঃ ফাষ্ট' ক্লাশ, একটু যা জিভে ছ্যাঁকা লেগেছে—শুদ্ধ ক'রে যাকে বলে নোলায় দাগ। পঞ্চমী বলে,—তাড়াতাড়ি ক'রতে গেলেই সব পণ্ড। র'য়ে স'য়ে কাজ ক'রতে হয়। খুব জ্বলছে বুঝি?

মাথা নেড়ে জানায় জ্বলছে না, মুখদিয়া উচ্চারণ ক'রে জানায় : তাড়াতাড়িতে পণ্ড তা জানি কিন্তু এ-ও কি তাড়াতাড়ি? আজ দেড় বচ্ছর কেটে গেল। মাথা নিচু ক'রে হাসি ঢাকে, চামচে দিয়ে পিরিচের সুজি খোঁড়ে।

পঞ্চমী হাসছে : সত্যিই। কী যে ব'লবো! তার নাকি দুঃখেও হাসি পায়।

—বলবে আর কি, বলবে—রাজি। ব্যস্।

—খেতে দাও দেখি এটুকু। তোমার রঙ্গে গলায় যাবে আট্‌কে। পঞ্চমী একগাল মুখে দিয়ে শিশাচ্ছে, গরম লেগেছে।

সুশীল হাসে : কেমন? তোমার তুমি তাড়াতাড়ি লাগে নি?

পঞ্চমী মীমাংসা ক'রে ছায় : দু-জনেরি লেগেছে, বেশ। খেয়েনি পরে আর সব ব'লো।

—স্বীকার ক'রলে? সুশীলের প্রাণে এসে গেল জোয়ার—কারো আকর্ষণী শক্তিতে নিশ্চয়ি।

সুশীল আর কথা ব'ললো না।

পঞ্চমী জিরিয়ে জিরিয়ে খাচ্ছে। চামচে দিয়ে ছোট্টো ছোট্টো টুকরো কেটে-কেটে যেন অতি যত্নে অথবা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখে পুরছে! সুশীল ওর খাওয়ার ভঙ্গিমাটা শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে নিচ্ছে।

চৌকীর থেকেই হাত বাড়িয়ে ঠুং ক'রে মেঝের ওপর পিরিচটা রাখলো। পঞ্চমী মন্তব্য দিলো ঃ জড়ো ভরত!

গ্লাস থেকে মুখটা নামিয়ে সুশীল বলে,—কি ব'ললে, জড়ো ভরত? আমার সৌভাগ্য। পথে সবাই বলে, এতো খাটুনি ও ধাতে পোষাবে-না। আমি নাকি বেজায় খাটি। কথাটা খাঁটি না মেকি কে জানে। তোমার মতে আমি অথর্ব্ব, কেমন? তারপর জলে চুমুক ছায়, গাল ফুলিয়ে সমস্ত মুখ খানা নেয় পরিষ্কার ক'রে।

পঞ্চমীও জল খেয়ে নিলো।

সুশীল অনেকক্ষণ ধোঁয়া গেলেনি তাই চুরুট-টা বাঁ হাত দিয়ে ধ'রে ডান হাত দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে টানতে টানতে একমুখ কড়া গন্ধের ধোঁয়া ছেড়ে দিলো,—সে গুলো পাকিয়ে পাকিয়ে মেঘের মতো উড়ে গেল শূন্যে।

পঞ্চমী মুখ ঘুরিয়ে নিলো ঃ কি যে করো ছাই। কী তীব্র গন্ধটা!

—বেজায়। তাই তো খাই। সিগারেট পুরুষের জন্যে নয়, ও-সব খাবে মেয়েরা। বিড়ি খাবে ছেলে-ছেকড়া। আর আমাদের এই। চুরুটটা দেখায়।

টাইম্‌পিস্‌টা ধুঁকছেই। ওর ধোঁকানি আরম্ভ হ'য়েছে সেই কবে। সুশীল ঘড়ির দিকে চাইলো।

—ওঃ বাবা, চারটে ! টেরই পাইনি। কথায় কেমন সময় কাটে দেখলে ?

পঞ্চমী বলে,—সময় তো কাটেই কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই যে আমার বুকটাও ফাটে।

সুশীল উৎসাহিত হ'য়ে চীৎকার ক'রে উঠ্লো : বুক ফাটে ? আবার তা'র সঙ্গে হাসেও।

—বুক ফাটা কি বারণ ? তোমার পাল্লায় প'ড়লে প্রাণ করে আই-ঢাই, ট্রেনের সময়টাই এখন অব্ধি জানতে পারলে না। যদি না পাই তবে !

—পাবেই, আমি বলছি। আমিই টাইমটেব্ল্। শুধু সময়টা ব'লতে পারি না কিন্তু ট্রেণ পাইয়ে দিতে পারি।

উদাসীনার মতো পঞ্চমী বলে,—পারলে, ভালো ! আমার সৌভাগ্য !

—আর আমার দুর্ভাগ্য। সুশীলও রেশ ধরেই বলে।

পঞ্চমী ডাগর চোখ দু'টো পাকিয়ে তাকায় সুশীলের পানে।

সুশীলও চেয়েই থাকে তার পানে স্থির অপলক দৃষ্টিতে, শুধোয় : ও চাউনির মানে ?

পঞ্চমী জবাব দ্যায় না, কিন্তু ও চাউনির মানে আরো গভীর সুশীল যতটা ভাবতে পেরেছে তার চেয়েও। নিজের দৃষ্টিশক্তি আছে ব'লেই অপরের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য অথবা কদর্য্যতা উপলব্ধি করা যায় আবার অপরের দৃষ্টি দেখেই তারই ভেতরটাও জানা যায়, যার অর্থ, তথ্য আবিষ্কার ক'রতে আজো সুশীল পারে নি,—পঞ্চমী তেমনি ক'রে চেয়েছিলো। সুশীল তাই ফের শুধোলো : ওর মানে ?

—কিসের? মানে, মানে ক'রে যে পাগল ক'রে তুললে আমায়। কিসের মানে চাও বলো দেখি।

—ওই তোমার চাহনির। অমন ক'রে চাইলে?

—চাওয়াটা কি মহাপাপ? আর তার জন্যে কৈফিয়ৎ দেওয়াটাও কি বিধি? চোখ দিয়ে চাইলে—তার জবাব অর্থাৎ কারণ বলা কঠিন, মুখ দিয়ে চাইলে তার উত্তর সোজা। তাই এর কোনো জবাব দিতে পারলাম না। কিছু মনে ক'রো না যেন। না চেয়ে চোখ তো বুজে থাকতে পারি না! একটার ওপর আবরণ দিতে আর সব-কিছু যে অন্ধকারে হ'য়ে আসবে। কিন্তু মুখের চাওয়া বাদ দিতে পারা যায় তাতে বাক্‌রোধের আশঙ্কা নেই যে। তাই আমি এর 'মানে'র কোনো জবাবদিহি দিতে অসমর্থ। চোখটাই মানুষের সমস্তই দেহের দর্পণ, সবটুকুর ছায়া এসে পড়ে এরি ওপর, আসে ছায়ার মতো যায়ও তেমনি ভাবনা চিন্তা সব কিছু—তখন কি ভেবে চেইছিলাম মনে নেই যে। পঞ্চমী ক্রমে ক্রমে সুরটা নরমে নিয়ে আসচে।

সুশীল ব'ললো: জবাব নেই কি রকম? এই তো জবাব। আমি এর বেশি তো তোমার কাছ থেকে জানতে চাইনি।

পঞ্চমী নীরবতায় গায়ে প্রথমে কিছুতেই হাত দেবে না। কাঁচের বাসনের মতো যা ঠুনকো, বে-দামি তার ওপর ওর আস্থা নেই। ছোট্টো আঘাতেই যা ভেঙে হয় চুরমার সে সব ও দূরে রেখে আলগা হেঁটে চলে, যেমন তার এই বৈধব্য। চোখের নিমিযে ও কিছুতেই নিজেকে ব'দলে নিতে তাই অ-রাজি।

সুশীলও অনেকক্ষণ কোনো কথাই ব'লছে না। কিছু ভাবছে নিশ্চয়ি। ষ্টোভের জোর ক'মে ক'মে ফুরিয়ে গেল।

প্রিয় দু'হাতে দু'টো পিরিচের কাণা ধ'রে চা নিয়ে এলো! পঞ্চমী হাঁটু ভাঁজ ক'রে পা গুটোলো, রাখবার জায়গা ক'রলোঃ রাখো এখানে।

যে-ঠুনকোত্বকে ও ভয় করে, তা ও নিজেই দিলো খান-খান ক'রে।

সুশীল গলাটা খাঁখরে নিলো।

পঞ্চমীর পেয়ালার ঠোঁট দিয়ে চায়ে দিলো চুমুক। সুশীল দেখলো চা-র রঙটা প্রিয় আজ ক'রেছে চমৎকার সুন্দর ঠিক পঞ্চমীর ঠোঁটের মতোই হাল্কা, লালচে। তাই চেয়ে দেখলো প্রতি চুমুকে পঞ্চমীর ঠোটের সঙ্গে চা যাচ্ছে মিশে।

সুশীল হেসে শুধোলো ঃ চা-র রঙটা কেমন হ'য়েছে বলো তো!

পেয়ালা থেকে ঠোঁট সরিয়ে টপ্ ক'রে ব'লে ফ্যালেঃ তোমার চোখের মতো—লালচে।

সুশীল বললো ঘাড় নেড়ে,—নাঃ, ব'লতে পারলে না। আমার মনে হয়—যাক্, আর্শিতে ছাখো তোমার মুখখানা আর রঙখানা! প্রিয় বোঝে কা'কে কি দিতে হয়। সুশীল চুমুক দিতে দিতেই হাসে।

পঞ্চমী বলে,—থাক্, বিষম খাবে আবার।

চা-র শেষটুকু কাপ উল্টে মুখে ঢেলে নিয়ে নেয়। পঞ্চমী আশ্চর্য্য হয়ে যায়ঃ এরি মধ্যে শেষ ক'রে ফেললে? আমার তো আদ্দেকই হ'লো না। পিরিচে ঢেলেনি বাবা, যে গরম!

পঞ্চমী খেলো।

আজকের এ দিনটার প্রতি পল সুশীলের মনে থাকবে। অতীতের কত কথা সে ভুলে গেছে কিন্তু আজকেরটা কিছুতেই ও ভুলবে না। তাই ভাবছে হয় তো।

পঞ্চমী ভাবছে,—সত্যি, দিনটা কাটলো বেশ। এমনি ক'রে যদি তার অতীতের অশ্রুমাখা দিনগুলো কাটতো! কী মধুর, কী চমৎকার! কিন্তু তা'লে সুশীলের সঙ্গে তার ছাখা হবার সুযোগই ঘ'টতো না। দুটোর কোনটা ভালো? আর ভাবতে পারেনা ও। তাই বুকখানা ফুলিয়ে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

বালিশটা থেবড়ে নিয়ে পঞ্চমী আবার হ'লো কাৎ। সুশীল ব'ললো,—আমায় একটু জায়গা দাও।

—শোও না, আর কত জায়গা লাগবে তোমার? তবে আমি মেজের ওপর যাই!

—সেও কি একটা কথার কথা? সুশীল ওইকুটু জায়গাতেই কোনো রকমে শুয়ে প'ড়লো।

ওদের ভাণ্ডারের পুঁজি নিঃশেষ হ'য়ে এসেছে যেন। কথা কইবার কিছুই খুঁজে পাচ্ছে না। কিন্তু সুশীল ব'লেছে তখনঃ কথার শেষ নেই, শেষ আছে সমুদ্রের শেষ আছে আকাশের। পঞ্চমীই ফের প্রথমে কইলোঃ নীরব রইবে কতক্ষণ? কিছু অন্ততঃ বলো আজে-বাজে যা হয়। কথার বলে শেষ নেই?

—কে বলে শেষ আছে? আর একটা গল্প' ব,ললেই তো সময়টা ফুরিয়ে দিতে পারবো। প্রিয়, এই! উনুন জ্বালা, আলোচাল ঘাট তো।

পঞ্চমী ভাবে সুশীল ঠাট্টা ক'রছে তাই হাসে, বলেঃ কি পাগলামি আরম্ভ ক'রেছো? আমি আর-কিছু খাবো না, সোজা গিয়ে উঠ্‌বো ট্রেণ-এ, দুপুরে যা খেয়েছি এখনো গলা ব'লে ঠেলে উঠ্‌ছে।

—না খেয়ে যেতে নেই যে—আমার পক্ষেই অমঙ্গল, তোমারো। তা'হলে দই কলা তাও না? কলায় অ-যাত্রা বুঝি? বেশ দই মিষ্টি খেয়ে নিয়ো, আচ্ছা? সুশীল তাকে রাজি করিয়ে যেন রাজ্যি জয় ক'রলো। সুশীল নিজেকে অনুভব ক'রলো গর্ব্বিত!—তবে, এই প্রিয়! শোন্ এ-দিকে! উনুন পরে জ্বালাস্। পয়সা রাখ্, একটু পরে গিয়ে দই-মিষ্টি আনিস্ আর কচুরি, কি বলো তুমি?

পঞ্চমী ঘাড় নাড়ে।

—যা তবে এখুনি না হয় নিয়ে আয়। কাজ সেরে রেখে দে। আবার যদি অন্য কোনো কাজে লাগিস্।

প্রিয় পয়সা গুণতে গুণতে মাথা নিচু ক'রে বেরিয়ে গেল।

পাড়াময় একটা কোলাহলের সাড়া প'ড়ে গেছে। বাসন মাজার শব্দ খন্ খন্, ঝি দের কলনাদ, কলের জল পড়া সব কিছু মিলে একটা চাঞ্চল্যের আবহাওয়া বানিয়ে তুলেছে। ধোঁয়ায় আকাশের মধ্য পথেই জমাট মেঘ, এঁকে-বেঁকে পাক খেয়ে আকাশ পেতে চায় ওরা—তার-ই তাড়াহুড়ো। ঘুঁটেউলি হাঁকছে চাই ঘুঁটে, বাসনউলিঃ বাসন লেবে গো, পেতলের প্যান এনে'লুম, হাঁকছে দোরে-দোরে। তাদের মাথার ওপর পুরাণো কাপড়ের গাদা, সমস্ত দিনের সঞ্চয়। ঘুঁটেউলি, বাসনউলি,—কে-ও বিলোতে চায় কেও নিতে চায় টেনে,

ছু-জনাদের মাথায়ই বোঝা! জানলা দিয়ে এদের আনাগোনা নীরবেই লক্ষ্য ক'রছে এরা।

ছেলেরা ইস্কুল থেকে ফিরছে। তাও বেশ বুঝতে পারছে। জানলা দিয়ে পঞ্চমী দেখতে পেলো গলিটার ওপারের বাড়ির জানলায় এসে দাঁড়ালে—কে যেন। পর্দা না সরিয়েই দাঁড়ালো। পঞ্চমী ভাবলো,—হয়তো কোনো পুরুষ মানুষ, এদের ছুজনকে দেখছেন। সুশীলকে শুধোলোঃ ছাখো তো কে? ওই জানলায় দাঁড়ালো।

সুশীল মাথা তুললোঃ ওঃ, একটা মেয়ে। তোমারি মতো বিধবা কিন্তু তবু স্বাতন্ত্র্য আছে। বড়ো ছুঃখী মেয়েটা। বয়স আর কতো! তোমার চেয়ে বছর খানেকের ছোটো হবে হয় তো,—এই বছর সতেরো-আঠারো। বড়োই ছুঃখী! সুশীল একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লোঃ এই বয়েসে ও অনেক স'য়েছে।

—যাও, জানলাটা দিয়ে এসো। আমার লজ্জা করে।

—কিসের লজ্জা?

—কিচ্ছুর না। থাক্, আমিই দিয়ে আসচি। পঞ্চমী উঠ্‌তে চায়।

সুশীল আঁচল টেনে ছায় শুইয়েঃ কি মনে ক'রবে বলো তো? থাক্ না! তোমার-ই তো জুড়ি!

—সেই জন্যেই তো! কি ভাবছে ও ছিছিঃ! ছাড়ো দেখি ব'সতে দাও।

গায়ের কাপড় ভালো ক'রে গুছোতে গুছোতে উঠে ব'সে প'ড়লো।

এক-পাল ছেলের হল্লা কানে এসে বাজছে। ধীরে ধীরে পর্দার খানিকটা গেল গুটিয়ে। সুশীল ব'ললো,—ঐ ছাখো। সত্যি, বড্ড

দুঃখ লাগে আমার ওকে দেখে! সুশীল আবার ফেলে একটা দীর্ঘশ্বাস।

ছেলেরা কিচ্-মিচ্ শব্দ ক'রতে-ক'রতে চ'লেছে। মেয়েটি গরাদ দিয়ে মুখ বার করবার চেষ্টা করে যেন মুখ ঘুরিয়ে চায় অনেক দূর পর্য্যন্ত বাঁ-দিকে তারপর—একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেই যেতে চায়, পঞ্চমীর চোখে-চোখে যায় প'ড়ে, কিছুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে চ'লে যায়।

চৈতীর কথা আবার ওর মনে প'ড়লো, কুমারীর কথা, আর নিজের। কার সঙ্গে ওর মিল? সুশীলকে জিগ্‌গেস ক'রতে ভরসা হয় না, কি বলবে কে জানে! যুগযুগান্তরের সঞ্চিত মালিন্য যেন মেয়েটির একার দখলে, সমস্তটুকু তার ও স্থান দিতে পারে না ওই মুখটার ওপরে। জগতের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকিঞ্চন কে যেন কেড়ে নিয়ে গেছে ওর কাছ থেকে, ওর আঁচলের গেরো খুলে জীবনের পাথেয় কে যেন লুট ক'রেছে। ছেলেরা যখন যাচ্ছিলো পথ বেয়ে ওর চঞ্চল চোখের তারা দু'টো পঞ্চমী লক্ষ্য ক'রেছে। কি যেন খুঁজছিলো ও। তরল করুণা পঞ্চমীর চোখের কোনে জ'মে উঠ্‌লো। জীবনের দুর্গম পথ যে ক'রেছে অতিক্রম, তার গূঢ় তত্ত্ব তার-ই বেশি জানা আর যারা জানে তারা শুনে জানে না-হয় প'ড়ে। এ শোনা-পড়ায় কতটুকু বোঝা যায়? পঞ্চমীর চোখে আরো জল এলো। আজ তার জীবনের একটা শুভদিন, সেই শুভমুহূর্ত্তেও বুকের ভেতর কান্না শুধু হাহুতাশ! পঞ্চমী আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখটা র'গড়ে নিলো।

একদা

সুশীল শুধোলো, চোখে হ'লো কি ?

হঠাৎ স্বপ্ন যায় কেটে, জবাব ভায়ঃ নাঃ, কিছু না তো ! সজল কণ্ঠস্বর তার !

পঞ্চমীর বিয়ের দিন সাত পরে যখন ওর স্বামী ঘরোয়া কাজে কিছুদিনের জন্যে বিদেশ গিয়েছিলো, সেদিন কতটা ব্যথা পেয়েছিলো তাই ভাবছে। সেদিন চোখের জল বার-বার গোপন করবার ক'রেছিলো অসাধ্য চেষ্টা তারপর বিদায় দিয়েছিলো। দিন দুই পরে যখন তার স্বামীর সম্বন্ধেই দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙলো ভোরে, তখনই বা ওর মন কতটা চঞ্চল হ'য়েছিলো, পঞ্চমী তাই ভাবছে। সে স্বপ্ন সহ্য করবার মতো সামর্থ্য পঞ্চমী জোটালো কেথেকে ? জীবনটাই অদ্ভুত। তারপর তা'র স্বামীকে যে-দিন দিয়ে এলো চিতায় শুইয়ে, নিজের সিঁথের আর কপালের গনগনে আগুন দিয়েই চিতা জ্বালালো— সেই সব দিনের কথাই পঞ্চমী ভাবছে। একটা নিরর্থক দুঃস্বপ্ন কি ক'রে সহ্য ক'রবে পঞ্চমী সেদিন ভেবে পেয়েছিলো না কিন্তু যখন তার স্বামীর শেষ হ'লো,—দিব্যি হজম ক'রেছে তো সে মর্মবেদনা ! স্বপ্নটাই সহ্য করা যায় না যেটা অবাস্তব কিন্তু বাস্তব যেটা তা সহ্য হয় !

মেয়েটি পঞ্চমীকে মুহূর্ত্তের মধ্যে ঘুরিয়ে নিয়ে এলো সুদূর তারকালোক থেকে, যেখানে শুধু তারার হাসি আর আলোর ছায়া পথ— যেখানে ছায়াও উজ্জ্বল।

একদিন টাঙ্গাইলেই বাসার পাশের মাঠটা দিয়ে কৃষক মাঠো সুরে গান গেয়ে যাচ্ছিলো হারানো প্রিয়ার উদ্দেশেঃ

বল্‌লি কিনা দিবি, কাঙ্কি ?
তখন দিনি আজ যে আনছি
নিয়ে যা তোর গয়না
ময়না—

সেদিন জানলায় কান পেতে পঞ্চমী অনেকক্ষণ শুনেছিলো। অন্তরের নিঃশব্দ বেদনা যন্ত্রণার প্রেরণায় সশব্দ সুরের রূপে ফুটে উঠেছিলো, কৃষাণীর উদ্দেশে তাই কৃষক করছিলো উৎসর্গ, পঞ্চমী শুনছিলো ! যতক্ষণ শেষ রেশটুকু সান্ধ্য আকাশের গায়ে ধ্বনিত হচ্ছিলো, স্তনিত হ'চ্ছিলো, পঞ্চমী ঠায় ছিল ব'সে। তারপর সুদূর তালবনের ধারে বাঁক নিতেই গেল সুর নিভে, পঞ্চমী কাজে গেল!' সেদিনো পঞ্চমীকে একবার অতীতের দুয়ারে নিয়ে গিয়েছিলো আর আজ গেল নিয়ে। পঞ্চমী তাই ভাবছিলো।

সুশীল চোখ বুজে চুরুট টানছে একমনে। সে কি ভাবছিলো বলা কঠিন। সুশীল চোখ চাইলো, দেখলো পঞ্চমী নিঃশব্দে ব'সে আছে কি যেন ভাবছে একমনে গলিটার পানে চেয়ে।

সুশীল ব'ললো ঃ কি, চুপ ক'রে ব'সে যে! গাড়ি পাবে, পাবে! এত দুর্ভাবনার কি হ'য়েছে ? প্রিয় আসে নি ?

—তুমিও যেখানে আমিও সেখানে কি ক'রে জানবো বলো! ঔদাস্যের আবহাওয়ায় ব'সে পঞ্চমী জবাব দিলো।

সুশীল হাঁকলো ঃ প্রিয় এসেছিস্ ? এই প্রিয়, প্রিয় !! নাঃ হারামজাদার জ্বালায় আর পারা গেল নাঃ। এতক্ষণ ক'রছে কি ? ও-বাসায় একবার পাঠাবো ঠিক করেছি।

—কোন্ বাসায় ?

—ঐতো ঐ টে। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো জানলার ওপাশের বাসাটা !

—মেয়েটার নাম কি জানো ?

—জানবো না কেন ? এতো কাছে থেকেও জানবো না ? শ্বাশুড়ি ডাকেন : উড়োনচণ্ডি, আর ও নিজেকেই নিজে মনে-মনে ডাকে : রাক্ষুসী, আর আমি জানি ওর নাম মানসী।

পঞ্চমী শুধোয় : নিজেকে নিজে মনে-মনে ডাকে মানে ?

সুশীল বলে,—আবার মানে ? তার মানে ওকে ডাকবার কেউ-ই নেই, নিজেক নিজে ছাড়া।

পঞ্চমী প্রতিধ্বনি করে : মানসী !

সুশীল বলে : কেমন নামটা ? আমার তো মন্দ লাগে না ! চমৎকার।

—কি ক'রে জানলে ওর নাম তুমি ?

—তোমারটা যেমন ক'রে—জিগ্‌গেস ক'রেছিলাম।

পঞ্চমী আশ্চর্য্য হ'য়ে যায় : ব'ললো ?

—কেন ব'লবে না শুনি ! যার মনে ময়লা সে বাইরেটা রাখতে চায় চকচ'কে কিন্তু...পঞ্চমী একটু ম্লান হাসি হাসে : আর মনের ময়লার কথা তুলো না। ঢের হ'য়েছে।

সুশীল হাসে : তাই নাকি ? তুমি যে খুব কথা শোনাতে শিখেছো দেখছি। মনে যে ময়লাটা থাকে মানে, সব্বার মনেই অল্প-বিস্তার আছে, কেও অস্বীকার ক'রতে পারবে না তা কি সব সময়ি প্রকাশ পাবে ? ময়লা না থাকলে মানুষি না, কিন্তু সে-ই অমানুষ যার ভাগে পরিমাণটা

বেশি। আর, আরাক-কথা আমরা এটাকে ময়লাই বা ব'লবো কেন? তেমন হ'লে তার ভেতর মালিন্য কই, শুধু ঔজ্জ্বল্য। কিন্তু ওই যে ব'ললাম অতিরিক্ত ঔজ্জ্বল্যের সমাবেশে মালিন্য এসে প'ড়বে। যাই হোক আমার মন ময়লা যদিই বা হয় কিন্তু মানসী আমায় নির্ম্মলতা দেখিয়ে গ'ড়ে তুলেছে সুনির্ম্মল ক'রে! তা-কে আমি শ্রদ্ধা করি, ভক্তি করি!

পঞ্চমী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফ্যালে : ভক্তি করো? সত্যিই প্রাপ্য! এ-টা যে ন্যায্য অধিকার!

—অধিকারের কথা তুলোনা। ভক্তি ক'রে থাকি, প্রাপ্য কিনা তা-ও জানি না। সুশীল বলে।

পঞ্চমী ফের বলে,- প্রাপ্যই যদি না হবে, কেন করো?

— ভুল। তার প্রাপ্য না হ'লেও যদি আমার কর্ত্তব্য হয় করা, করবো। সেখানকার বিবেচ্য শুধু কর্ত্তব্য! আমার মনে হয় মানসীকে শ্রদ্ধা করা, ভক্তি করা আমার একান্ত কর্ত্তব্য তাই এই একান্তে ব'সে ত'ার নির্য্যাতনের কথা স্মরণ ক'রে, শুনে, তার উদ্দেশে নীরব নিরাড়ম্বর ভক্তি ক'রে থাকি মনে-মনেই। মানসী তা জানেও না! আমার ভক্তি মানসী পায় না, পায় আর নির্য্যাতিত অন্তর! সেইটাই তার দাবির বেদীমূল থরে-থরে আমার নিরাকার অর্ঘ্য গিয়ে পৌঁছে গেছে স্তূপীকৃত হ'য়ে—মানসী হয় তো অনুভব করে। সুশীল থামলো।

পঞ্চমী আরো বলে : পুরুষদের আমি বিশ্বাস করিনা। আজ তারা যাকে সম্মান ত্যাখাচ্ছে, ভক্তি ক'রছে কাল তারাই তাকে ক'রবে অপমান, লাঞ্ছনা!

—মেয়েদের ওপর আমার ধারণা যে ভালো হ'য়ে যাচ্ছে তা মনে ক'রোনা পঞ্চমী! তুমি যা-সব ব'লছো তা সব-পুরুষেই কি খাটে? আর সব নারীই কি সতী? ও-সব কি ব'লছো তুমি! তোমার কথা শুনে আমার একটা ধারণা হ'য়ে যাবে যে মেয়েরা পুরুষের দোষ ছাড়া ছাখেনা—তাদের মাকড়শাবৃত্তি আরম্ভ হ'য়ে গেছে, ফুল থেকে শুধু বিষটুকুই সংগ্রহ করে তারা।

পঞ্চমী আর কথা বলে না! সুশীল তাকে থামিয়ে তুলেছে। পঞ্চমী বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো—কি ভাবছে ও? সুশীল উঠে ব'সেছে।

আবার ডাকলো: প্রিয়, এই প্রিয়! গেলো কোথায়, দিন-দিন যা আক্কেল হ'চ্ছে! এই প্রিয় হারামজাদা!

রাগে জ্বলতে জ্বলতে ঘর থেকে বেরুলো!

পঞ্চমীও উঠে ব'সেছে। ফাঁকা ঘর একান্ত নিরালা! হকার হাঁক দিয়ে যাচ্ছে পথে অদ্ভুত রকম গলায় স্বর ক'রে। পঞ্চমী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা-ই দেখছে। মানসীর স্পষ্ট মূর্ত্তিটা ও দেখতে চায়। যদি বেরোতো একবার। পর্দ্দার আড়ালে হয় তো দাঁড়িয়ে পঞ্চমীকে দেখছে কিন্তু পঞ্চমী তাকে দেখতে পাচ্ছে না।

পঞ্চমীর আপশোষ বেড়ে উঠ্‌ছে ক্রমেই। যাবার সময় তো প্রায় ঘনিয়ে এলো, বিকেল তো হ'য়ে গেছে অনেকক্ষণ! ফিরে এসে হয়-তো দেখবে সুশীল এ-বাসা ছেড়ে গিয়েছে,—মানসীর সঙ্গে ওর ছাখা হ'লো না বোধ'য়। চীৎকার করে একটা বিকট আওয়াজ ক'রলে মানসী বেরিয়েও আসতে পারে।

সুশীল গোঁ-গোঁ ক'রতে ক'রতে ঘরে ঢুকলো : না ; প্রিয়কে পাওয়া গেলোনা। কোন আড্ডায় গিয়ে জুটেছে কে জানে! মানসীর কাছে পাঠাবো!

—কেন? মানসীর কাছে?

—দরকার আছে। সুশীল টেবিলের সুমুখে গিয়ে ব'সলো।

পঞ্চমীও ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো জানলায়।

সুশীল ডাকলো,—এদিক এসো, নাও ব'সো চেয়ারে, আমি টুল্ টেনে বসচি।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে প'ড়লো, পঞ্চমী নীরবেই এসে ব'সলো। যাবার বেলা এ-কথাটা আবার সুশীলের না ব'ল্লেই হ'তো! এতগুলো হাবিজাবির একাকার-হ'য়ে-যাওয়া একটা চিন্তা পঞ্চমীর বুকে হাতুড়ি পিটুছিলো।

মানসীর সাথে সুশীলের পরিচয় আজ বছরখানেক আগে। সুশীল যাচ্ছিলো বিকেলে ডানদিকের পথটা দিয়ে কাজে। সময়টা ঠিক আজকের মতো এমনিই। ছেলেরা ইস্কুল থেকেই ফিরছিলো! গলির ঐ মোড়ে কর্পোরেশনের ফ্রী প্রাইমারী পাঠশালা।—ঐখানে তারা পড়ে। কাঁধের ওপর দিয়ে বইর ব্যাগের ষ্ট্র্যাপ ঝুলিয়ে হাত দুলিয়ে দুলিয়ে তারা ঘরে ফিরছিলো—তাদের মা-র স্নেহের আকর্ষণ তাদের টেনে নিয়ে যায়। দুলাল হোঁচট খেয়ে হুমড়ি খেয়ে প'ড়ে যায় পথে, সুশীল এগিয়ে গেল তাকে ধ'রে তুলতে। তার কানে এসে বেজেছিলো মৃদু করুণ চাপা আর্ত্তনাদ। সুশীল না থাকলে চীৎকার ক'রে হয়তো ডুকরে উঠ্‌তো কেঁদে কিন্তু ক্রন্দনের সে মুখে সুশীল হাত চাপা দিয়ে থামিয়ে দিয়েছিলো।

জানলার পানে চেয়ে সুশীল দেখলো সকম্প দু'টী ক্ষীণ বাহুর ইসারায় ডাকা দুলালকে, দুলাল কেঁদে উঠলো—মা।

সুশীল শুধোয়ঃ এই বাসা বুঝি তোমাদের? তারপর হাত ধ'রে এগিয়ে নিয়ে দরজার সমুখে নিয়ে আসে; মানসীও এসে প'ড়েছে সেখানে। দরজার আড়াল থেকে হাত বাড়িয়ে দুলালের হাতখানা ধরে—সে আকর্ষণের মধ্যে কাতরতা আছে, সুশীল ক্ষণেকেই তার আভাস পেয়ে গেছে!

কথা না ব'ললেও বে-মানানো ঠেকতো না, সুশীল তবু ব'ললো,—বেশি লাগেনি! হাঁটুটা ছ'ড়ে গেছে একটু আয়োডিন লাগিয়ে দেবেন সেরে যাবে।

মানসী এগিয়ে প'ড়েছিলো—সেই জীবনে সর্ব্বপ্রথম সুশীলের মানসে মানসীর প্রতিমুর্ত্তি অঙ্কিত হ'লো।

—আচ্ছা এসো খোকা! আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। দুলালকে নিয়ে গিয়ে সুশীল তার ঘর থেকে লাগিয়ে দিলো। কষ্টসহিষ্ণু দুলাল মুখে একটু শব্দ করেনি যন্ত্রণার; মুখে শুধু, সুশীল লক্ষ্য ক'রেছিলো, বেদনার একটা ইঙ্গিত। জিগগেস্ করলোঃ জ্বালা ক'রছে? দুলাল অনেকটা ঘাড় হেলিয়ে দিলো।

—তবে বললে না কেন? সুশীল শুধোয়!

বছর চারের বাচ্চা খোকা তার মুখে এমন কথা শুনে সুশীল আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলো, দুলাল বললে একটু হেসে,—ব'লতে নেই! মা যে কিছু বলে না!

মা-র কোনো দিন কেটে গিয়েছিলো কিনা সুশীল জানে না,

কিসের কথা মা বলে না সুশীল জানতে চাইলো : তোমার মা কি বলেন না ?

দুলাল ফিক্ ক'রে হেসে ফেললে : ইঃ বলবো কেন ? মা বারণ ক'রেছে, লাগলে বলে কাঁদতে নেই। কাঁদলে সারতে দেরি হয় !

দুলালকে সুশীল হাত ধ'রে নিয়ে গেল ফিরিয়ে দিতে। মানসী তখনো মুখের সমুখে কবাটের অবগুণ্ঠন টেনে দাঁড়িয়ে, সংক্ষেপে সুশীলের উদ্দেশে শুধু কৃতজ্ঞতা জানালো : ধন্যবাদ আপনাকে !

—ছিঃ ছিঃ, ধন্যবাদের কী হ'য়েছে ? সুশীল দিয়েছিলো প্রত্যুত্তর !

'ব'লতে নেই' কথাটা সুশীলকে কতবড়ো একটা উপদেশ দিয়ে গেল—আশ্চর্য্য ! সুশীল এখন বোঝে মানসী নিজের মতো ক'রে দুলালকে বানিয়ে তুলেছে ! যে তার জীবনের শাশ্বত ধ্রুব তারা, যার ওপর তার ভবিষ্যতের আশা আকাঙ্ক্ষা ; যে তার ভরসা স্থল তাকে মানসী তৈরি ক'রবে মনের মতন করেই। দুলালকে কেন্দ্র ক'রেই যা'র জীবনের মহাসমুদ্রে ভেসে বেড়ানো, তাকে মানসী নিজের মনের মতন ক'রেই গ'ড়ে তুলবে। 'ব'লতে নেই' এই দুটী মাত্র কথার মধ্যে কেন্দ্রীভূত হ'য়েছে মানসীর সন্তাপ !

সুশীল সেদিন চ'লে গিয়েছিলো কাজেই। কিন্তু এর-ই ভাবনা তাকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলেছিলো। প্রতিপদে সেই দু'টী কথার আঘাতে সে জড়ো-জড়ো হ'য়ে উঠেছিলো।

পঞ্চমী কথা কইলো : মানসী আর বুঝি আসবে না ? এই এখানে, জানলার সমুখে। দেখতাম মেয়েটাকে।

—কী দেখবে ওর ? দেখবার আর কী আছে ? রূপ ? দেখলে বোঝা

যায় একদিন তা ছিল কিন্তু দুঃখের দাহে ধোঁয়া হ'য়ে উড়ে গেছে, আছে শুধু ছাই টুকু। তা আর দেখো না! সুশীল মুখখানা মলিন ক'রেই গেলো থেমে!

পঞ্চমী জিগগেস করে,—প্রিয়কে ওর কাছে পাঠাবে কেন?

—কাজ আছে। মাঝে-মাঝে প্রিয় ওদের দু'চারটে ফরমাস খেটে ছায় কিনা, তাই ওর আনা-গোনাও আছে, সুবিধেও হ'য়েছে একটু। শ্বাশুড়ি ঠাকরুণটির জ্বালায় ওর প্রাণ গেল! মানসীর কাছে জেনে পাঠিয়েছিলাম তার অতীতের একটা তুলি চিহ্ন—এক সপ্তাহ হ'য়ে গেছে, আজ দেবে হয় তো লিখে। সময় ক'রে লিখবে প্রিয়কে ব'লে দিয়েছে গোপনে, তাই। সুশীল বাইরের দিকে চাইলো।

পঞ্চমী আরো শুধোয়: কে কে আছেন ও-বাসায়?

—ও নিজে, জা-ভাসুর ইত্যাদি কে-কে যেন! সুশীল সব কথার জবাব স্পষ্ট দিচ্ছে না, দুর্ভাবনার বহ্নি ওর মর্ম্মতলে জ্ব'লে জ্ব'লে উঠ্‌ছে!

এই, প্রিয় এসেছে।

সুশীল টুল ছেড়ে লাফিয়ে উঠ্‌লো। পঞ্চমীর বুক কাঁপছিলো—কিছু অনাথ না ক'রে বসে। বাইরে গিয়ে ডাকলো—এই প্রিয় শোন্, এ-দিক আয়! গিসলি কোথায়? এত দেরি করে? রাখ্ দই-মিষ্টি ঘরে। শুনে যা, ঢেকে রাখিস্ কিন্তু, বেড়ালে মুখ না ছায়।

সুশীল ঘরের মধ্যে ফিরে এলো। বুকের পেন্‌টা পাকিয়ে নিব্ তুলে এক টুকরো কাগজে লিখলো হিজিবিজি ক'রে: লেখা হ'য়ে থাকলে দিয়ে দিয়ো।

প্রিয় খাবার ঢেকে-ঢুকে এসে ঘরে ঢুকলো। বাবুর টেবিলের ধারে

এসে দাঁড়ালো ! হাতের ছোট্টো কাগজের টুকরোটা প্রিয়কে দিয়ে ব'লে দিলো : উত্তরটা আনবি। যা !

কাগজ ভাজ-করে হাতের মধ্যে গুঁজে প্রিয় গেল চ'লে।

পঞ্চমী শুধোলো : প্রিয় কিছু ভাবে না।

— ভাবে। ভাবে—বাবু লোক ভালো।

—কেন ? ভালো ভাববার কারণ ? গোপনীয় চিঠির আনাগোনা আর—ও কিছু.........

সুশীল ঘাড় দুলিয়ে জবাব ছায়, না : প্রিয় বোঝে সব। ও-ও আমার কাছে এসে নালিশ জানায় না ভেবেছো ? আর প'ড়তেও তো জানে, পড়ে নি কি ?

পঞ্চমী শুধোলো : প্রথম দিন তোমার সঙ্গে ওর জানা হ'লো কি ক'রে ?

সুশীল সব বললো না, বললো,—সে অনেক কথা, আজ আর সময় হবে না সব খুলে বলবার, ফিরে এসে শুনো।

—কিছু অন্ততঃ বলো ! নইলে.........।

সুশীল বাধা দিয়ে বলে,—চিঠিটার জবাব আসুক কিছু জানা যাবেই ! মিও তো প'ড়ে নিতে পারবে !

পঞ্চমী একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়লো। ভোর হ'য়েছে কুমারীর দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে, সন্ধ্যে হ'য়ে এলো মানসীর হা হুতাশে—প্রিয় হয় তো চিঠিটা নিয়ে আসবে যার দুপিঠে মাখা শুধু কাতর ক্রন্দন আর দুঃসহ মর্ম্ম বেদনা ! পঞ্চমী উঠ্‌লো : যাই, দেখি প্রিয় কাপড়টা মেল্‌লো কোথায় ? গুছোই !

—থাক্ না, প্রিয় এসেই দেবে। আমরা প'ড়তে পড়তেই ও সব ক'রে দেবে ফিট্-ফাট্। ব'সো। সুশীল পঞ্চমীকে বসিয়ে ছাড়লো!

ব'সে থেকে এ-সময়টা ওরা কাটিয়ে দেবে। সুশীল কি পঞ্চমী কেও কথা ব'লছে না।—পঞ্চমী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গলিটা দেখছিলো কিন্তু যার আশায় উঠে গিয়ে দাঁড়ালো সুশীলের বার-বার ব'সতে বলা সত্বেও, সে-তো এলো না।

গলি দিয়ে ঝাঁঝালো গলায় হেঁকে গেল 'বেল-ফুল', এই সামঞ্জস্য যেমন অদ্ভুত, পঞ্চমীর মনে আর বাইরের ঘটনার সঙ্গেও ঠিক তেমনিই। বেলফুলের গন্ধর আমেজ হাওয়ায় দুলে দুলে পঞ্চমীর নাকের কাছে এলো কিন্তু পঞ্চমী তা'কে বরণ ক'রতে পারে নি। মানসের মকরন্দ ও চায় শেফালীর হাসি।

ঘরের মধ্যে অন্ধকার চোরের মতো চুপি চুপি ঢুকছে! বাইরে সড়কে সন্ধ্যে হবার অনেক আগেই সুশীলের ঘরে হয় রাত দুপুর। কিন্তু এ অন্ধকারের সঙ্গে নিস্তব্ধতার মিতালি পঞ্চমী খুঁজে পেলো না। গলি দিয়ে হাজার -রকমের হাঁকাহাঁকি, ডাকাডাকি, জমজম ক'রছে।

প্রিয়তম এতক্ষণ নিশ্চয় রোয়াকে দাঁড়িয়ে মানসীর শাশুড়ির সঙ্গে গল্প ক'রছে—আজেবাজে। মানসী ঘরের আলো-আঁধারিতে হাতড়ে হাতড়ে অক্ষর খুঁজছে তার আত্মজীবনীর! না-হয় কাগজ খানা কোন ঘুঁজির থেকে খুঁজে টেনে বার্ ক'রছে,—তাকে জ্বালাতন করবার কেও নেই এখন,—দুলাল আঁচল ধ'রে টানে না! মানসীর বুকখানা দংশাচ্ছে কে? তা মানসী খুব ভালো ক'রেই জানে।

প্রিয় ফিরে এলো।

হাতের চিঠিটা সুশীলের দিকে এগিয়ে ধ'রে বললো : নিন্ বাবু!

সুশীল এতক্ষণ টেবিলের ওপর মাথা রেখে এলিয়ে প'ড়েছিলো—কি ভাবছিলো তা ও নিজেই জানে। হয় তো মানসীর কথা, না-হয় পঞ্চমীর! আজ বহুদিন পর যার সঙ্গে ছাখা, ক'য়েক ঘণ্টার ক্ষণিক মিলনের পর তাকে বিদায় দিয়ে আসতে হবে!

সুশীল মাথা তুলে প্রিয়র হাত থেকে চিঠিটা প্রায় কেড়ে নিলো। পঞ্চমী এসে চেয়ার নিয়েছে—সবুজ-রঙা লোহার চেয়ারখানা।

সুশীল চেয়েছিলো বটে, একটা সংক্ষিপ্ত জীবনেতিহাস মানসীর, কিন্তু এতটা সংক্ষিপ্ত তা ও ভাবে নি। প্রিয়কে ডেকে ব'ললো : ঐ কাপড়টা গুছো।

প্রিয় গেলো বেরিয়ে।

পঞ্চমী বল্লো,—নাও, পড়ো এবার। দেখি বাঃ, দিব্যি হাতের লেখা! সুশীল উল্টে-পাল্টে শুধু অনুভব করছিলো, এবার ভাজ খুললো :

আপনি আমার কাছে একটা সংক্ষিপ্ত গত-জীবনের ইতিহাস চেয়েছেন। কিন্তু এ চাইবার ভেতর কত বড়ো প্রাণের আগ্রহ আর আকাঙ্খা আছে আমি জানিনা, আর কেনই বা চেয়েছেন তাও লেখেন নি। কিন্তু এটুকু বুঝতে পেরেছি আমার দুলালকে যে ভালোবাসে তার প্রাণের মহত্ব আছে—তাকে আমি মহৎ ব'লে ভক্তি করি! আপনি তাকে ভালোবাসতেন আমি অনুভব ক'রেছি! সেই দাবি আমার আমার কাছ থেকে জোর ক'রে এই দুটী কথা ছিনিয়ে নিতে পারে, তাই লেখা! ইচ্ছা ছিল না যে দি। কিন্তু দু'দিন ধ'রে ভেবে দেখেছি আপনাকে দে'য়া আমার কর্ত্তব্য কারণ হয়তো এতে আপনার কোনো

কাজে আসবে—আমার জীবন যতই লঘু, ক্ষুদ্র হোক না কেন কিন্তু যে চেয়েছে তার কাছে নিশ্চয় বিরাট কিছু হবে তাই লিখছি। অন্ধকারে ব'সে লেখা, যদি বুঝতে না পারেন, অক্ষরে অক্ষরে যদি মিশে গিয়ে থাকে সেটুকু আপনি পূরণ ক'রে নেবেন অনুগ্রহ ক'রে। অনেক আজে-বাজে কথা যদি দুঃখে লিখে ফেলি কিছু মনে ক'রবেন না যেন! ভেবে নেবেন, যে লিখেছে সে মানবী নয় দানবী। যদি দানবীই না হ'বো তবে চিবিয়ে চিবিয়ে দু'টোকে গিললাম? (মানসীর চোখ দিয়ে নিশ্চয় অশ্রু গড়িয়েছিলো, পঞ্চমী শুধোলো: এ নিশ্চয় চোখের জল, চিঠির গায় হ'লদে জলের ছিট্ দেখে)।

আজ বছর ছয় আগে আমার বিয়ে হয়। তখন আমি কতটুকু। সে দিনটার কথা আব্‌ছা-আব্‌ছা মনে আসে—ভারি অস্পষ্ট, ক্ষীণ! সানাই-র সুর শুনলে ঈষৎ গাঢ় হ'য়ে ওঠে যে ছবির রঙটা। বাবা ভালো-বাসতেন, একমাত্র মেয়ে তাঁর আমি, ঠাকুরদা নাত-জামাই দেখে চোখ বুজতে চাইলেন তাই সাত্-তাড়াতাড়ি ক'রে আমার বিয়ে হয়। সেই ছ-বছর হ'লো ঢুকেছি এই বাসায়—খুনী-বন্দিনীর মাতা আজ অবধি এখানেই আটক আছি। কী দুঃসহ অন্তর্বেদনায় দিনগুলো কাটে তা আর না-ই লিখলাম! আর লিখবারও সামর্থ আমার নেই—সে ভাষার সৃষ্টি আজও হয় নি।

সেই বন্দিনী আমি—সত্যি খুনী আমি, আমি খুন ক'রেছি—(হ'লদে দাগ চিঠির ওপর) পলে-পলে আমার জীবন বিন্দু-বিন্দু ক'রে চুয়াচ্ছে আমি মরবার পথে এগিয়েই চ'লেছি—সঙ্গে সঙ্গে যমের সিংহাসনো পিছু হ'টছে, নইলে আজ অবধি নাগাল পেলাম না কেন?

সেই ছ-বছর আগে আমি এসেছি এখানে। বড়োঘরের মেয়ে এসে প'ড়লাম হেথায়—তা থেকে আমার গর্ব্ব নেই, তা'র জন্যে আমার দুঃখ নেই এক কণিকা। কিন্তু দুঃখ হ'চ্ছে অন্য থেকে! স্বামী আমায় ভালো-বাসতেন প্রাণ দিয়েই। এ সব কথা লিখতে লজ্জা হয়, তবু লিখলাম। বছর না ঘুরতেই তাঁর সঙ্গে আমার হ'লো চির-বিচ্ছেদ। তাঁর মরণো অদ্ভুত। জোতের কাজে শ্বশুর মশায় পাঠালেন দেশে মানে বরিশালে। গিয়ে পৌঁছে সংবাদ দিয়েছিলেন—আমার কাছেও একটা, কিন্তু সেই চিঠি যে তাঁর শেষ দে'য়া তা-তো জানতাম না! লিখেছিলেন, এখানকার কাজ সেরে ঝালোকাটি যাবো জায়গাটা দেখতে, নাম শুনিছি, দেখিনি তো, দিন দুই পরে শ্বশুর মশার কাছে আরাকখানা চিঠি আসে, তা-তে লিখেছিলেন আজ রওনা হচ্ছি ঝালোকাটিতে সেখান থেকে দিন তিনের মধ্যেই যাচ্ছি। যে বৈশাখে আমার সিঁথেয় সিঁদুরের রক্তচিহ্ন পড়ে এ তারই পরের ফাল্গুনের ঘটনা।

প্রায় পনোরো দিন কাটলো তাঁর কোনো সংবাদ পাওয়া গেল না। আর সংবাদই বা নেবে কার কাছ থেকে—কোথায় গিয়ে উঠেছেন জানান নি তো। ভাসুর তখন পাটনা, দেওর থাকে রুর্কি—সেখানে পড়ে, এখানে পুরুষের মধ্যে শুধু শ্বশুর—তিনি বার্দ্ধক্যে অর্দ্ধ পঙ্গু, তিনিও যেতে পারেন না খোঁজে, মহাবিপদ! সে মহাসমস্যার মধ্যে আমার দিনগুলো কী-ভাবে কাটতো অনুভব ক'রে নেবেন! লিখবার সামর্থ্য আমার নেই। আমার সামর্থ্য ছিল শুধু কাঁদবার—তা কেঁদেছিলাম, কিন্তু প্রাণ খুলে চীৎকার ক'রে আজ অবধি কাঁদতে পারিনি এই যা দুঃখ! যাক্। তার পর একখানা চিঠি এলো ঝালোকাটি থেকেই; পেয়েই প্রাণের ভেতরটা

উঠ্‌লো বিষম অস্থির হ'য়ে। কিন্তু সে অস্থিরতা যে খুবই কম এর পক্ষে প্রথম মুহূর্ত্তে তা বুঝতে পারি নি। চিঠিখানা কোনোরকমে প'ড়ে শেষ ক'রেই শ্বশুর উঠলেন চেঁচিয়ে শ্বাশুড়ি কিছু জিগ্‌গেস না ক'রেই তাঁকে জড়িয়ে ডুক্‌রে উঠলেন কেঁদে। জা এলেন উনুন থেকে কড়াই ঠাস্‌ ক'রে নামিয়ে দৌড়ে, আর আমি? আমি স্থির নিশ্চল হ'য়ে দাওয়ার এসে বসলাম। ভেতরটায় এমন আগুন জ্বলছিলো চোখ দিয়ে এক ফোঁটা জল বেরোলো না, এর চেয়ে কান্না শত সহস্র গুণে ভালো,—বুক যাতে হাল্কা হয়। অস্ফুটে শুধু তা-কে শুধোলাম, দিদি, এ কি হ'লো! কিন্তু কোন উত্তর পাইনি তাঁর মুখ থেকে, তিনি আমাকে জড়িয়ে ধ'রে শুধু কাঁদলেন আমায় দিলেন সান্ত্বনা: কী আর হ'য়েছে বোন্! তখন দিদিও ছিলেন ভালো আর এখন? থাক্ সে কথা!

সংবাদটা হচ্ছে: তিনি নাকি সেখানে গিয়ে জ্বরে পড়েন। তিন দিনের জ্বরেই হঠাৎ শেষ হন। কিন্তু এ মর্ম্মান্তিক সংবাদ দেয়া অসম্ভব ব'লেই এত দেরী ক'রে দেয়া হ'লো।

কে লিখেছে শ্বশুর-মশায় তাকে চেনেন না। তার নামো শোনেন নি জীবনে।

স্বামীর ডায়রির পাতায় বাসার ঠিকানা দেখে কোনো দুর্বৃত্ত সংবাদ দিয়ে থাকবে। তাঁর কাছে আদায়ের হাজার খানেক টাকা ছিল—সে লোভসংবরণ-ক'রতে না পেরে কে এমন ক'রে তাঁকে জবাই ক'রলো কাকে সে-কথা শুধোবো? তাঁর মৃত দেহখানাও যদি পেতাম—সেই নিঃসাড় চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েও প্রাণ কিছুটা অন্ততঃ ঠাণ্ডা হ'তো! হয় ত তার ক্ষত-বিক্ষত দেহ শেয়াল কুকুরে মিলে ছিঁড়ে ছিঁড়ে

টুকরো-টুকরো ক'রেছে, দাগার ওপর তারা নিষ্ঠুরের মত ক'রেছে অত্যাচার, চোখ দু'টো উপড়ে নিয়ে গেছে শকুনে (চোখের জলের হলুদে দাগ এখানে)। অসুখ হ'য়ে হয় মরণ, মনের সান্ত্বনা থাকে কিন্তু নিজেকে কি ব'লে প্রবোধ দি বলুন তো! তাঁর খোজ-খবর আজও করা হয়নি, ব'সে আছি নির্ব্বিকার! আমরা সবাই জানি তিনি ইহলোকে নেই, কিন্তু কেমন ক'রে নেই তা তো সঠিক জানি না। মানুষের জীবন এতটা ঠুকনো কোনো দিন জানতাম না! একটা কালির হরফের উপর যার সত্যতার আস্থা সে কতটুকু দামি? কাঁচের বাসনের মতো ভঙ্গুর সবার জীবন তা জানি! কিন্তু পিরিচ হাত থোকে প'ড়ে ভাঙলে শব্দ শুনেও লোকে শুধোয়ঃ কি ভাঙলো, কেমন ক'রে ভাঙলো আর ভাঙলো কে? স্বামীর জীবন পিরিচের চেয়েও সস্তা! যার কৈফিয়ৎ চায় নি কেউই! আপনি হয়তো ভাববেন—না এ জিগ্‌গাসার বাইরে! আমার উত্তর জেনে রাখবেনঃ সৌরজগতে যা-ই জিগগাসার বাইরে, তার সম্বন্ধে একটা বিস্ময় আছে; লোকে জিগ্‌গাসা করে না সত্য কিন্তু আলোচনা করে, আশ্চর্য্য হয়। কিন্তু তার কিছুই তো এ অন্দরে আমি লক্ষ্য করি নি! আপনি আমায় কুটিল সাব্যস্ত ক'রবেন না যেন আপনার দোহাই! যাক্!

স্বামীর মৃত্যু-সংবাদ আমার সিঁথের সিঁদুর, হাতের লোহা, পরণের রঙিন শাড়ী সব কিছু ছিনিয়ে নিলো, কিন্তু তাঁর মৃত্যুই নিয়েছিলো কি না জানি না! এ-সবের ওপর দাবি তাঁরই, যে ন্যায় পাবার অধিকার শুধু তারই তাই তিনিই নিলেন! গঙ্গার ঘাটে গিয়ে গঙ্গার জলে সমস্ত রক্ত-চিহ্ন ধুয়ে দিয়ে এলাম, না বাইরের চিহ্ন অন্তরের ভেতর সংগ্রহ ক'রে

নিয়ে এলাম বলা শক্ত। সেই দিন থেকে আমি বিধবা। ফাল্গুনের অগ্নি বায়ু বয় বাইরে আমার অন্তরে দহে শুধু অনল, তারি উত্তাপেই হয় তো হাওয়া উত্তপ্ত!

বাইরের সঙ্গে চেনাজানা আমার একদম বন্ধ। বাবা-মা, ভাইবোন সবাই বেঁচে আছেন তাঁরা আমায় নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু শ্বাশুড়ী যেতে ছান নি, মুখের ওপর ব'লে দিয়েছিলেন: বিধবা মেয়ে ঘরে রেখে লাভ কি হবে আপনাদের? যদি কোনো কলঙ্ক রটে তবে কার গায়ে লাগে বেশি? আমারি তো? বাবা আমার কাছে ব'সে নীরবে অশ্রু ফেলে রওনা হ'য়ে যান। সেই শেষ দেখা তাঁর সঙ্গে—তারপর আজ পাঁচ বছর কেটেছে। কত দুঃখে দিন গুনছি তা জানেন শুধু আমার স্রষ্টা। তারপর আবার যে কী হ'লো তা-তো আপনার অজানা নেই! আমি বন্দিনী। জানলায় দাঁড়িয়ে বাইরের লোকের মুখ দেখবার বড়ো ইচ্ছে হয়, মাঝে-মাঝে গিয়ে দাঁড়াতেম তা-ও বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো কিন্তু আজকাল আর না দাঁড়িয়ে পারি না যে, আমায় বিদ্রোহী তৈরী ক'রেছে দুলাল! আমি বাড়ির সঙ্গে তাই বিপ্লব শুরু ক'রেছি! ঘরের কথা খুঁটিয়ে বাইরের লোককে যে জানায় সে সরল নয় সে বোকা! আমি জানি আমিও সরল নই তাই লিখছি: জানালায় দাঁড়াই মনের জ্বালায়, এতে কি আমি ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার ষড়যন্ত্র করি? শ্বাশুড়ি শাসন করেন, ভয় ছাখান: দুটো জ্যান্ত জীব গিলে আশা মেটেনি পথের মানুষ গ্রাস করতে যান্—যে না রূপের ছিরি, জানলায় দাঁড়িয়ে রূপ ছাখান্। অমন দশা হ'লে তো মুখ ছাখাতুম না কাউকে, ছিঃ! এমনি কত ছিছি-র বোঝা দিন-দিন আমার স্কন্ধে জড়ো হ'চ্ছে, আমি আর বইতে পারি না! অসহ্য!

স্বামীর মৃত্যুর জন্য দায়ী কি আমি? দায়ী কে তা আমিও বলি না—দায়ী ভগবান, যিনি দিয়েছিলেন নিয়েছেনও তিনিই! আমার কি সৌভাগ্য বেড়েছে? আর এমন উৎপীড়নের কি মানে হ'তে পারে?

গত-শীতে এ-যন্ত্রণার উপশম করবার জন্যে আত্মহত্যা করবো স্থির ক'রেছিলাম কিন্তু তা-তো পারিনি, কেবল দুলালের মুখ চেয়ে! রাত্রে শুয়েছিলাম ও-কে বুকে আঁকড়ে, শুধু ভাবছিলাম দিনটা কী ভাবে কাটলো। ভেবে ভেবে মন হ'য়ে উঠ্‌লো অস্থির। উঠে প'ড়লাম। আলনা থেকে কাপড় নামিয়ে বেঁধে ফেললাম গলায়, দুলালকে শেষ দেখা দেখে নেবার জন্যে মুখ ফিরালাম! সমস্ত প্রাণ উঠ্‌লো কেঁদে—নির্দ্দোষী ও-টাকে আমি একি সাজা দিতে উদ্যত হয়েছি! তবু ছিলাম অটল,—আজ একটা কিছু ক'রবোই। দুলালের মুখে শেষ স্নেহ-চুম্বন দিতে এগিয়ে গেলাম। তাকিয়ে দেখলাম শাশুড়ি ঘুমোচ্ছেন অকাতরে দ্যালের দিকে মুখ রেখে, মনে এলো ভরসা—কেও টের পাবে না—সুযোগ ছাড়বো না কিছুতেই। দুলালকে চুমু দিতেই আমার ভেতরের বিবেক—আপনারা বোধ'য় ব'লবেন মাতৃত্ব—আমায় দিলো বাধা। সে বাধা অতিক্রম ক'রে কিছু করবার মতো দুঃসাহস আমি মুহূর্ত্তের মধ্যে হারিয়ে ফেললাম। দুলালকে জড়িয়ে ধরে শুলাম আবার। আমার আত্মহত্যার পালা শেষ হ'লো সেদিনকার মতো। মনের অবস্থা তেমনিই হবে, আবার, আর আমায় খুঁজেই পাবেন না।

কিন্তু আজ? আমি একা। যখন যা ইচ্ছে ক'রতে পারি! একদিন হয়তো শুনবেন, মানসী বলে রাক্ষুসীটা আর নেই। সেই দিনের প্রতীক্ষায়

একদা

ব'সে ব'সে দিন গুণছি—দিন যেন আর এগোয় না! ওর চাকা যেন মাটিতে ব'স গেছে, ন'ড়ছেনা! আজকাল কান্নাকাটি বন্ধ ক'রে দিয়েছি, কেঁদে কোনো লাভ নাই তা বুঝে নিয়েছি! কান্না বুকের ব্যথাকে তরল করে জানি, কিন্তু যে বেদনা তরল হবার মতো নয় তার ওপর-ওর কি হাত। ও শুধু কাঁদিয়ে বুকই ফাটাবে কিন্তু লাভ তা-তে কতটুকু। আর কাঁদিনা তাই। দুলাল সারারাত আমার কাছেই তো থাকে—সে আজ কাল আমার স্বপ্নের সাথী! সমস্ত রাত কাটাই নিঃঘুম, ভাবি শুধু তারি কথা। অন্ধকারের ভেতর ওর রঙের জৌলুস খানিকটা জায়গা ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে, আমি শুধু চেয়ে চেয়ে দেখি ধ'রতে হাত বাড়াই না-—ধরা ছায় না যে, পালিয়ে যায়! তার চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দেখি সেই তো আমার যথেষ্ট! ও আজ কাল ভারি দুষ্টু হ'য়েছে!

চোখ বুজে যেই তন্দ্রা আসে, অমনি ডাকে—মা। আমার ঘুম ভাঙিয়ে ছায়, একা ও জেগে থাকতে পারে না বোধ'য়। আমি তাকিয়ে থেকে রাত কাটাই!

এমনি ক'রে আমার দিন চ'লেছে মা দাঁড়িয়ে আছে ঠিক বুঝিনা। পঞ্জিকার পাতার দিন কাটছে তা' জানি। ঝোলানো ক্যালেণ্ডারের পাতা শ্বশুর ছিঁড়ে ফ্যালেন, বুঝি একটা মাস গেল!

আগের কথা বলাই হ'লো না। স্বামী যখন বিদেশ গেলেন দুলাল তখন আমার পেটে—নির্লজ্জ ভাববেন না যেন। স্বামীর মৃত্যু সংবাদ পেয়েই বুঝলাম দুলালের অদৃষ্ট কতবড়ো। যাক্। দুলাল যে প্রাণ নিয়েই ভূমিষ্ঠ হ'য়েছিলো—তখন ভেবেছিলেম এ আমার সৌভাগ্য এখন বুঝি আমার দুরদৃষ্ট ছাড়া আর এমন হবে কেন? ষষ্ঠিপুজোর দিন

থেকে তার ভার প'ড়লো আমার হাতে। সেই দিন থেকে তাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে আমার বুকের স্নেহের জোয়ার দিয়ে তাকে থাক্‌তাম আগ্‌লে! আমার সমস্ত ইন্দ্রিয়ের আগ্রহ দুই বাহুতে বেঁধেছিলো বাসা—আমি দুলালকে মানুষ কর্‌তে লাগলাম সেইদিন থেকে।

আগুন দিয়ে জীয়োলে মাছ বাঁচে না তাই বোধ'য় দুলাল আমার (চোখের জলের দাগ) আমায় ছেড়ে চ'লে গেল। আমার বুকের আগুনে স্নেহের স্নেহত্ব হয় তো লোপ পেয়ে গিস্‌লো! এ-সব কথা আপনি জানেন।

যে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন স্বামী তার কাজ এত শিগগির শেষ হ'বে কে জানতো বলুন। আমি ওর কাছে ঋণী ছিলাম, শোধ নিতে এসেছিলো, আগে জানলে অল্প ক'রে শুধতাম, দুলাল আরো তবে আমার কাছে থাকতো! পাওনা চুকিয়ে নিয়ে সে চ'লে গেল (অশ্রুর আলিম্পন আঁকা এখানে) পুরুষরা কী নির্দ্দয়, ভাসুর ঠাকুর কী রকম জোর ক'রে খোকাকে আমার বুক থেকে ছিঁড়ে নিয়ে গেলেন, উঃ! চীৎকার ক'রে কেঁদে উঠ্‌লাম—আপনি হয়ত বাসায় ছিলেন, জানেন। সে দুরন্ত হাহাকারে কারো প্রাণে কি ব্যথা দি নি? হয়ত কেও পেয়েছে, কিন্তু প্রকাশ করে নি, বলে দিলাম,—ওকে আর আগুন দিয়ে পুড়িয়ো না, ভাসিয়ে দিয়ো গঙ্গায়, যদি বেঁচে ওঠে কিনার পেলে আবার ফিরে আসবে! তোমাদের দোহাই! সে দোহাই মানেনি কেউই নইলে খোকা হয় তো ফিরে আসতো! আপনি আমায় পাগল মনে ক'রবেন না যেন! আমি যদিও সত্যিই পাগল! খোকাকে আপনি ভালোবাসেন জানি, সে যাবার সময় তাকে সবটুকু ভালোবাসা দিয়ে দিয়েছেন তো?

আপনি পরকাল বিশ্বাস করেন? খোকা এখন তবে কোথায় আছে যদি লিখে জানান্! দুলালের জন্যে আমার বড়ো ভাবনা হয়! কত—ঝড়-জলের দিন গেল—বোধ'য় ভিজে-তেতে একাকার হ'য়ে আছে!

ইচ্ছে করে একদিন পালিয়ে শ্মশানে চ'লে যাই, ওর চিতা থেকে একমুঠো ছাই আনি, আমার সাথা হবে ঐটুকুই। কোনো চিহ্নই তো ও রেখে যায় নি! শুধু প্রথমভাগ আর ভাঙা শ্লেট্-টা। একটা ছবিও তোলানো হয় নি কোনাদিন! আর সব কিছু ওর সঙ্গে সঙ্গে দিয়ে দিয়েছি—যার তা সেই নিয়ে যাক্।

স্বামীর শোক দুলাল আমায় ভুলিয়ে তুলেছিলো কিন্তু আবার এই মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা যে সেই-ই দেবে কে জানতো! এখন আমার খোলা মাঠের, খোলা পথের জন্যে প্রাণ কাঁদে, কতদিন জানিনা আকাশ কত বড়ো! শুধু ইটের গাঁথুনি, ধোঁয়া, জল, এই দিয়েই হয়তো জগতটা গড়া! আমার ধারণা পৃথিবীর বিষয় লোপ পেয়ে আসচে, মনে হয় পৃথিবী এই বাড়িটার চেয়ে বড়ো নয়, আকাশ তিনকোণা ছোট্টো ঐ টুকুই—যেটুকু দেখতে পাই!

স্বর্গ কত উঁচুতে ব'লতে পারেন? মনুমেণ্টের গল্প শুনিছি—সে-টা স্বর্গ ছোঁয়? তার ওপর উঠলে হাতে পাবে দুলালকে? যাক্, এ সব নিয়ে মিথ্যা আর সময় নষ্ট ক'রে লাভ নেই। কিন্তু সময় নষ্টই বা কিসে? আমার জগতে আর কী কাজ আছে? কর্ম্মঠ জগতে তারাই বেঁচে থাকুক যাদের বুকে আঘাত পড়েনি, যাদের অনেক মুখের আহার জোটাতে হবে! দু-জনে মিলে যে মহা-কর্ম্মভার আমার স্কন্ধে চাপিয়ে

গেছে তাই নিয়েই আমার দিনগুলো কাটাই, এ-কে সময়ের অসৎ-ব্যবহার বা বলি কী ক'রে? যেখানে লোকের ব্যথা তার ওপর হাত প'ড়লে টাটায় সত্য কিন্তু সেই হাত দিয়েই তো বুলোতেও হয়, তা-তে শান্তি আছে। আমার অতীতের দিনগুলোও তেমনি ক'রেই কোনো রকমে কাটাতে চাই! অতীতকে ক'রে রাখতে চাই চির-বর্ত্তমান!

আমার জীবনের ইতিহাস চেয়েছিলেন। কিন্তু এ-টা ইতিহাসের সংজ্ঞা পাবে কিনা আপনার কাছে তা জানি না।

মনে-মনে ঠিক ক'রে রাখি যা ক'রবো অবশেষে দেখি সব উল্টে ঘোলাটে হ'য়ে এসেচে --আমার চোখের দৃষ্টির মতো; আপনি চেয়েছিলেন, দিলাম। এ-টুকু—আপনার কি কাজে আসবে জানি না! দুলালকে ভালোবেসেছিলেন! তার প্রতিদান সে কিছু দিয়ে যেতে পারেনি আমি তাই দিতে চাই,—আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিবেন। ইতি।

পুঃ আপনার ঘরে নতুন একজনকে দেখলাম এইমাত্র, চিনিনা। আমারি মতো কেও নিশ্চয়! আপনার সঙ্গে আমার সামনা সামনি দ্যাখা হবে না? অনেক কথা ছিল বলবার। লিখতে দেরি হয়, যা ভাবি ভুলে যাই। এ-বাড়িতে আমি আর বেশি দিন নেই, আপনার সাহায্য প্রার্থনা করি! চিঠিটা প'ড়েই নষ্ট করে ফেলবেন, দোহাই!

পঞ্চমী দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো! সুশীল শুধোলো: শুনলে? বুঝলে কিছু? প্রিয় সামান্য একটু চা ক'রে দেতো! আজ থেকে একটু একটু ক'রে দুয়েক পেগ টানবার অভ্যেস ক'রতে হবে। তারপর মাথার লম্বা লম্বা চুল দু-হাত দিয়ে মুঠি টানতে শুরু ক'রলো: মানসী সাহায্য চেয়েছে

হ্যাঁ, এই প্রিয় একটা গাড়ি ডেকে আন্ আজই তো যাবে, না—

পঞ্চমী একটু হাসলো : তবে কি যাব না ? না!—

—যেয়ো না ! ইচ্ছে হয় থাকো, আমার কোনো আপত্তি থাকবার কারণ নেই !

সুশীলের ভেতর উদ্ভ্রান্ততা এসে প'ড়েছে ! টুল থেকে উঠে প'ড়লো, লম্বা কাঠের চ্যাপ্টা বাক্স থেকে একটা কালো চুরুট নিয়ে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধ'রলো : প্রিয়, দেশলাইটা দে, রাতে তোর ঘুগ্যি রাঁধিস্ আমি খাবো না, আর বাসায় নাও আসতে পারি। দরজা ভালো ক'রে দিয়ে শুস্ !

প্রিয় দেশলাই দিয়ে গেল। ফস্ ক'রে কাঠিটা জ্বালিয়ে টেনে টেনে লালটুকটুকে আগুন জ্বালালো। আঙ্গুল দিয়ে দেশলাই বাজিয়ে বাজিয়ে শুধু পায়চারী ক'রছে ঘরের ভেতর। যাবার সময় পঞ্চমীর সঙ্গে এমন কথার ধর্ম্মঘট, পঞ্চমী কল্পনাও করে নি এর আগে। ছোট্টো ঘর, সুশীল শুধু ঘুরছে ! পঞ্চমী কী যেন ভাবছিলো, বললো হঠাৎ, রাতে বাসায় ফিরবে না, যাবে কোথায় শুনি।

—যেখানে গেলে দু-দণ্ড সব ভুলে সময় কাটে। জায়গাটা এখনো ঠিক করিনি ! সুশীল স্পষ্টবাদিতার প্রমাণ দেখিয়ে দ্যায় পঞ্চমীকে। পঞ্চমীর মন হ'য়ে ওঠে খারাপ ! নিজে মনে মনে কী ভাবে, মন বিষিয়ে ওঠে আরো। আবার বলে : এ-রকম উচ্ছৃঙ্খল হ'য়ে কতদিন ঘুরে বেড়াবে ব'লতে পারো ?

—যতদিন না শৃঙ্খল পরি পায়ে, সর্ব্বাঙ্গে ! বেড়ির ভারে যখন মাথা নুয়ে আসবে, কোমর আসবে বাঁকিয়ে, ঠিক ঘরে মন ব'সবে !

বুঝবে না এ-সব, তোমরা যে মেয়ে মানুষ। তোমরা জানো,—পুরুষরা বদমাইশ, প্রাণহীন। ঐ জানা টুকুই পুরুষ চেনা থেকে তোমাদের বাদ দিয়ে দিয়েছে! সুশীল ঘুরছেই। কালো ঘরটা ধোয়ায় আরো গাঢ় হ'য়ে উঠেছে, হারিকেনের চারপাশে ধোঁয়ার চাপ টইল দিচ্ছে সুশীলের মতো!

প্রিয় চা দিয়ে গেল।

—খাবারটা গুছো, আর গাড়ি ডেকে আন্!

প্রিয় তটস্থ হ'য়ে ফরমাস খাটছে।

সুশীল ব'সলো: নাও চায়ে চুমুক দাও, না দাও কাপে একটা চুমুই দাও!

পঞ্চমী কিছুতেই চা খাবে না। কাপ প'ড়ে থেকে সুশীলের মতো শুধু পাকিয়ে পাকিয়ে ধোঁয়া ছাড়ছে! পঞ্চমী বললো: হয় চা নয় সিগার, যে কোনো একটা আগে খাও! দু-কাজ একসঙ্গে হয় না।

—মুখে গিয়ে ব্লেণ্ড হ'চ্ছে, বোঝো না? সুশীল একটু হাসলো—পঞ্চমীও। তার বুকে একটু বল এলো সুশীলের মুখের হাসি দেখে, মনে নতুন আগ্রহ এলো, বললো,—আমি যাচ্ছি কিন্তু তোমারো যেতে হবে, যদি মামা বাড়ি পর্য্যন্ত না যেতে চাও বেরিলি কি কাঠগুদাম, সেখানে আমার সঙ্গে দেখা হবে চিঠি লিখো। তোমায় ছেড়ে গিয়ে আমার মনটা কিছুতেই ভালো লাগবে না। আচ্ছা, মানসীর শ্বাশুড়ী লোকটা বুঝি ভারি দজ্জাল? ভয়ানক জ্বালায় মানসীকে? পঞ্চমী কথাটাকে চট্ ক'রে ঘুরিয়ে ছায়।

—প্রথম কথার উত্তর হ'চ্ছে: বেরিলি কি কাঠ গুদাম যাবার

প্রয়োজন হবে না তুমি মাস খানেকের মধ্যে ফিরে এসো একসঙ্গেই থাকা যাবে মন তবে থাকবে চিরপ্রসন্ন, মানসীকে সঙ্গে রাখতে রাজি হবে তো? ও-বাসা ওর ছাড়া একান্ত প্রয়োজন, আমিও বুঝি। নাও মিষ্টিটুকু খাও, না খাও তো আমার মাথা খাও। কিরে প্রিয়, যাচ্ছিস্‌ গাড়ি ডাকতে? যা! শিগগির আসিস্‌, তখনকার মতো দেরি করবি না। নাও, খেয়ে নাও। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের জবাব হ'চ্ছেঃ শাশুড়ি লোক দজ্জাল কি না ঠিক জানি না আমিও, প্রিয়র কাছে যেটুকু শুনিছি! আর যে-টুকু আমার কানে এসেছে।

সুশীল হাতে কাপ ধ'রে ঘড়িটার দিকে একটা ফাঁকা দৃষ্টি রেখে আরো বলেঃ অসুখ ক'রে ম'রলে মানসীর সান্ত্বনা থাকতো! এ ম'রেছে কিনা কে জানে বলো! একদিন হঠাৎ এসে ব'লে ব'সতে পারে,—মানসি, আমায় চেনো না? আমি যে তোমার স্বামী! যদি মানসী চিনতে পারে দু-হাতে তাকে বরণ ক'রবে হয়তো। কিন্তু দুলাল? সত্যি ছেলেটাকে যে এতটা ভালোবেসেছিলেন তা জানতাম না, এখন বুঝি কতখানি দাবি ছিল তার আমার কাছে (একটা নিঃশ্বাস ফেলে নেয়)। মাস দুই আগে ঘরে ব'সে ছিলাম ছুটে এলো, বললো,—কই, উড়োজাহাজ? বললাম, ভুলে গেছি, কাল দেবো, আচ্ছা? ও-ও ঘাড় অনেকটা হেলিয়ে দিয়ে বললো—আচ্ছা। উড়ো-জাহাজে চ'ড়ে ছাদে উঠ্‌বো, সিঁড়ি ভাঙবো না আর! তারপর একদিন ভোঁ ক'রে উড়ে যাবো খুঁজেই পাবে না! বললাম,—দূর্‌ পাগলা, এতে ওড়া যায় না। বললো,—উড়োজাহাজে ওড়া যায় না, তোমার কী যে বুদ্ধি! পরদিন এনে দিলাম একটা

খেলনা উড়োজাহাজ আমার প্রতিশ্রুতি বজায় রেখে। এইটেই হয় তো আমার কাছে তার শেষ পাওনা ছিলো, পেয়ে সে কি ফূর্ত্তি, যদি দেখতে! দৌড়ে বেড়িয়ে গেল: মা-কে দেখিয়ে আসি! কিছুক্ষণ পরে শুনলাম মানসীর শ্বাশুড়ির ক্রুদ্ধ হাহাকার: পাড়ায়-পাড়ায় ভিক্ষে ক'রতে সেখানো হ'চ্ছে ছেলেকে! ভেঙে গুঁড়ো ক'রে ফেলেছিলেন নাকি প্রিয় ব'ললো। দুলাল আর একদিনো আসেনি আমার কাছে। শুনলাম গায়ে গুটি উঠে জ্বর এসেছে, দেখতে পর্য্যন্ত যাইনি। তারপর একদিন ভাঙা জাহাজে উঠে সে ভোঁ ক'রে উড়ে চ'লে গেল, আর খুজে পাওয়া গেল না (আরো একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে এলো সুশীলের বুক থেকে)। কার দুঃখ বেশি? চৈতীর না মানসীর?

পঞ্চমী ব'ললো ;—বলা মুস্কিল। হয় তো সমান।

—আমি বলি—মানসীর। চৈতীর আত্মীয় স্বজন আছে, বুকে আছে খোকা! কিন্তু মানসী! সব নিঃশেষ ক'রে একান্ত রিক্ত! প্রথম বিয়েতেও তবে শান্তি নেই! জগতে কোনো একটা বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই! যার যেমন ইচ্ছা চ'লেছে। কত মৃত্যুর কথা আজ কয়েক ঘণ্টার ভেতর হ'লো বলো তো! জগতে শান্তি নেই—যারা শান্তি পায় বলে—হয় তারা অশান্তিকে শান্তি ব'লে মেনে নেয় তুলনায়, নয় তারা জগতের ওপর ভর দিয়ে তার বাইরে বাস করে। কিরে, গাড়ি পেলি? কি পঞ্চমী, ও-টুকু মুখে দিয়ে নাও!

পঞ্চমীর আর দেরি সয়না টপ-টপ মুখে পুরে দুই-র খুড়িতে চুমুক দ্যায়, শব্দ ক'রে টেনে নেয় মুখের মধ্যে।

সুশীল শুধোয় : টাকাটুকি কম প'ড়বে না তো ? লজ্জা ক'রোনা !

—হ্যাঁ তোমায় দেখে লজ্জায় তো চোখে দেখি না ! ঠিক আছে, টাকা চল্লিশের মতো, হবে না ?

পঞ্চমী রুমালটা অনুভব করে।

সুশীল ঘাড় বাঁকিয়ে টেনে বললো,—খু ব।

ছোট্টো চামড়ার বাক্সটা হাতে নিয়ে প্রিয় এগিয়ে গেছে। সুশীল উঠ্‌লো—পঞ্চমীও।

—পথে পুড়ি কিনে খেয়ো, কী আর দোষ ! খেয়ো কিন্তু।

পঞ্চমী হাসলো।

তাগড়া 'জোয়ান ঘোড়া একটা, রাস্তার ওপর পা ঠুকছে, লেজ নাড়িয়ে গা চুলকোচ্ছে, নাক দিয়ে ক'রছে শব্দ, মুখে শাদা-শাদা ফেনা। মিশ-কালো গারোয়ান লাগাম ধ'রে ব'সে আছে উন্মুক্ত ফিটনের ওপর। পঞ্চমী সুশীল গিয়ে উঠ্‌লো ! প্রিয় পায়ে হাত দিয়ে পঞ্চমীকে প্রণাম ক'রলো—সুশীলকেও। গাড়ি গড়ালো। পঞ্চমী হাত বাড়িয়ে ডাকলো—এই ইয়ে শোনো। প্রিয় আসতে তার হাতে শিকিটা বখশিস্ দিলো, বললো : আবার এসে আরো দেবো।

পর্দ্দার ওপরের ফাঁক দিয়ে মানসীকে ব'সে থাকতে দেখা গেলো, সুশীল ব'ললো—দেখলে ? পঞ্চমী ব'ললো—কী, কই নাঃ ! বরাতে নেই ! গাড়ি আরো জোরে গড়িয়ে গেল। পঞ্চমী শুধু পেছন ফিরে চেয়েই রইলো !

সুশীল বললো : যে-দিন দুলাল মারা যায় সে দিনো আমি বাসায় ছিলাম, সন্ধ্যার একটু আগে হঠাৎ রোল উঠ্‌লো কার আঁচলের গেরো

খুলে শিউলিফুলের মালা ভেসে গেল। দৌড়ে বাইরে এলাম, খিড়কি দিয়ে দেখলাম মানসীকে,—ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি তার, শুধু রোয়াকে ছুটোছুটি ক'রছে, দুলালকে ঢাকা দিয়ে বাইরে এনে শুইয়েছে! জা-র গলা জড়িয়ে চীৎকার ক'রছে: দিদি কাঁদতে পারছি না কেন, চোখে একটু জল আনতে পারছি না যে! দিদি উঠ্‌লেন ফুঁফিয়ে কেঁদে: কেঁদে লাভ কি হবে? দুলাল তো কাঁদাতে চায় না! আবল-তাবল সান্ত্বনা। শাশুড়ি কাঁদছিলেন রোয়াকে ব'সে আঁচল দিয়ে চোখ মুছে-মুছে, কাঁদতে কাঁদতেই ব'ললেন: ওরে ন্যাপাল, দোরটা ভেজোরে। ছোটো ছেলে ছুটিতে এসেছিলো—নাকের ওপর আমার দরজা দিয়ে গেল বন্ধ ক'রে! বাইরে থেকে শুনতে পেলাম মানসীর চাপা-ককানি।

কিছুক্ষণ পরে আবার উন্মাদ চীৎকার—নিয়ে যেয়ো না গো, নিয়ে যেয়ো না। নির্লজ্জের মতো আবার বাইরে এলাম দেখতে দুলালকে—তার মুখের শেষ স্মৃতিটুকু বুকে আঁকবার ছিলো আকাঙ্খা কিন্তু হ'লো না, সর্ব্বাঙ্গে তার আক্র—চারজন লোকে ধ'রে নিয়ে গেল। মানসী দুয়োর পর্য্যন্ত এসেছিলো খোকাকে ফিরিয়ে নিতে, কিন্তু সবাই মিলে ধ'রে-বেঁধে তাকেই ফিরিয়ে নিয়ে গেল। সারারাত সেদিন ঘুমোইনি, কান পেতে শুনিছি শুধু মানসীর আকুল হাহাকার,কাতর ক্রন্দন আর ককানি।

দিন তো আর ব'সে থাকে না হেঁটে চ'ললো! মানসী তবু কাঁদে—খোকা, ফিরে আয় রে, দুলাল, আয় রে আমার। এলো না কেউ।

শাশুড়ি চোপা চালান্: যা খেইছিস্ এর আগে একি তার চেয়ে বড়ো। রাতদিন কাঁদিস্?

ক্ষণিকের জন্যে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে শব্দটা করে রোধ কিন্তু ভেতরটা তার দাপায়ি! জানলায় ব'সে ব'সে কেবল সেই দিকে কান পেতে থাকি! কিছুদিন রোজগারের ধান্ধায় বেরোই নি, তেমন মনের অবস্থা তখন আমার নয়। মানসীর আবির্ভাবের প্রত্যাশা করি কেবলি যদি সে আসতো জানলায়—কিন্তু সে কখনো আস্‌তো না! বিদায়ের বিষ মালা তার সর্ব্বাঙ্গে জড়ানো! সমস্ত শরীর তার টাটায়। উঠে আসতে হয় তো পারে না! হয়তো মেঝেতে শুয়ে শুয়ে জেগে জেগে তখন স্বপ্ন ছাখে, তার খোকা আসচে, হাতে তার ভাঙা শ্লেট-টা, ডান হাতে পেন্সিল। মানসী ধ'রতে চায়। হাত বাড়িয়ে যতই এগোয় খোকা হেসে হেসে পিছু হাটে! মানসী তাকে কোলে তুলে নিতে পারে না কিছুতেই!

বুকের আকুলতা বাড়ে কেবল।

রাস্তার চারিদিকে আলোর সোপান! গাড়ি হেঁটে হেঁটে ঘুট ঘুট ক'রে চ'লেইছে পথের লোক হাঁকিয়ে।

সুশীল থামে না: মানসী কাঁদতে গেলে মুখে কাপড় দিতে হয় চাপা। হয় তো ওর শাশুড়ির মনে পড়ে তাঁর ছেলের কথা, বলেন: চীৎকার ক'রে কাঁদ রে লক্ষ্মীছাড়া, চীৎকার ক'রে কাঁদ—বুকের আগুন নেভা! আমার মতো গুমরে আর ফাটিস না, তিনিও কেঁদে ওঠেন—ওরে আমার... মানসীর স্বামীর নাম ক'রে।

মানসী তখন আরো কাঁদে।

নিজের বুকে এতটা ব্যথা নিয়েও তিনি মানসীকে জ্বালাতে ছাড়েন না। রাতদিন বকুনি, ক্রুদ্ধ আস্ফালন লেগেই আছে। জানলায় এসে

দাঁড়িয়ে মড়া শুক্নো একটা কুকুরো যদি সে দেখতে পায় তার সেদিনকার ডায়েরীর পাতায় দু'টো হরফ লিখবার মতো সামগ্রী জোটে কিন্তু তা থেকেও তা-কে বঞ্চিত ক'রে রাখতে চান তিনি! তাঁর ইচ্ছা সদা সর্ব্বদার জন্যে মানসী থাকে তাঁর চোখে-চোখে, সম্মুখে। এক পা এক মুহূর্ত্তের জন্যে সরতে পাবে না, কারণ সে কুলবধূ, শৃঙ্খলিতা। তুমিই ঠিক ক'রেছো, শ্বশুর বাড়ি ছেড়েছো,—যেখানে অত্যধিক শাসন সেইখানে বিদ্রোহের সূত্রপাত। মানসীর মনেও সেই আকাঙ্খা এসেচে—সে আমার সাহায্য প্রার্থনা ক'রেছে। কি ক'রে তাকে সাহায্য করি বলো তো! কি বললে? তোমায় যে-রকম সাহায্য করছি। নিজে খেটে খাবার একটা বন্দোবস্ত ক'রে দেবো ওকে?' তোমাকে তো আজ অবধি দিতে পারলাম না। ওকে দেবো কোথেকে? সাবানের ফ্যাক্টরীর বাক্স তৈরী ক'রবে ঘরে ব'সে? যদি করে ও, এ একটা পন্থাও মন্দ না। আমার বাসায়ি থাকবে কি বলো? লোকে খারাপ কথা বলে, বলুক,—বদ-লোক ছাড়া কেও বল্‌বে না নিশ্চয়! আজ রাত্তিরে বাসায় ফিরবো তবে—সারারাত ভেবে কিনারা ক'রবো ঠিক, কি করি দেখি' ভেবে চিন্তে। না-হয় ওর বাবার কাছে পঠিয়ে দিলেই বা ক্ষতি কি? কিন্তু কি ক'রে কার সঙ্গে এলো—এও একটা সন্দেহ। মানসীকে তাঁরা ভাবেন কি কে জানে, তাঁরা লোক কেমন জানি না তো! তার চেয়ে মানসী যাবে না কোথাও, আমরা তিন জনে মিলে-জুলে নিজেদেরি খাটুনির ভাত খাবো এক সঙ্গে, থাকবো সুখে, কি-বলো? মানসী ম'রে গেছে এই যেন জানেন তাঁরা—মানসীর বাবা-মা। যেখানে তিনি কন্যাদান ক'রেছেন তার জন্যে তিনি

পস্তান্—শেষ জীবনের নগণ্য কটা দিনো যেন তেমনি স্থান কাটিয়ে,—মানসী দু-দিন অন্ততঃ জীবনের স্বাধীনতা উপভোগ করুক! তার জীবনের শুরু হ'য়েছিলো বছর ছয় আগে তার পরেই সমাপ্তির রেখা টানা হ'য়েছিলো সেখানে, সে-রেখা মুছে আবার ও জীবন করুক নব গঠিত, উন্মুক্ত হাওয়ায় দিক্ গা ঢেলে—জিরোক! উঃ, অসহ্য পরাধীনতা! বিকালে ছেলেরা প'ড়ে ফেরে যখন ইস্কুল থেকে মানসী দুলালকে খুঁজতে বেরোয় তার বন্ধুদের মজলীশ থেকে—এই হ'চ্ছে তার মহা অপরাধ! তাই নিয়ে খোঁটা খেতে খেতে তার প্রাণ ক'রে ওঠে আইঢাই। পরাধীনতার টাবুটুবু জলে ও হাবুডুবু খায়—সাঁত্‌রে সাঁত্‌রে সর্ব্বাঙ্গ অবশ হ'য়ে এসেছে তবু আজ অবধি কিনারা পায়নি। এ-মহা সমস্যার সমাধানের জন্য ও আমার সাহায্য চেয়েছে? সুশীল থামলো একটু।

সিটি কলেজের গা দিয়ে গাড়ি বাঁক নিলো ডানে বেচু চাটার্জি ষ্ট্রীটে! বাঁ দিকের ছোট্ট চায়ের দোকানে মিটমিট্ ক'রে আলো জ্বলছে—দুয়েকটা খদ্দের ব'সে হাওয়া খাচ্ছে হাতপাখার। এখনি রাস্তাটা যেন মিইয়ে এসেছে। ডানের বিজলী বাতির কারখানায় তখনো শব্দ হ'চ্ছে লাগারে। তারি গা দিয়ে যে রাস্তা ও দিকে গেছে তা ছেড়ে গাড়ি সোজাই গড়ালো। দু'দিকে ঘর বাড়ি ফেলে গাড়োয়ান ঘোড়ার পিঠে চাবুক কষছে, তালে-তালে পা-র শব্দ ক'রে ঘোড়া চার পায়ে দৌড়ে হাটছে। ডানে মস্ত ভিড় একটা—পঞ্চমী কি তা না জেনেই প্রণাম ক'রলো। সুশীল বললো: কথকতা হ'চ্ছে, এখানে মাঝে-সাঝে হয়! বাঁ-য় ঝামাপুকুর রেখে গাড়ি টপুর টপুর এগোলো আরো এগোলে পথটা

ডান দিক মুচড়ে ঘুরেছে, মোড়ের মাথার বাড়িতে ঘড়িটা দেখবার জন্যে সুশীল মাথা নিচু ক'র্‌লো চোখে লাগাল পেলো না, দেখলো শুধু পেণ্ডুলামের দোলন। যাক্‌, গাড়ি সোজাই চ'ললো সামনে ট্রাম রাস্তা ক্রমে ক্রমে তাও এলো।

সুর ব'দলে গাড়ি উঠ্‌লো পাথরে! বাঁ-য় যাবে সিধে!

সুশীল ব'ললো : প্রায় চ'লে এসেচি! যদি সময় থাকে কিছুক্ষণ গল্প করা যাবে। কি বলো? ব্রীজে দাঁড়িয়ে জাহাজ দেখবো! উড়ো জাহাজ নয়—দুলাল তা নিয়ে গেছে।

সুশীল বললো : আর কথা নয়! কথা বলবার জায়গা, বই পড়বার জায়গা বাড়ি। যখন পথে তখন পথই দেখতে হবে, দেখি তাই! কি বলো?

ওরা তাই চেয়ে চেয়ে দেখছে :

গাড়ি বায়ে বেঁকে গেছে। কখনো ট্রাম লাইনে উঠ্‌ছে আবার নেমে-নেমে জায়গা ক'রে দিচ্ছে আর সব গাড়ি যাবার। দু-পাশে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ি! নিচ-তলা দোকানে ঠাসা, দোকান ঠাসা মালে, আলোয়। হাত দিয়ে গাহাক ডাকছে তাদের দোকানে খরিদ ক'রে পরখ ক'রতে। আবার আলো জ্বলছে, নিভছে—পঞ্চমীর চোখে ধাঁধা লাগে। সুশীল উঠে এলো পেছনের সিট্‌-এ, বললো, পাশাপাশি বসি, কি বলো? পঞ্চমী কিছু বলে না! জামাকাপড়ের দোকানে আজগুবি ছবি দেখে হাসে শুধু। মেছুয়াবাজার। মোড়ের ইলেক্‌ট্রিকের থামের গায় বসে একটা মেয়েমানুষ টুকটুকে পুতুলের মতো ছেলে কোলে নিয়ে ভিক্ষে ক'রছে, গ্যাশের স্পষ্ট আলোয় পঞ্চমী বেশ দেখতে পেলো তা।

শুধোলো : এমন সুন্দর ছেলে ওর ঐ বিগ্‌খুটে মেয়েমানুষের? সুশীল চেয়ে দেখলো—ঐটে? ছোঃ, কোন ডাষ্টবিন থেকে কুড়িয়ে এনেছে! এ-রকম কাণ্ডের তো অভাব নেই এ-শহরে!

পঞ্চমী আশ্চর্য্য হ'য়ে যায় : ডাষ্টবিন? তার মানে?

—মানে নেই। ও-সব মেয়ে মানুষের হৃদয় আছে তারি উলঙ্গ পরিচয়। কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট দেখেছো—ঐ যে।

পঞ্চমী ফিরে চায়। ডানে মস্ত গাড়ি-বারান্দা শুরু হ'য়েছে শেষ নাই যেন। শো-কেস্ বোঝাই মাল—জুতো, কাপড়; 'ডল্'এর গায়ে সুট্ আঁটা, চোখে চশমা, গোঁফ পাকানো—সব আজগুবি। ব্যবসার ফন্দি হ'চ্ছে—গাহাককে আকর্ষণ করো যেমন ক'রে হোক, তা'কে ঠকাও, নিজে জেতো, আর তে-মহলা বাড়ি ফাঁদো, ব্যস্। বাঁয়ে পুরাণো বই-এর দোকান আর পাশাপাশি জুতোর পাট একটা সিল্কের শাড়ি ব্লাউজেরো। গাড়ি আরো ছুট্‌লো। ঘোড়াটা ধু্‌কে গেছে নিশ্চয়। বিরাম বিশ্রাম ত্যাগ ক'রে মজবুত মস্ত ঘোড়া এক লাগামের জোরে মানুষের দাস! বাঁ-য় শরু ফালি একটা গলি ফেলে এগিয়েই হ্যারিশন রোড্। মহা হট্ট-গোল। শুধু পুলিশের বাঁশি, হাঁকিহাঁকি ডাকাডাকি, কলরব। ঐ কোণে একটা শ্বেত পাথরের মূর্ত্তি লোহার গরাদ দিয়ে ঘেরা। অস্পষ্ট দেখতে পেলো পঞ্চমী। গাড়ি শঙ্কেত পেয়ে বাঁকলো ডানে। বরাবর গেলেই ব্রীজ, তা পেরোলেই হাওড়া। ওরা প্রায় এসে প'ড়েছে।

সুশীল চিন্তিত নীরব, পঞ্চমী নিশ্চিন্ত নীরব। উর্দ্ধে তারকার মতো জ্বল জ্বল ক'রে সারাপথে আলো জ্বলছে। পঞ্চমী ভাবলো, তারায় যারা আছে তারাও দেখছে সারা পৃথিবীময় তারা! ও-দিকের প্রকাণ্ড বাড়িটার

মাথা দিয়ে মিশকালো গাঢ় মেঘ ধীরে ধীরে মাথা চাঁড়ছে—আষাঢ় মাস বৃষ্টি হবে এ আর আশ্চর্য্য কি?

গাড়ি আরো চ'ললে! ওর জগতে আসা শুধু চলার জন্যে—তাই মানুষের চলা ফেরার মাঝ দিয়ে পথ কেটে কেটে গাড়ি চ'ললো সামনের দিকে। ঘোড়াটা জানেও না কোথায় চ'লেছে সে। এইটুকু জানে শুধু, সে টানছে।

সুশীল ব'ললো: বৃষ্টি হবে দেখছি। ভিজেই ঘরে ফিরতে হবে। তোমার সুবিধে বেশি গরম ভোগ ক'রতে হবে না ট্রেন্এ। সুশীল সাম্নের সিট্-টায় পা দিলো তুলে, গা দিয়ে নিলো মোড়ামুড়ি, ভালো ক'রে হেলান দিয়ে ব'সলো! হেসে ব'ললো কি ফূর্ত্তি বলো তো? এ-রকম এক তরিতে দু'জন একসঙ্গে দুলতে! কেবল তুমি আর আমি আর আমি আর তুমি; বাঃ, চমৎকার! তখন আর সব শূন্য বাইরের! তাই হবে, কি বলো? ফিরে এসেই হবে!

—হবে তো হবে! পঞ্চমী যেন রাজি হ'য়েই আছে! বললো,—বাজে কথা আবার? পথে নাকি কথা বলে না?

সুশীল বললো,—এ-সব কথা চলে। এ-সব যে ঘরে চলেনা! তোমার-আমার কথা যদিও স্বতন্ত্র। ফাঁকা ঘর খিল দিয়ে দিল্ খুলে কথা ব'লতে পারি কিন্তু আর সবার? সেই থেকেই নিয়ম, এ-সব কথা চলবে পথেই! বলো, ফিরে আসচো কবে? না হয় না গেলে, চলো ফিরি!

—চলবো আর না, ফেরোই শুধু আজকের মতো। মাসখানেক পরেই আসবো বলিছিতো! পঞ্চমী কেনা-বেচা ভাখে কেবল।

গারোয়ান চাবকে ঘোড়ার বাপকে গালাগাল দিয়ে গাড়ির জোর

বাড়ায়! একসঙ্গে একজায়গায় পার শব্দ ক'রেই ঘোড়া লাফিয়ে উঠে আবার দৌড়য়! গাড়ি চলে।

শত-সহস্র কলরব কলহাসি পেছনে ফেলে গাড়ি চলে। গমকে-গমকে বর্ত্তমানকে অতীতে করে নিক্ষেপ। গাড়ি চলে।

পঞ্চমীর মুখে রা নেই, সুশীলের মুখে নেই টুঁ শব্দটা পর্য্যন্ত! দু-জনে পাড়ি দিচ্ছে মহামানবের বিরাট সমুদ্র! সুশীলের মনে আবার মানসীর কথা দিচ্ছে উঁকি, চৈতী ভুলকি দিয়ে পঞ্চমীর মুখ দেখছে!

সাম্‌না আড়াল ক'রে পথ আধখান ক'রে কেটে ট্রাম চললো। পুলিশের বাঁশি শুনে গারোয়ান্ গাড়ি দিয়েছে থামিয়ে। সেই্‌পথে আরো সব গাড়ির আনাগোনা শেষ করিয়ে তবে এদিকে ইঙ্গিত পাঠালো—যাও। গাড়ি গেল।

এ-দিকটা ঘর বাড়িতে ঠাসা। তারা ছুঁয়েছে লম্বা বিজগতি দালান গুলো! চটের পর্দ্দা খাটিয়ে মাধুর্য্যের হানি এনে ফেলেছে অত বড়ো বাড়ির! চারিদিকে আলো আর আলো, পথে শুধু জল আর কাদা—নোঙরার একশেষ। চারিদিকে কঁড়মড়ো বুলি—বোঝে কার সাধ্য। ব্যবসার চাষ হয় এখানে—তাই এত কোলাহল, দাঙ্গা। কমার্স-এ এম-এ পাশ ক'রে সুশীল এখানে দিয়েছিলো একটা ছোট্টো দোকান—কতটুকু ব্যবসা শিখেছে পরখ করবার জন্যে। তারপর অল্প দিনের মধ্যেই পাল গুটিয়েছে;—তাই পঞ্চমীকে স্তাখালেঃ ঐটে ছিলো আমার দোকান, ঐ যে ছেলেটা পান্ বেচছে তার পাশের বাচ্চা লিক্‌লিকে শরু ঘরটা, আলো জ্বলছে! পঞ্চমী তাকিয়ে দেখলো। সুশীল আরো ব'ললোঃ তিন মাসে পাঁচ টাকা লোকসান দি ঘর ভাড়াটায়, আর

দোকান বেচে দেখি দেড়-শো টাকার ধাক্কা খেয়েছি! সেই থেকে দণ্ডবৎ দোকানদারিতে, কেনা-বেচা ক'রে যা পাই দু-চার আনা দিনে—তাই দিয়েই চালাই! ও-সব আমাদের চ'লবে না, ওদের একচেটে! এক পয়সার ছাতুতে দিন যায় ভাবনা কি? আধছটাক মাল কম দিয়েই তা তুলে নিতে পারে।

পঞ্চমী হাসে: তোমাদেরি বা খেতে বারণ করে কে? খাও না। ঐ বুঝি ব্রীজটা?

সুশীল দেখতে পেলো অদূরে উঁচু ঢিঁপি—অস্পষ্ট আলোতেও তা ও বুঝতে পারলো,—হ্যাঁ এই তো চ'লে এসেছি। গারোয়ান গাড়ি জোরে হাঁকাচ্ছে। আর বেশি দেরি নয়।

ট্রামগুলো সুশীলদের গায়ে উজ্জ্বল আলো ফেলে ছুট্ ক'রে চ'লে গেল। পেছন থেকে মটোরের আলো বহুদূরে গিয়ে প'ড়েছে, মানুষের লম্বা-লম্বা ফিকে কালো ছায়া মুহূর্ত্তে ঘুরে যাচ্ছে। হর্ণ দিয়ে মটোর ছুট্‌ছে, উঁচু হয়ে উঠে গেল ব্রীজে!

ডানে গোল্ড-ফ্লেকের ঘড়ি! একটায় আটটা বাজতে পাঁচ, আরেকটায় সাড়ে সাত! প্যাথীতে ঘোষণা ক'রছে রাণীগঞ্জের টাইলই সেরা! সমস্তখানটা জাজ্জ্বল্যমান আবার অন্ধকার। দেখতে দেখতে ওদের গাড়ি কাঠের রাস্তায় উঠে প'ড়লো পঞ্চমীরা দেখলো বাঁদিকে মোটা জাহাজের চোঙ্গা—শুনলো গোঙানো হুইস্‌ল্।

বয়াগুলো অন্ধকারে ব'সে একতালে দুলছে। লঞ্চটা ছড়-ছড় ক'রে জল কেটে দে ছুট্। ব্রীজ ভাসচে, জোড়-তালিতে হ'চ্ছে ঠকা-ঠক শব্দ। তার ওপর দিয়ে গাড়ি গড়াচ্ছে, নিচ দিয়ে গড়াচ্ছে মহা-

সমুদ্রের সনে বিরাট যোগসূত্রে বাঁধা অনন্ত জল। বাইরের আলোয় জল ক'রছে চিক্-চিক্। শান বাঁধানো ঘাট, আবছায়ায় ছায়ার মতো জীয়ন্ত প্রাণী চান্ ক'রছে। তাদের গা থেকে ঢেউ কেটে গোল হ'য়ে জল বৃহৎ বৃত্তে মিলিয়ে একাকার হ'য়ে যাচ্ছে।—ঢেউগুলো যেন হাবুডুবু খেয়ে তলিয়ে যায়। তীরে তীরে পাটের তরণী বাঁধা। ছই-র ওপর ব'সে উনুনে আঁচ দিচ্ছে মাঝির পো'—রাঁধবে খাবে, রাত কাটাবে। এক লড়ি বোঝাই কাঁচা চামড়া বিকট দুর্গন্ধ ছড়িয়ে সুশীলদের গাড়ি ডিঙোলো, আর গন্ধের মতোই বিকট ছ্যাকরা লড়ির চাকার আওয়াজ। নাকে কানে কাপড় গুছতে ওরা দিশে পায় না। পঞ্চমী শব্দ ক'রলো—উঁঃ, সুশীল প্রতিধ্বনি ক'রলো—হু। জানালো সে-ও স্বীকার করে গন্ধের তীব্রতা! ক্রমে হাওয়ায় মেখে গিয়ে তা মোলায়েম হ'য়ে এলো। বাস্ গুলো হিড় হিড় ক'রে দৌড় দিচ্ছে পাশ দিয়ে—পঞ্চমীর বুক কাঁপে! ঘুম লাগালো পল্লী থেকে একদম ঘুম-জাগালো সহরে হবারি কথা! পঞ্চমী শুধোয়ঃ ভেঙে পড়ে না এটা এতো উৎপীড়নে? সুশীল ভুরূ টেনে বলে—কোনটা? ব্রীজ, না আজ পর্য্যন্ত ভাঙেনি তো। তবু আশা করা যায় চিরদিন টিকবে না,—আশঙ্কাও বলতে পারো। যেমন মানসী আর টিকতে চাইছে না—এবার আর মচকাবে না শুধু, একদম ভেঙে প'ড়বে। ব'লে বাঁ দিকে ঘাড় বাঁকিয়ে সুদূরের ঢেউ গোণে।

ঝাঁকি দিয়ে গাড়ি থামলো—ওরা সমুখের ঝোঁক নিলো সাম্‌লে। কাত হ'য়ে সুশীল দেখলো রাস্তা জাম্ হ'য়ে গিয়েছে—সেদিকেও বিরাট ঢেউ মহামানবের, মহা-যানের! নিকাশের বন্দোবস্তে পুলিসের

পটুত্ব জাহির করবার মতোই। আবার চললো। এই উঁচু সামান্ত। এসে গেছে।

ঘড়িতে সাতটা বেয়াল্লিশ বেজেছে। লাল কোঠাবাড়ি। লোকের অরণ্য। মায়ের নাকের মৃদু নিঃশ্বাসের মতো শীতল হাওয়া, গাড়ি থেকেই তা ওরা অনুভব ক'রেছে।

দেড়টি বছর পর আবার এখানে পদার্পণ সবার সঙ্গে আজ পঞ্চমীর নতুন ক'রে শুভদৃষ্টি,—আরো কারো সঙ্গে হবে কিনা কে জানে তা! কিন্তু থাক্ সে কথা।

ভাড়া চুকিয়ে হাটলো ঘরের দিকে। ভিতরে প্রকাণ্ড ফাঁকা লোকে যদিও গিস্‌গিসে, পঞ্চমী ওপরটা দেখছে। পঞ্চমী সব কিছুর ওপর সম্পূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে নিলো—পুজি থাকলো কেবল অফুরন্ত ব'লেই। মেম-সাহেব হিন্দিতে হিন্দুস্থানীটার সঙ্গে ঝগড়া ক'রছে, টিকিটের কি যেন গণ্ডোগোল। ওরা তাদের বেরুলো। এলো একদম ফাঁকায় —ঘরেব ভেতর চেয়ে চেয়ে দেখছে ছোটো-ছোটো কুঠুরি। এ সব পঞ্চমী দেখেছে এর আগেই।

কখন্ গাড়ি কোন্-প্লাটফর্ম থেকে শুধোতে এগোলো ওদিকটার ঐ গোল মতো দেয়ালবিহীন ঘরে। চক্-চকে মেঝেতে কতজন ঘুম যাচ্ছে, কাছাকাছিতেই পানের পিক থুতু, বিড়ির টুকরো। ও-সব ওরা গ্রাহ্য করে না কারণ গরিব, স্থানহীন! ওয়েটিং রুমে যাবেন বাবুরা—যাঁরা শুধু পয়সার বাবু,—এই-ই নিয়ম। ঘুরে ঘুরে তাদের হাত পা বাঁচিয়ে এরা এগোলো।

মিশমিশে কালো, নাকের ডগায় চশমা, পানের দাগে ঠোঁট পুরু,

গালে আচিল—সলোম, ময়লা জামা পরনে একজন ভদ্রলোক ব'সে হাজারের প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। ওরা গেল সেখানে।

ডেরাডুন ছাড়বে দশটা ছয়-এ মানে সাড়ে দশটায়। দু-ঘণ্টার ওপর সময় আছে। সুশীল বললো,—সাততাড়াতাড়ি তো লেগেছিলো, ব'সে থাকো! তাগাদার চোটে অস্থির! পঞ্চমী জবাব দ্যায়: আসতে বলিছি এত আগে? বললাম না টাইম-টেবল্ দেখতে? সময় নেই জানা, দোষ দিলেই হ'লো। পঞ্চমী যেন ঠোঁট ফুলিয়ে নিতান্ত খুকির মতো রাগ দ্যাখায়। অন্য সময় হ'লে সোহাগ ক'রে সুশীল থামাতো, সে উপায় বন্ধ ক'রে রেখেছে চারিদিকের পুরুষের ক্ষুধিত নয়ন।

—তবে কি করা যায়? পায়চারি, টহল? রাজি, তবে চলো পুল দেখে আসি। হাওড়ার ট্রাম দেখেছো? চলো দেখবে। কলকাতার থেকে তফাৎ কি ব'লতে পারবে? পঞ্চমীর হা'ত ধ'রে সুশীল ধীরে টানে।

পঞ্চমী ছাড়িয়ে নেয় না, বলে: তফাৎ দেখিয়ে লাভ নেই, ও সব থেকে তফাৎ থেকেই বেশ থাকবো, ভিড় ভাঙার সামর্থ নেই আর, কাল জেগে কাটালাম আবার আজও চলছি, শরীরে সয় না।

হাওড়ার ঘড়ির কাঁটা থেকে-থেকে সামান্য লাফিয়ে নিচ্ছে—ওই ওর চলা।

পঞ্চমী বল'লো,—টিকিটটা কিনে নাও না। তখন যদি দেরি হ'য়ে যায়। কেটে, চলো গিয়ে বসি গাড়িতে—হাঁটু ভারি ভারি ঠেকছে।

—টিকিট? সুশীল একটু ভেবে নিলো—তা ও মন্দনা, বললো,—দাও টাকা। রেখেছো কোথায়?

পঞ্চমী পেটের কাছটার কাপড় ঢিল দিয়ে সেখান থেকে খুঁটে বাঁধা রুমালটা বার ক'রলো, তা ধ'রেই দিয়ে দিলো সুশীলের হাতে গুঁজে। অনুভব ক'রে সুশীল জিগ্‌গেস ক'রলো: কত আছে?

উত্তর পেলো: সাড়ে চারখানা নোট নিয়ে বেরিয়েছি যা থাকে,—ওদিকটার খর্চা বাদ দিয়ে, এই চল্লিশের কাছাকাছি।

সুশীল ব'ললো, ঢের হ'য়ে যাবে। আসবার সময় কম প'ড়লে লিখো, পাঠিয়ে দেবো অখন।

—কেন, মামার কাছেও তো পেতে পারি। পঞ্চমী জবাব দিলো।

সুশীল মনে-মনে ভাবলো—অপরের কাছে চাইতে যাবে কেন, সে নিজে থাকতে, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করলো না। শুধু ব'ললো,—সে তখন দ্যাখা যাবে।

হাতে রুমাল মুঠির মধ্যে ধ'রে যেতে উদ্যত হ'য়ে ব'ললো—একলা দাঁড়াতে পারবো তো? (একটু হেসে) আর কেউ হাত ধ'রে টানলে যেয়ো না যেন। এই এলাম ব'লে! সুশীল গেল।

পঞ্চমী দেখলো: লোহার গলির ভেতর লাইন বেঁধে লোক দাঁড়িয়ে গেছে, সুশীল তাদের একদম পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। পাক খেয়ে ও-দিক দিয়ে একজন বেরোলো, সুশীলো এগোলো একধাপ।

কালো থামটার আড়ালে গেরুয়া রঙের থান প'রে একজন বুড়ি ব'সে আছেন, ছোট্টো একটা বোচকা আর একটী পেতলের ঘটি মাত্র সাথী তাঁর, দু-পা এগিয়ে তাঁকে শুধোলো: আপনি যাবেন কোথায়?

কৌটো খুলে আঙুলে ক'রে খানিকটা কালো গুঁড়ো দাঁতে দিয়ে থেমে ব'ললেন : কাশী, তুমি যাবে কোথায় মা ?

পঞ্চমী এদিকে—ওদিকে চাইছে, কি একটা জিনিষ ও যেন হারিয়েছে হঠাৎ যার সন্ধান পেলো। চারিদিকে চোখ ঘুরিয়ে দেখছে : না আমি ও-দিকে না আমি যাবো নাইনিতালে। আচ্ছা, আপনাদের গাড়ি ছাড়ে কখন ?

—ক'টা বাজলো ? এই তো সবাই যখন যেতে থাকবে তখন জানা যাবে! খানিকটা কালো ছ্যাপ্ ফ্যাচ্ ক'রে ফেলে থামে লেপটে দিলেন।

পঞ্চমী বলে : তবু ? আর বোধ'য় দেরি নেই, নয় ?

—কি জানি বাপু, আমার বোন-পো যাচ্ছে সঙ্গে সে-ই জানে সব। কি আবার কিনতে গেল ও-দিকে। আসুক শুধিয়ে বলছি।

সুশীল এখন দু-দিকের চাপ সমানভাবে হজম ক'রছে। পঞ্চমী চেয়ে দেখলো ঠিক মধ্যেখান পর্য্যন্ত এগিয়েছে ও, জালের আড়াল দিয়েও স্পষ্ট চিনতে পারলো। পঞ্চমী ছট্‌ফট্ ক'রছে—কুমারীও হয়তো এই গাড়িতেই যাবে! তার সঙ্গে যদি আরেকবার ছাখা হ'য়ে যেতো! সুশীলের সবটাতেই দেরি, এতক্ষণ আবার মানুষের টিকিট কাটতে লাগে নাকি! গায়ে জোর দিয়ে এগোতে হয়।—কেও পিছিয়ে এসে সাম্‌না ছেড়ে দেবে না! ওরা বেধ'য় এতক্ষণ গাড়িতে ব'সে! ঐ যে ছোটো একটা লাল চোখ দিয়ে চেয়ে আছে গাড়িটা—দাঁড়িয়ে প্ল্যাটফর্ম-এ, হয় তো ঐটেই। পঞ্চমী একা যাবে ?

সুশীল আসচেই না। আরো দু-ধাপ হয় তো হবে সুশীল হেঁটেছে

ভিড়ের মধ্যে! এত সময় যখন আছে আগে টিকিট না কাটলেও হ'তো! পঞ্চমী আঁচলটা ভালো ক'রে জড়িয়ে নিলো গায়ের সঙ্গে।

সুশীল এবার জানলার ফোঁকলে হাত গলিয়েছে।

—আপনার বোন-পোই বুঝি আপনার সঙ্গে যাবেন? কাশী যাচ্ছেন তো? একই ট্রেণ-এ হয় তো যাবো আমরা।

অকস্মাৎ কুমারীর স্মৃতির মণিকোঠার প্রবেশ পথ উন্মুক্ত হওয়ায় পঞ্চমী বলে ফেলেছিলো: না আমি ওদিক যাবো না। কিন্তু এখন সে বুঝতে পেরেছে। এই বৃদ্ধার সঙ্গেই তার এ ভ্রমণটা কাটাতে হতে পারে। তাই আগে থেকে জানাশোনা ক'রে রাখছে—পথের পুঁজি। রাত্রের কয়েকটি সুদীর্ঘ ঘণ্টা পঞ্চমী কি ক'রে শেষে ক'রবে?

—এক সঙ্গে যাবো? তবে তো—

—হ্যাঁ, সঙ্গি হ'লো, মন্দ কি? নয়। পঞ্চমী হাসলো। বৃদ্ধা দন্তহীন মাড়ি বার্ ক'রে হাস্‌বার চেষ্টা ক'রলেন।

সুশীল এসে প'ড়ছে। ঘাড় নিচু ক'রে বাঁ হাতের তেলোর ওপরের রেজকিগুলো পরখ ক'রে দেখছে, টিকিটের তারিখটা ঠিক আছে কিনা—তাও।

সুশীল হেসে ফেললো: দু-মিনিটের মধ্যে পুরোদমে মিতালি?

ফিরে দাঁড়িয়ে প্রায় যেন চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো: কি এসেছো? দু-মিনিটই তো। আধঘণ্টা! না হোক পনেরো মিনিট তো নিশ্চয়ি। বাব্বা, এতক্ষণ লাগে টিকিট কিনতে! চলো, ট্রেণ-এ। কোন্ প্ল্যাটফর্ম? তিন নম্বর—চলো।

—চলো বললেই তো যাওয়া যায় না! গাড়িই ছাড়ে নি! সুশীল রুমালটা পঞ্চমীর হাতে দিলো: খুচরো গুলিন বেঁধে নাও!

সুশীল পঞ্চমীকে ছাখালো তিন নম্বর প্ল্যাটফর্ম মরুভূমির মতো নির্জ্জন। তাই এত আগে গিয়ে লাভ নেই।

পঞ্চমী বললো: জানো, কুমারীরা যাবে হয়তো এ গাড়িতে। কাশী যাওয়া যায় না এতে? সুশীল হাসলো: যাওয়া যাবে না কেন? কিন্তু এরো যে আগে অনেক গাড়ি কাশীর দিকেই গেছে সে খবর তো রাখো না। কুমারীরা হয় তো এখন কাশীর কাছাকাছি। কাশীতে না হয় ব্রেক-জার্নি ক'রো যদি অত গরজ থাকে! সুশীল আবার হাসলো।

—সে-গাড়িতে না-ও তো গিয়ে থাকতে পারে! তোমার যেন সবটাতেই ঠাট্টা, সব জিনিষই তোমার কাছে হাল্কা!

সুশীল আবার হাসে: তুমিই ব'লেছিলে কুমারী রোগা, রোগে চোখ মুখ ফ্যাকাশে তবু না হয় সে খুব ভারীই হ'লো, তা ব'লে কি ঐ নির্জ্জনেও তাকে খুঁজে পাওয়া যাবে? লোক জন আসুক, তোমার কুমারী আসুক্, আমরাও যাবো! যদি হুকুম করো এ-ভিড়ের মধ্যে খুঁজতে রাজি আছি কিন্তু তাকে তো আর আমি চিনি না, মুহূর্ত্তের মধ্যে একটা মুখ মনে এঁকে নেয়া সম্ভব নয়, হোক না কেন সে মুখ একটা মেয়েরি! তার ওপর বোর্খা ঢাকা দিয়ে যাবার মতো সে সর্ব্বাঙ্গে দিয়েছে আবরণ,—রোগা কি মোটা তাই বুঝলাম না, তো মুখ!

পঞ্চমী মীইয়ে প'ড়েছে। হাওয়ায় চুল মুখের ওপর ল্যাজ ঝুলিয়ে কিল্‌বিল্ ক'রছে সে দিকে ওর খেয়ালই নেই! ঠায় দাঁড়িয়ে কি ভাবছে তা অজানা নেই! তার চোখের সীমার মধ্যে যত জন মেয়ে হাটছে

সকলের ভঙ্গিমার মধ্যে কুমারীর সব্রীড় কুণ্ঠিত মন্থর গমন ওর চোখে এসে বাজছে—ভাবছে নিশ্চয়ি ও কুমারী। ব'ললো: চলো, ও-দিকে যাই। যদি...

পঞ্চমী আর কিছু ব'ললো না। পদে পদে সুশীলের কথা তার ভালো লাগে না। কিন্তু কথাটার ভেতরে যে টুকু উহ্য আছে তা' সুশীল সহজেই বুঝতে পেরেছে। একটু হেসে বললো,—চলো যাচ্ছি, কিন্তু কুমারীরা আগের ট্রেণেই পাড়ি দিয়েছে, এ ধ্রুব। নিশ্চয় গিয়েছে। আগে মনে ক'রলে না! আর, ওদের শুধিয়ে রাখলেই পাত্তে। একসঙ্গে যাবার যখন এত ইচ্ছা!

পঞ্চমী ব'ললো,—সময় যখন আছে, তখন তোমারি বা আপত্তি কি ঘুরতে! হাওড়ার ট্রামের ভেতর যতটা দেখবার আছে তার চেয়ে ঢের বেশি দেখবার আছে কুমারীর ভেতর।

সুশীল একটু জোরেই হাসলো: কুমারীর ভেতর মাত্র একটা জ্যান্ত শিশু আর ট্রামে বিশ পঞ্চাশজন জ্যান্ত মানব। কোনটা বেশি?

পঞ্চমী রেগেছে: শিশু দেখতে চাইছি না, ভেতর ব'লতে ওই-ই বোঝায় না। তোমার বুদ্ধির তুলসিগাছে একটু ক'রে জল দিয়ো, শুকিয়ে এসেছে!

—তুমি দিয়ে দিয়ো। এ গাছ তোমারি। আমি কে? নিমিত্ত ছাড়া কেউই নই! কাঁধের ওঁপর দিয়ে আঁচল ঘুরিয়ে সপ্রেম অঞ্জলি, কে না পেতে চায়, পঞ্চমি! যাক্, তবে আর মিছিমিছি দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে, চলো যাই ও দিকটায়।

পঞ্চমী যেন অনড় নিঃসাড় জড়!

সুশীল ব'ললো : কি যাবে না? মতলবখানা খুলে ব'লবে? সত্যি, তোমায় আমি এখনো ষ্টাডি ক'রে উঠতে পারলাম না। কিছু অন্ততঃ বলো—হ্যাঁ কি না! না হয় ঘাড় নাড়ো।

পঞ্চমী হেসে ফেললে,—বাব্বা, এতও জানো।

—তোমার মতো এমনি দু-টি মেয়ের পাল্লায় প'ড়লে দুনিয়ার কি অজানা থাকবে বলো! জানি কি আর, জানতে হয় যে।

—হয়েছে লেকচার, চলো। কাশী যাবার গাড়ি এর আগেও ছিল নাকি? ক'টায়—পাঁচটা! তবে ওরা চ'লে গেছে নিশ্চয়ি, কি বলো!

—আমি তো তাই-ই বলি, এখন তুমি ব'ললেই বাঁচি। সুশীল শুধু হাসচে—পঞ্চমীকে বিদায় দিতে এসেও ওর হাসি পাচ্ছে তবে—কিন্তু এ বিদায় মধ্যে যে বিরহ নেই এ যে মিলনে ভরা,—পঞ্চমী আবার ফিরচে—সুশীলের সেই সান্ত্বনা! কিন্তু মানসী? সুশীল কি তার কথা একদম ভুলে গেল? সে যে ওর সাহায্য প্রার্থনা ক'রেছে সুশীল তা ভোলেনি তো?

চিকচিকে শাড়ির জৌলুস ছড়িয়ে হাতে পায়ে ঠাস বুনোন রূপোর গয়না দিয়ে হিন্দুস্থানী মেয়েটা সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে ধীরে ধীরে চ'লেছে। পঞ্চমী দুঃখেও হেসে উঠ্‌লো : ওমা, এই। আচ্ছা, তুমিই বলো দূর থেকে ঠিক কুমারীর হাটার মতো ঠেকছিলো না? খুব খানিকটা ছুটে নেয়া গেল! বুক ঢিব্ ঢিব্ ক'রছে, ভাখো হাত দিয়ে!

সুশীল বললো : তা আমারো ক'রে উঠ্‌লো বটে। ভাখো তুমি! থাক্ গুচ্ছেক লোকের সামনে আর দেখে দরকার নেই! পরে দেখো!

পঞ্চমী সুশীলের মুখের পানে চাইলো। কিছু খুঁজে পেলো না—একান্ত নির্দ্দোষীর মতো স্বচ্ছ, সরল তার মুখ। সুশীলো চাইলো পঞ্চমীর

মুখে, দেখলো,—জিগগাসু দৃষ্টি, সলজ্জ আভাস। কেও কিছু প্রশ্ন ক'রলো না!

ক্রমে ডেড্ লেটারের বাক্সটার কাছে এসে দাঁড়ালো! কত অনামা, অখ্যাত নামা, অজানা অচেনা লোকের নাম—তাদের চিঠি! নিয়ে যায় নি। কতদূর দেশ থেকে আকাঙ্ক্ষা হ'য়ে এক টুকরো কাগজ সাগর দিয়েছে পাড়ি তবু পলাতকাকে পায়নি। সমস্ত চিঠিই যেন কাতর, মলিন!

পঞ্চমী ব'ললো,—এত চিঠি নেয় না কেউ—আশ্চর্য্য! কতজনার কত কথা হয় তো বলবার ছিল বলা হয় নি। সে কথা বাসি হ'য়ে শুকো'চ্ছে হেথায়!

সুশীল ব'ললো,- বাড়ি খুঁজে পায় না, কি ক'রবে বলো! এখানেই প'ড়ে থাকে! যে খোঁজ পায় নিয়ে যায়। এতক্ষণ সময়, যেন কাটছে না, নয়?

—আমার কিন্তু বেশ কাটছে। উঃ, এর মধ্যে সাড়ে আটটা বেজে গেল? আরো ঘণ্টা দেড়েক, দেখতে দেখতে সাবাড় হ'য়ে যাবে! এবার বোধ'য় গাড়ি দিয়েছে, চলো যাই! ঐ যে যাচ্ছে—গেট খুলেছে, যাবে?

যে বৃদ্ধার কাছ থেকে পঞ্চমী কাশীর গাড়ির কথা শুধিয়েছিলো—তার কথা আর ওর মনে নেই! পৃথিবীটাই এমনি, এখন সুশীল এসেচে পঞ্চমী দুনিয়ার ভিখারী নয়!

—ভেতরে গেলে গণ্ডি টেনে হাটতে হবে—শুধু প্লাটফর্ম টুকু। আর এখানে যথেচ্ছা! আর তুমি গিয়ে মেয়েদের কামড়ায় উঠ্‌বে আমার ঠাঁই হবে না, সেই একা!

—আমি জায়গাটুকু রোজগার ক'রে নেবে আসবো। এমনি ধারা পায়চারী আর গল্প হবে, ভাবনা কি? চলো ভেতরেই যাই! সত্যি, আমার মনে হ'চ্ছে কুমারীরা এইটেতেই যাবে।

—কী আছে কুমারীর কাছে বলো তো? কি জন্যে এত উৎকণ্ঠিত হ'য়ে প'ড়েছো? যদি থেকেই থাকে, থাকবেই। ঠিক ছাখা পাবে! এই তখন আমার কথায় সায় দিলে আবার মন বিগড়োলো! তোমার মামার রাঁচীতে ফের বদলী হওয়াই ভালো!

—তোমারি বা যেতে আপত্তি কি? এখানেও যা ওখানেও তো তাই, একই কথা! তোমার মাথাও নিতান্ত ভালো ব'লছে না! আমার দরকার হ'লে তোমারো বাদ যাবে না!

—দু'জনেরি যদি এক, কোনো আপত্তি নেই পঞ্চমি—এক তরিতে—ব'লেছিতো? সুশীল হাসলো: বেশ চলো ভেতরেই চলো। মেয়েদের পুরুষরা সম্মান দিয়ে থাকে। জায়গা ছেড়ে উঠে বাস্-এ জায়গা ছায় মানে তাদের সুবিধেটুকু গুছিয়ে ছায়, তোমার যদি ওখানেই সুবিধে হয়, চলো!

একান্ত বিধবার মতো রিক্ত নিঃস্ব শুভ্র, সেলুন্ গাড়িখানা নিরালায় নিঃসঙ্গ একাকী দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে ও-দিকটায় ওটাকে ফেলে রেখেছে, কা'রো মমতা নেই! কাজের সময় আবার ওরি ডাক প'ড়বে, আদর পাবে। এমনিই হয়।

একদা

ডেরাডুনের পেট ভ'রে উঠ্‌ছে ক্রমে ক্রমে।

মেয়ে আঁকা ছবির পেছনে আলো জ্বলছে। সে কামড়ায় এখনো যাত্রী বেশি কেও ওঠেনি, কুমারীরাও হয় তো থার্ড ক্লাশেই যাবে, পঞ্চমী তাই উঠ্‌লো এইটেয়িঃ দাঁড়াও জায়গাটা বানিয়ে নি। পা-দানিতে পা দিতেই চট্ ক'রে উঠে গেল, সুশীল বুঝলো বাইরে বেরোলেই পঞ্চমী স্মার্ট। ভেতরে কা'র বউরি এক থুৎনি ঘোমটা টেনে ব'সেছিলো তাকে হিন্দি ব'লে ভজিয়ে নিলো,—এখনি আসবো থোড়া দেখতে হবে।

ব্যস্, আবার শুরু, সুশীল দাঁড়িয়েই ছিল। গোপন প্রিয়ার সঙ্গে যেমন মিছিমিছি ইসারা ছল চাতুরি এ-ও যেন তাই! পঞ্চমীর ইঙ্গিতে সুশীল চল্‌লো।

কালো সন্ধ্যার মতো সময় ঘনিয়ে আসচে। সারাদিনের এত ঔজ্জ্বল্য, এত ফিরে-পাওয়া সব ক্রমে মলিন হ'য়ে আসচে, সব কোথায় যেন ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছে। দিগন্তের অন্তরালে হ'চ্ছে সব জড়ো। বর্ষার মেঘ কালো ছায়া ফেলে নদীর ওপার থেকে দৌড়ে আসে, এ যেন ঠিক তেম্‌নি। সমস্তটা দিন আজ কেটেছে এদের বর্ষব্যপী অমিলনের বিচ্ছেদ কাটায়। কত রেশমির সূক্ষ্ম সুতায় এরা জাল বুনেছে মনে মনে গোপনে, ক্রমে ঝড় উঠ্‌ছে, মহা প্রভঞ্জনের দাপটে টুটে যায় বুঝি সব! সুশীল ব্যথিয়ে এসেচে।

পঞ্চমী থিতিয়ে যাচ্ছে, কোনো কথাই স্পষ্টাস্পষ্টি বলতে পারছে না।

—অমন ঘাড় নিচু ক'রে হাঁটছো যে ক'নে বৌ-র মতো। কি ভাবছো কি ?

—ক'নে বৌ-রা বুঝি ভেবে-ভেবে হাটে ? সুশীল তেমনি ঘাড় নিচু ক'রেই জবাব দিলো। পঞ্চমী একটু ভেবে নেয় : হ্যাঁ, তা ভাবে বৈ কি ! ভাবে না ? নতুন লোকের কাছে যাচ্ছে, জায়গা নতুন কিন্তু তুমি কি ভাবছো—

—কত পুরোণো লোক চ'লে যাচ্ছে, জায়গাটা হ'য়ে যাচ্ছে কেমন ফাঁকা ! সুশীল ঠিক পঞ্চমীর বলবার ভঙ্গিটা টুকে নেয়।

পঞ্চমী না হেসে পারে না। মুখে আঁচল দিয়ে খানিকটা ফুঁফিয়ে নিলো ;—কেঁদে না যদিও, হেসেই।

সুশীল তবু ঘাড় তোলেনি, নিতান্ত নিরীহের মতো পায়চারী ক'রছে পঞ্চমীর গা ঘেঁসে। আসমানে আজ চাঁদ উঠবে না। ক'লকাতার রাস্তায় আজ হয়তো দশটায় আলো নিবিয়ে দেবে। সুশীল অন্ধকারেই ফিরতে পারবে তবু। গিয়ে দেখবে মানসী হয় তো—

সুশীল হঠাৎ ঘাড় সোজা করে নিলো, চমকে উঠলো যেন : সত্যি তো, মানসী যে তার সাহায্য প্রার্থনা করেছে !

পঞ্চমী শুধোলো : কি ভাবছিলে বলো তো সত্যি করে—

—হ্যাঁ, মিথ্যে করে বলে রোজগার এখানে কিছু হবে না ঠিকই— ভাবছিলাম, তোমার কথা, চলে যাচ্ছো সেই কথা, ফিরে আসবে তা-ও। কিন্তু সে অতীতের কথা, এখন ভাবছি মানসীর। সুশীল আর কিছু বললো না।

সুশীল ব'ললো : হ্যাঁ বাজলো কটা ? আর দেরি কত এ-গাড়ির।

ওকি ওদিকের গাড়িটায়ো যে লোক উঠ্‌ছে। আগে কোনটা ছাড়বে? সত্যি, মনটা বেজায় বিগড়ে গেল দেখছি। সব নষ্টের মূল তুমি?

পঞ্চমী গাছের ডাল ভেঙে প'ড়ে যায়: আমি? কিসের?

—কেন এতক্ষণ তো বেশ ছিলাম। কথা ব'লছিলে ভুলেই গিস্‌লাম। বাক্‌বন্ধ ক'রেছো আর অম্‌নি...দোষ কার তবে? আমার? তবে তাই—। যাক্‌ আমারি দোষ। চলো দেখি তোমার জায়গাটা আছে তো, না কুমারী-ফুমারী দখল ক'রে ব'সেচে!

পঞ্চমী সুশীলের পানে চাইলো—যে চাউনিটার ভেতর অমৃতের বিষফল। তাই সুশীল না হেসে পারলো না।

—অত ঠাট্টা কিসের বলো তো! তুমি যে মানসী ব'লতে অস্থির হ'য়ে উঠ্‌ছো আমি তা-তে এক বর্ণ...

—ক'রবে কি ক'রে? ন্যায্য অস্থিরতা! তোমার কুমারীর কথা বলছি—তারা চ'লে গেছে, তবু তোমার বিশ্বেসি হ'চ্ছে না। না গিয়ে পারেনা অমন ই সঙ্গে।

পঞ্চমী প্রতিবাদ ভুলে গেছে।

সুশীল বললো: আর মানসী? সত্যি তার জন্যে অস্থির হবারি কথা। কি মিসারেব্‌ল্‌ লাইফ্‌ বলো তো! তার ওপর শুনলেই তো লিখেছে আত্মহত্যা ক'রবো, একদিন খুঁজেই পাবেন না। আবার আমার সাহায্যও চেয়েছে? কি বিপদ বলো তো! কি করবো বলো তো। মানসীর কথা আমি ভাবতে পারিনা। সুশীল একটু থামলো!

একদা

ছোট্টো ধাক্কা দিয়ে এঞ্জিন এসে দাঁড়ালো। বাফারে শব্দ হ'য়ে উঠ্‌লো ; সুশীল ব'ললো : তবে আর দেরি নেই, এঞ্জিন এলো। ওঃ, বাবা, এতটা সময় কেটে গেছে ? ভিড় ভাঙতে ভাঙতেই সময় যায়।

পনেরো মিনিট বাকি গাড়ির।

মেয়েদের গাড়ির দরজার সমুখে একটু তফাতে দাঁড়ালো ওরা।

সুশীল বললো : ঠিক এক মাসের ভেতর ফেরা চাই, বুঝলে ? আমি কিন্তু উদ্বিগ্ন থাকবো। গিয়েই চিঠি দেবে পৌছন সংবাদ। ঠিক সময় বাস্ পেলে কিনা, কোনো কষ্ট হ'লো কিনা ! সব লিখো। আজ আষাঢ়ের কত ? যাক্, শ্রাবণেরো এমনি সময় এসো কিন্তু তার আগে যদি আসতে পারো তবে তো—সুশীল হাসলো : আর ইয়ে, টাকাকড়ির কম্‌তি প'ড়লে তৎক্ষণাৎ লিখো, মামার কাছে চাইবে কেন ? প্রতিবেশী বইতো নয় ! আমায় লিখো !

সুশীল যেন বেজায় আপন।

পঞ্চমী শুধু ঠোঁট কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে হাসছিলো ; বললো,—লিখবো, পাঠিয়ো। কিন্তু আজ বাসায় যাচ্ছো তো ? যাবে না ব'ললে যে তখন !

—তারপর আবার ব'ললাম যে যাবো !

সময় এখন দৌড়চ্ছে। ঘড়ির কাঁটা ছোটলাফ্ যেন ভুলেছে। চারিদিকে একটা ব্যস্ততার উচ্ছ্বাস। নামা ওঠা, কেনাকাটি। খেলনার

ঠ্যালাগাড়ি রবারের চাকার ওপর গড়াচ্ছে শশব্যস্তে। পানবিড়ির হাঁক দৌড়নো। সব তাড়াহুড়ো।

—তোমার মামাকে চিঠি লিখেছ নিশ্চয়ি ক'রে যাচ্ছো?

—হ্যাঁ, তিনি বেরিলি পর্য্যন্ত আবার ভাটিয়ে না আসেন।

—তবে আর ভাবনা নেই! ওঠো গাড়িতে ঘণ্টা দিলো। পাঁচ মিনিট বাঁকি আছে যদিও। কুমারীরা এলো না তো?

পঞ্চমী জবাব দিলো না। একটু দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে পা দানির ওপর পা দিলো কিন্তু তখনকার মতো অত ত্রস্তে উঠ্‌তে তার পা সরলো না।

সুশীল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারটা ধরাচ্ছে—অনেকক্ষণ খায়নি।

জানলার সম্মুখে কাঁচটা নামিয়ে দিয়ে পঞ্চমী ব'সলো। বাঁ হাত ভাজ ক'রে কমুই বাইরে দিয়ে ব'সে বড়ো চিন্তিত হ'য়ে উঠ্‌লো। সে আজ চ'লে যাচ্ছে।

সুশীল দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলোঃ আমি চিঠি লিখবো তো? তোমার মামা কিছু মনে ক'রবেন না?

—লিখো। মনে ক'রতে হয় করবেন। মনে করাকে আর অত গ্রাহ্য করি না।

সুশীলের কথাটা মন্দ লাগলো না।

একটু থেমে ব'ললো,—তবে লিখবো।

এ কি, পঞ্চমীর উজ্জ্বল চোখ দু'টো হিমালয়ের মতো নিশ্চল, হঠাৎ তাড়া-খাওয়া হরিণ-শিশুর মতো চঞ্চল হ'য়ে উঠ্‌লো! কমুইটা টেনে নিলো ভেতরে। সুশীল যে বল্‌লো 'লিখবো' তা অনুমোদন করবার মতো সময় পর্য্যন্ত সে পেলো না! পঞ্চমী ব্যস্ত,—চড়াইর মতো চঞ্চল

এবড়ো সাগরের মতো উশৃঙ্খল! সুশীল চাইল পঞ্চমীর চোখের দৃষ্টি অনুসরণ ক'রে। ঝড়ের মুখের প্রদীপের শিখার মতো বিমূঢ়, ক্ষিপ্ত সচঞ্চল কা'রা আসে! সুশীল চিনতে পারে নি! পঞ্চমী এখন সুশীলের মুখের ওপর তা'কে অনেক কথা শোনাতে পারে। কিন্তু শোনাবার মতো সময় নেই এখন, ফিরে এসে না হয় তা' হবে, কিন্তু ওদের ওঠবার মতো সময় আছে তো। প্রায় এসে প'ড়েছেন ওঁরা। কিন্তু পঞ্চমী ক্রমে ম্লানিয়ে আসচে, তীব্র জ্বলন্ত দৃষ্টিতে চাইছে ওর দৃষ্টির সীমার বাইরে অবধি, কুমারী তরে আসে নি? দরজার গোড়ে এসে প'ড়েছেন। পঞ্চমী আগেই দরজা খুলে ফেলেছে, কুমারীর মা (যাঁর জাত যায় কুমারীর হাতের পান খেতে; ভোর বেলা যিনি প্রথম সম্ভাষণ ক'রেছিলেন কুমারীকে 'আবাগী', তিনি) গায়ের চাদর বাঁচিয়ে উঠে প'ড়লেন ছুটন্ত তারার মতো বেগে। আর তার বাবা ওঁকে তুলে দিয়েই ওদিকে দৌড়।

পঞ্চমী কোন প্রশ্ন ক'রতেই সাহস পেলো না। বিমূঢ়ের মতো, বাজে আহত শিশুর মতো অপলক নয়নে চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর আবার জানালার কাছে তেম্নি ক'রেই এসে ব'সলো। সুশীল কাছে স'রে এসে ব'ললো, ব্যাপার কি?

—কুমারীর মা-বাবা। কিন্তু বেচারিটা রইলো কোথায়? আমার বুক ঢিব-ঢিব ক'রছে, সত্যি। পঞ্চমী প্রায় কাঁদ-কাঁদ সুরে কথাটা ব'ললো।

সুশীল নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ধোঁয়াটুকু র'য়ে স'য়ে ছাড়লো। হঠাৎ আবার হ'য়ে উঠলো প্রচণ্ড ভাবিত, আরো কাছে স'রে এসে প্রশ্ন ক'রলো: জিগগেস্ ক'রলে না?

—করবো, র'য়ে স'য়ে (সুশীলের ধোঁয়া ছাড়বার মতো ক'রে হয়তো)। এলেন এইমাত্র।—আর যেমন মানুষ, কথা ব'লতে ইচ্ছে করে না। পঞ্চমী প্রায় নাক সিঁট্‌কালো!

—মানুষটা নিয়ে তোমার প্রশ্ন নয়। কথাটা নিয়ে, কুমারীকে নিয়ে। খুব চাপা গলায় উত্তেজিত হ'য়েই সে বললো।—আর, আমার তবে জানা হ'লো না? গাড়িতো ছাড়লো ব'লে।

পঞ্চমী একটু ভেবে নিলো: ঠিক জান্‌বে। চিঠিতে আদ্দেক, ফিরে এলে সবটা।

গাড়ি ছাড়ে-ছাড়ে।

গার্ড সাহেব আলোর দিকটা নিজের মুখে ধ'রে রঙ বদলাচ্ছেন।

লোকটা বোধ'য় পেলো না গাড়ি। ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুট্‌ছে। আচম্‌কা বুক কাঁপিয়ে ঘণ্টা উঠলো বেজে।

—কে রে প্রিয়? ছুট্‌ছিস্! পঞ্চমীর কাছ থেকে বিদায় নেবার মুহূর্ত্তটা তা'র অপব্যয় হ'য়ে গেল হয়তো।

—বাবু!! প্রিয়তম থ'মকে দাঁড়ালো: বাড়ী চলুন বাবু, আপনি যাবেন না ব'লে এলেন তাই ইষ্টিশানে ধর্‌তে এলাম, পরে কোথায় যান ব'লে। বাড়ি চলুন বাবু। ভীষণ বিপদ!

বিপদ? বাসায় কে আছে? কিসের বিপদ? আগুন লাগা ছাড়া—সুশীল হঠাৎ বুঝে উঠতে পারে না!

হুইস্‌ল্ বেজে উঠলো।

পঞ্চমী ডাক্‌লো,—এই, এই। কি? হ'লো কি? এই?

সুশীল চলন্ত গাড়ির সঙ্গে খানিকটা হেটে চ'ললো: কি জানি, দাঁড়াও, প্রিয় ব'লছে বিপদ! কি বিপদ শুধোই!

—শুধোও, আমায় বলো! দুর্ভাবনা নিয়ে,......মানসীর?

সুশীলও যেন সেই রকম কী-একটা আতঙ্কে অস্থির হ'য়েছে।

বললো,—হ'বে!

—সঠিক্ জানাও! পঞ্চমী উদ্বিগ্ন হ'য়ে প'ড়েছে। মানসীর আত্ম-হত্যা করবার সেই কথাটা মূর্ত্ত দুঃস্বপ্নের মতো তাকে ঘিরে দাঁড়ালো। আবার ওই গণ্ডি ছাড়বার সাহায্যও চেয়েছে। কোন্‌টা—

—আমায় জানিয়ো কিন্তু। হাত নাড়িয়ে পঞ্চমী অনুনয় জানালো।

—ঠিক জান্‌বে। চিঠিতে আদ্দেক, ফিরে এলে সবটা।